ঘূর্ণিঝড়

আনওয়ার আলী

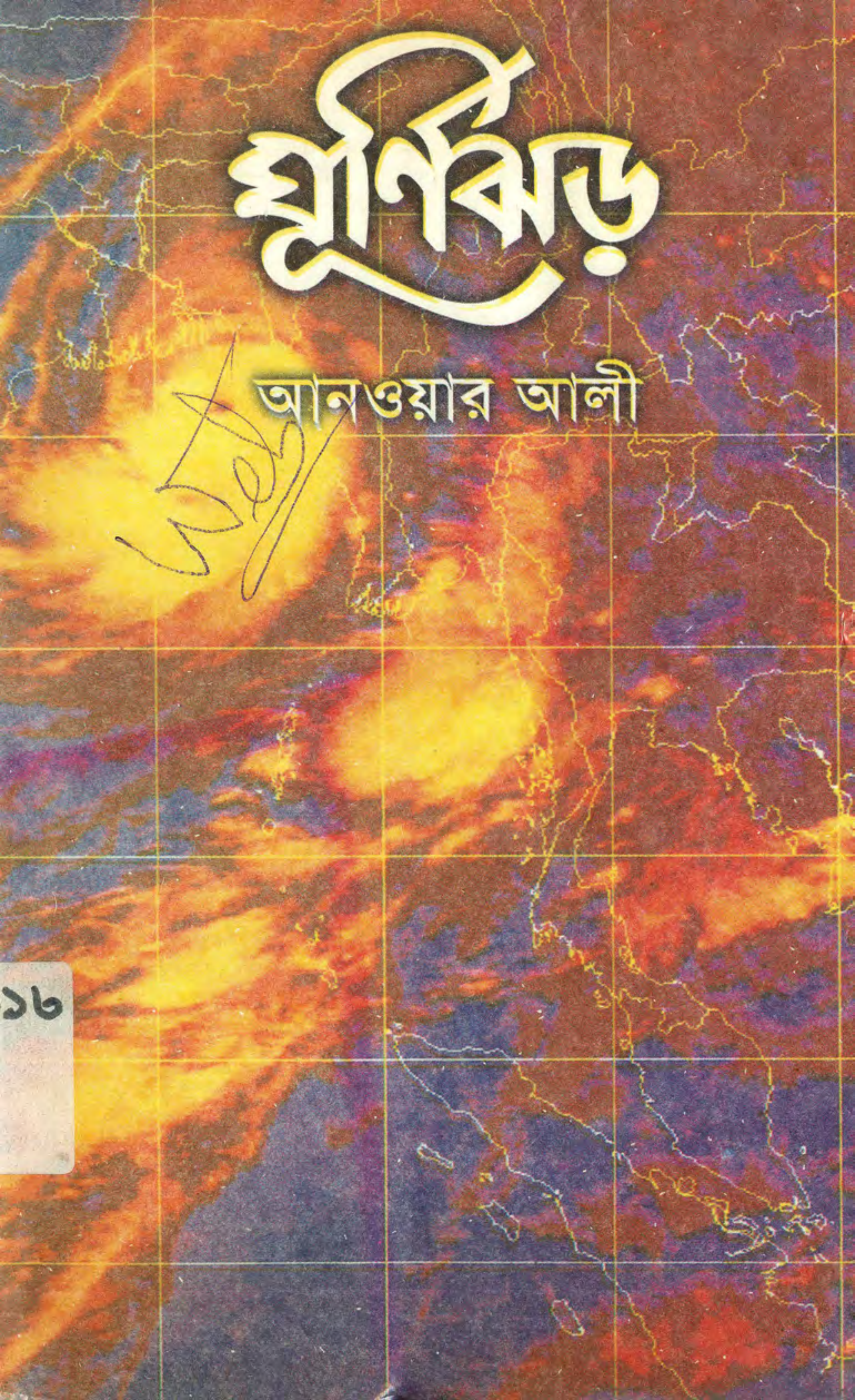

১৬

ঘূর্ণিঝড়

(Cyclone)

ড. আনওয়ার আলী

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান

(স্পারসো), ঢাকা

BANSDOC Library

Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৪০৬ / অক্টোবর ১৯৯৯

বাএ (১৯৯৯-২০০০ পাঠ্যপুস্তক : ভৌ ও প্র ২) ৩৯৩৫

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ

ভৌ ও প্র ১৯২

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য : ৬০.০০

GHURNIJHAR (CYCLONE) by Dr. Anwar Ali, Chief Scientific Officer, Space Research and Remote Sensing Organisation (SPARRSO). Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, October 1999. Price : Taka. 60.00

ISBN 984-07-3944-1

BANSDOC Library
Accession No. 17870
Date 10.6.02

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়
পিতা-মাতার উদ্দেশে

BANSDOC Library
Dhaka

ভূমিকা

ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের জন্য একটি প্রলয়ংকরী দুর্যোগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দুর্যোগ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানছে এবং প্রায় প্রতি বছরই আমাদের জানমালের প্রচুর ক্ষতিসাধন করছে।

ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এটি বন্ধ করা সম্ভব নয়। সম্ভব হলো এর ছোবল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমানো। কিন্তু তা করতে হলে আমাদেরকে ঘূর্ণিঝড় সম্বন্ধে জানতে হবে। জানতে হবে ঘূর্ণিঝড় কি, কোথায় জন্মায়, কিভাবে এর সৃষ্টি হয়, কি এর গঠন, কি এর শক্তির উৎস ইত্যাদি। যতো বেশি ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জানা যাবে, এ বিষয়ে ততো বেশি সঠিক পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হবে এবং এর ছোবল থেকে আমরা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবো।

কিন্তু বাস্তবে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক সীমিত। ঘূর্ণিঝড়বিষয়ক বেশিরভাগ গ্রন্থই ইংরেজিতে। ইংরেজি ভাষাগত কারণ ছাড়াও রয়েছে ঐ সব গ্রন্থের টেকনিক্যাল এবং গাণিতিক ভাষার সমস্যা। বিশেষজ্ঞ ছাড়া এসব বিষয় বুঝা খুবই কঠিন।

বাংলা ভাষায় ঘূর্ণিঝড়ের উপর কোনো বই আছে বলে আমার জানা নেই। তাই প্রলয়ংকরী দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বাংলা ভাষায় দেশের জনসাধারণ্যে তুলে ধরার জন্য আমার এ প্রচেষ্টা। যে দুর্যোগ দ্বারা প্রায় প্রতি বছরই আমরা আঘাতপ্রাপ্ত হই, সে দুর্যোগ নিয়ে বর্ণনা করাই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থটিতে আবহাওয়াবিজ্ঞানের টেকনিক্যাল ভাষা এবং গাণিতিক বর্ণনা যতদূর সম্ভব পরিহার করা হয়েছে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বুঝার জন্য আবহাওয়াবিজ্ঞান সম্পর্কিত কোনো পূর্বতন জ্ঞানের যেন তেমন প্রয়োজন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে।

গ্রন্থটি লেখার সময় স্পারসোর বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য আমি স্পারসো কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে আমার মা, স্ত্রী মিলি, মেয়ে সায়মা এবং ছেলে ইকরাম আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। সেজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক এবং বাংলা একাডেমীর নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। গ্রন্থটির মানোন্নয়নে পাঠকদের কাছ থেকে যে-কোনো মূল্যবান তথ্য ও পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের কাজে লাগলে আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

আনওয়ার আলী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : **ভূমিকা** ১-৫

আবহাওয়া বিজ্ঞান ; ঘূর্ণিঝড়ের সংজ্ঞা ও নামকরণ ; ঘূর্ণিঝড়ের প্রকারভেদ ; বিপরীত ঘূর্ণিঝড়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : **বায়ু ও বায়ুমণ্ডল** ৬-১৭

বায়ুর গঠন ; বায়ুর তাপমাত্রা ; বায়ুর চাপ ; সমচাপরেখা ও সমচাপ পৃষ্ঠ ; বায়ুর ঘনত্ব ; বায়ুমণ্ডলের স্তর ; ট্রপোস্ফিয়ার ; স্ট্রাটোস্ফিয়ার ; মেজোস্ফিয়ার ; থার্মোস্ফিয়ার ; ওজোনস্তর ; জলীয়বাষ্প, মেঘ ও বৃষ্টি ; বাষ্পীভবন ও জলীয়বাষ্প ; বায়ুর আর্দ্রতা ; ঘনীভবন ও মেঘ ; অধঃক্ষেপণ ও বৃষ্টি।

তৃতীয় অধ্যায় : **বাতাস ও বল** ১৮-৩০

বাতাসের একক ; বল ; চাপ বল ; কোরিওলিস বল ; চাপ বল ও কোরিওলিস বল : জিওস্ট্রোফিক বাতাস ; চাপ বল, কোরিওলিস বল ও অপকেন্দ্র বল : গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাস ; চাপ বল ও কেন্দ্রাতিগ বল : সাইক্লোস্ট্রোফিক বাতাস ; ঘর্ষণ বল ; স্পর্শ-বাতাস ও ব্যাস-বাতাস ; সর্বোচ্চ বাতাস ও চাপ-ঘাটতি।

চতুর্থ অধ্যায় : **ঘূর্ণিঝড়ের জীবনচক্র ও গঠন** ৩১-৩৭

জীবনচক্র ; বিস্তৃতি ; গঠন বিভাজন ; অনুভূমিক গঠন ; অন্তরাংশ ; চোখ ; চোখ-দেয়াল ; বহিরাংশ ; উল্লম্ব গঠন ; গঠন অসমতা ; বাতাসের অসমতা।

পঞ্চম অধ্যায় : **ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি ও বিকাশ** ৩৮-৪৯

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রধান প্রধান শর্তাবলি ; গরম সমুদ্র পানি ; কোরিওলিস বলের উপস্থিতি ; উচ্চতার সাথে বাতাসের পরিবর্তন ; পূর্ব-বিদ্যমান গোলযোগ ; নিচে নিম্নচাপ এবং উপরে উচ্চচাপ ; আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয় ; পুবাল তরঙ্গ ; মৌসুমী বায়ু প্রবাহ ; গ্রীনহাউজ প্রভাব ; এল নিনিও, এনসো এবং কিউ বি ও।

ষষ্ঠ অধ্যায় : **ঘূর্ণিঝড়ের গতি ও গতিপথ** ৫০-৫৪

গড় গতি ও গড় গতিপথ ; অক্ষাংশ এবং ঋতু নির্ভরশীলতা ; অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ভরশীলতা ; নিয়ন্ত্রক প্রবাহ ; ঘূর্ণিঝড় উত্তর পশ্চিম দিকে কেন যায়।

Dhaka

সপ্তম অধ্যায় : **ঘূর্ণিঝড় পর্যবেক্ষণ** ৫৫-৬৭

প্রচলিত পন্থা ; ভূপৃষ্ঠ/নিকট ভূপৃষ্ঠ ; ঊর্ধ্বাকাশের উপাত্ত ; আবহাওয়া চার্ট ; উড়োজাহাজের ব্যবহার ; রাডার ব্যবহার ; আবহাওয়া উপগ্রহ ; মেরুবৃত্তীয় উপগ্রহ ; ভূস্থির উপগ্রহ ; ভূ-উপগ্রহ স্টেশন ; উপগ্রহ দ্বারা ছবি গ্রহণ ও প্রেরণ ; ছবির বিশ্লেষণ ; টি-নম্বর ; উপগ্রহ থেকে অন্যান্য তথ্যাদি।

অষ্টম অধ্যায় : **ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস** ৬৮-৭৩

ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাস ; জন্মের পূর্বাভাস ; গতিপথের পূর্বাভাস ; ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান নির্ণয় ; বিদ্যমানতা ; অতীত ইতিহাস ; ক্লিপার ; পরিসংখ্যান মডেল ; গাণিতিক মডেল ; তীব্রতা পূর্বাভাস।

নবম অধ্যায় : **জলোচ্ছ্বাস** ৭৪-৯০

জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির কারণ ; চাপ-ঘাটতি ; বাতাস ; বৃষ্টি ; পর্যায় ; সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস ; ঘূর্ণিঝড়ভিত্তিক নির্ভরশীলতা ; ডানপাশ বনাম বামপাশ ; গতিপথ ; গতি ; সর্বোচ্চ-বাতাস ব্যাসার্ধ ; আঘাতের সময় ; বিস্তৃতি ; অঘূর্ণিঝড়ভিত্তিক নির্ভরশীলতা ; সমুদ্রের গভীরতা ; বঙ্গোপসাগরের সরুতা ; চট্টগ্রাম উপকূলের প্রভাব ; গতিপথ ও চট্টগ্রাম উপকূল ; জোয়ারভাটা ; নদ-নদীর অবস্থান ; দ্বীপের উপস্থিতি ; পানির পিছন প্রভাব ; জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস।

দশম অধ্যায় : **পরিসংখ্যান** ৯১-১১০

বিশ্ব পরিসংখ্যান ; আঞ্চলিক পরিসংখ্যান ; উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর ; উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পূর্বাংশ ; উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ ; দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগর ; অস্ট্রেলিয়া এলাকা ; বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর ; প্রবণতা ; মাসিক পরিবর্তন ; বঙ্গোপসাগর এলাকায় দেশভিত্তিক বিভাজন ; ভারত ; মিয়ানমার ; শ্রীলংকা ; মৃত ঘূর্ণিঝড় ; বাংলাদেশ।

একাদশ অধ্যায় : **এল নিনিও** ১১১-১২২

ভূমিকা ; নামকরণ ; এল নিনিওর প্রকারভেদ ; রেকর্ড ; বিশ্বজনীন প্রভাব ; টেলিসংযোগ ; দখিনা দোলন ; ওয়াকার সংবহন ; এনসো ; দখিনা দোলন সূচক ও এল নিনিও ; তত্ত্ব ; বাণিজ্য বায়ু তত্ত্ব ; পেরু স্রোত তত্ত্ব ; তরঙ্গ তত্ত্ব ; বাংলাদেশের উপর প্রভাব।

পরিশিষ্ট ১ : **বাংলাদেশে আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড় (মাসভিত্তিক)** ১২৩-১৪০

পরিশিষ্ট ২ : **বাংলাদেশে আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড় (বছরভিত্তিক)** ১৪১-১৪৪

গ্রন্থপঞ্জি ১৪৫-১৪৭

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রকৃতি একটি স্বাভাবিক নিয়মে চলে। মাঝে মধ্যে এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। আর এ ব্যতিক্রম ডেকে আনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মানুষ প্রাণ হারায়, পশু–পাখি মারা যায়, সম্পত্তির ক্ষতি হয়, ফসল হয় বিনষ্ট। ঘূর্ণিঝড় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের এ রকম একটি ব্যতিক্রম। আবহমান কাল ধরে এ ব্যতিক্রম চলে আসছে, বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। এটি বন্ধ করা সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু এর প্রলয়ংকারী ছোবল থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা চালানো। প্রচেষ্টা চালাতে গেলে, আত্মরক্ষা করতে হলে প্রয়োজন ঘূর্ণিঝড়কে জানার। দরকার এটি কেন হয়, কোথায় হয়, কি কারণে হয়, কি এর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা।

পৃথিবীকে চারদিকে ঘিরে আছে এর বায়ুমণ্ডল। ঘূর্ণিঝড় এ বায়ুমণ্ডলেরই একটি বিশেষ অবস্থার বহি:প্রকাশ। বায়ুমণ্ডল প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তন আসছে এর চাপে, তাপে ও তাপমাত্রায়, বাতাসে, জলীয়বাষ্পে, প্রভৃতিতে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বায়ুর এ পরিবর্তনশীল অবস্থানকে বলে ঐ স্থানের ঐ সময়ের আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের বা এলাকার কয়েক বছরের আবহাওয়ার গড়কে বলে জলবায়ু। যেমন সকালে বৃষ্টি ও প্রবল বাতাস, দুপুরে পরিষ্কার আকাশ, সন্ধ্যায় মৃদু বাতাস, এগুলো হলো দৈনন্দিন আবহাওয়া। আর গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি ও গরম, শীতকালে ঠাণ্ডা ও কম বৃষ্টি, ইত্যাদি হলো জলবায়ু। আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতির জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আবহাওয়া বিজ্ঞান

আবহাওয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বলে আবহাওয়া বিজ্ঞান। এ সংজ্ঞায় জলবায়ুকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ঘূর্ণিঝড় আবহাওয়া বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ অংগ। আবহাওয়া বিজ্ঞান পৃথিবীর প্রাচীনতম বিজ্ঞানের অন্যতম। মানবজাতির সৃষ্টির শুরু হতে মানুষ আবহাওয়া দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়ে আসছে। কিন্তু প্রাচীনতম বিজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সমসাময়িক বিজ্ঞানের তুলনায় এর সে রকম উন্নতি হয়নি বললে চলে। তার প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলের বিশাল ব্যাপ্তি। বায়ু কোনো ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতি মুহূর্তে এর অবস্থান ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর একপ্রান্তের বায়ু কিছুক্ষণের মধ্যে অন্যপ্রান্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে। বায়ুর এ অনুভূমিক ভ্রমণের ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত অন্য প্রান্তকে প্রভাবিত করছে। তাই তো প্রায়ই দেখা যায় দক্ষিণ

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যখন অস্বাভাবিক গরম সমুদ্র পানি পরিলক্ষিত হয়, যাকে বলে এল নিনিও (একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তখন অস্ট্রেলিয়া-ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে আবির্ভূত হয় খরা এবং যুক্তরাষ্ট্র-জাপানে পড়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

বায়ুর অনুভূমিক প্রচলন ছাড়াও রয়েছে এর উপরে-নিচে ভ্রমণ। পৃথিবীপৃষ্ঠের আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের আবহাওয়া একে অন্যকে প্রভাবিত করে। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তর মানুষের কাছে বহুদিন ছিল দুর্ভেদ্য। এটি আবহাওয়া বিজ্ঞানের অনগ্রসতার আরেকটি প্রধান কারণ। এ ছাড়া অনগ্রসরতার অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে স্থল ও জলভাগের অবস্থান ও অনুপাত, পর্বতের অবস্থান ও উচ্চতা, এদের দুর্ভেদ্যতা, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, পৃথিবীতে সূর্যতাপের তারতম্যতা ইত্যাদি এবং এগুলো কর্তৃক অতি জটিল প্রক্রিয়ায় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের রহস্য উদ্ঘাটনের সমূহ অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা।

আবহাওয়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির আরেকটি বড় অন্তরায় হচ্ছে উপাত্ত সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ। স্থান-কালভেদে উপাত্ত/তথ্যের পরিবর্তন ঘটছে। সময় ভিত্তিতে ঊর্ধ্বাকাশের উপাত্ত সংগ্রহ যেমন সমস্যা, তেমনি সমস্যা সমুদ্র ও পাহাড়ি এলাকার উপাত্ত পাওয়া। উপাত্ত দু'রকমের হতে পারে : অতীত উপাত্ত (past data) এবং তাৎক্ষণিক উপাত্ত (real time data)। আবহাওয়াকে জানা এবং এর পূর্বাভাসের জন্য উভয় প্রকার উপাত্তের প্রয়োজন। অতীত উপাত্ত (যদি থাকে) গ্রহণে সে রকম বড় ধরনের সমস্যা না হলেও তাৎক্ষণিক উপাত্ত সমগ্র বিশ্ব থেকে কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিকভাবে পাওয়া এবং এ বিপুল পরিমাণ উপাত্তের বিশ্লেষণ করা একটি অসম্ভব ব্যাপার।

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে সহজেই অনুমান করা যায় কেন আবহাওয়া বিজ্ঞান একটি প্রাচীনতম বিজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও এখনো অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় সে রকম অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি এবং কেনই বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস সর্বদা সঠিক হয় না।

যাহোক, আবহাওয়া বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা নিকট অতীতের তুলনায় অনেক উন্নত। এ উন্নতিতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ (Artificial earth satellite) এবং কম্পিউটার। ভূ-উপগ্রহ সর্বক্ষণ সারা বিশ্বের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ সম্ভব করেছে। আর উন্নত কম্পিউটার সম্ভব করেছে অতি অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত বিশ্লেষণ। আর উভয়ের সাহায্যে সম্ভব হচ্ছে প্রায় নিমিষে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উপাত্ত ও তথ্যের আদান-প্রদান। যার পরিণতিতে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'তথ্য মহাসড়ক' বা Information superhighway-এর এবং পৃথিবী নামক গ্রহটি রূপান্তরিত হয়েছে পৃথিবী নামক 'গ্রামে' বা Global village-এ।

আগেই বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় আবহাওয়া বিজ্ঞানেরই একটি অংশবিশেষ। আবহাওয়া বিজ্ঞানের ন্যায় ঘূর্ণিঝড়ও একটি কঠিন এবং জটিল বিষয় এবং এর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো সীমিত। এ সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে অতি সহজভাবে আলোকপাত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আলোচনায় গাণিতিক এবং অন্যান্য কঠিন বিষয়াদি যতদূর সম্ভব পরিহার করা হবে।

ঘূর্ণিঝড়ের সংজ্ঞা ও নামকরণ

ঘূর্ণিঝড় মানে ঘূর্ণায়মান প্রচণ্ড বাতাস। ইংরেজিতে একে বলা হয় সাইক্লোন (Cyclone)। আমাদের দেশে উভয় শব্দই প্রচলিত। সাইক্লোন শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন ক্যাপ্টেন হেনরী পিডিংটন (Henry Piddington) ১৮৪৮ সালে। এর মূল উৎস হচ্ছে গ্রীক শব্দ 'কাইক্লোস' (Kyklos) যার অর্থ সাপের প্যাঁচ। নামকরণের বহু বছর পর আবিষ্কৃত কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ থেকে নেয়া সাইক্লোনের ছবি দেখলে তাই মনে হয়। নামটি যে সার্থক, সাইক্লোনের ছবি তা প্রমাণ করে।

আমাদের দেশে সাইক্লোনকে কখনো কখনো আবার তুফানও বলা হয়। তুফান শব্দ চীন ভাষায় 'তাই–ফং' (Thai-fong) হতে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। তাই–ফং থেকে সাইক্লোনের আরেক নাম 'টাইফুন' (Typhoon)ও এসেছে।

কোনো কোনো দেশে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এবং জাপানে প্রত্যেকটি ঘূর্ণিঝড়কে মেয়েদের নামে নামকরণ করা হয়। আমাদের এলাকায় তারিখ অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের পরিচিতি প্রচলিত। যেমন ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়, ইত্যাদি।

ঘূর্ণিঝড়ের উৎস সমুদ্র। এজন্য একে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বলা হয়। সমুদ্রে কখনো কখনো 'পানি ঝড়' বা 'ওয়াটার স্পাউট' (water spout)ও দেখা যায়। এটি অনেকটা স্থলভাগে ধূলিঝড়ের (dust storm) মতো। পানি ঝড় খুব স্বল্প স্থায়ী এবং পরিসরে খুবই ছোট। এটি ঘূর্ণিঝড়ের সংজ্ঞার বহির্ভূত। আমাদের দেশে অনেক সময় স্থলদেশের ঝড়কেও ঘূর্ণিঝড় বলা হয়। স্থলভাগের ঘূর্ণিঝড়ের বিশেষ বিশেষ নাম রয়েছে। যেমন টর্নেডো, কালবৈশাখী, ইত্যাদি। অন্যথা না বললে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়কেই আমাদের আলোচনায় ঘূর্ণিঝড় হিসেবে ধরে নেয়া হবে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রকারভেদ

অক্ষাংশভেদে ঘূর্ণিঝড়কে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে : ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং অক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের (সাধারণত ৩০° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে) ঘূর্ণিঝড়কে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (tropical cyclone) এবং এ অঞ্চলের বাইরের ঘূর্ণিঝড়কে অক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (extratropical cyclone) বলা হয়। আকার, গঠন, জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু, সবদিক দিয়ে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ক্রান্তীয় সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, কেননা বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বা ঘূর্ণিঝড় পৃথিবীর বিভিন্ন ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ১.১ সারণিতে এদের স্থানীয় নামসমূহ দেয়া হয়েছে। তবে সবকটিই সাধারণ নাম ট্রপিক্যাল সাইক্লোন হিসেবে বেশি পরিচিত। জাপান এলাকায় অবশ্য টাইফুন এবং আমেরিকায় হারিকেন (Hurricane) বেশি ব্যবহৃত হয়। হারিকেন স্পেনিশ শব্দ 'Huracan' থেকে উদ্ভূত। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে 'Huracan' কে অমংগলের দেবতা (god of evil) বলা হতো।

Dhaka

সারণি ১.১ : বিভিন্ন এলাকার ঘূর্ণিঝড়ের স্থানীয় নাম।

এলাকা	স্থানীয় নাম
উত্তর ভারত মহাসাগর (বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর)	সাইক্লোন বা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন (Tropical cyclone)
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর	হারিকেন (Hurricane)
উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর	টাইফুন (Typhoon)
অস্ট্রেলিয়ার নিকটে	উইলি উইলিস (Willy-willies)
উত্তর–পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর	পাপাগ্যালোস (Papagallos)
ফিলিপাইনের নিকট	বাগুই (Baguios)
মাদাগাস্কারের নিকট	ট্রোভাডোজ (Trovadoes)

ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতি অনুযায়ী আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড়কে সাত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। শ্রেণীগুলো ১.২ সারণিতে দেখানো হলো। সারণিতে বাতাসের বেগের চারটি একক দেয়া হয়েছে। বুফোর্ট স্কেল (Beaufort scale), মাইল/ঘণ্টা (প্রতি ঘণ্টায় কত স্টেটুট মাইল), নট (Knot-Nautical miles per hour) এবং কিলোমিটার/ঘণ্টা। গতিভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ মূলত বুফোর্ট স্কেলের উপর ভিত্তি করে করা। এ স্কেলটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজকীয় নৌবাহিনীর (বৃটিশ) এডমিরাল বুফোর্ট প্রবর্তন করেন এবং তারই নামানুসারে এ স্কেলের নামকরণ করা হয়েছে। এ স্কেল সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (World Meteorological Organization-WMO) শ্রেণী বিভাজনে ১.২ সারণির প্রথম চারটিকে একটি শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে এবং সাইক্লোনিক শব্দের পরিবর্তে ট্রপিক্যাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার বিভাজন ১.৩ সারণিতে দেয়া হয়েছে।

আমাদের এলাকা দিয়ে যখন দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় তখন সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়কে সাধারণত মৌসুমী নিম্নচাপ (Monsoon depression) বলা হয়। এদের ক্ষেত্রে বাতাসের গতি কদাচিৎ নিম্নচাপের উপরের শ্রেণীতে পৌঁছে।

আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে নেয়া ঘূর্ণিঝড়ের মেঘের ছবির গঠন বা প্যাটার্ন (pattern) ও বাতাসের গতি অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের জন্য পনেরটি টি–নম্বর (T--Tropical number) ব্যবহার করা হয়। সর্বনিম্ন টি–নম্বর হচ্ছে ১ এবং সর্বোচ্চ ৮। নম্বর ০.৫ করে বাড়ে। এ নম্বর দ্বারা সর্বোচ্চ বাতাসের গতি নির্ণয় করা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের ছবি বিশ্লেষণ করে তার প্যাটার্ন দেখে টি–নম্বর ঠিক করা হয়। টি–নম্বর সম্পর্কে বিস্তারিত সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ১.২ : সর্বোচ্চ–বাতাসভিত্তিক ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণীবিভাগ।

শ্রেণী	বাতাসের সর্বোচ্চ গতি			
	বুফোর্ট স্কেল	মাইল/ ঘণ্টা	নট	কিলোমিটার / ঘণ্টা
১. লঘু চাপ (Low)	৪ এর নিচে	১৯ এর নিচে	১৭ এর নিচে	৩১ এর নিচে
২. স্পষ্ট লঘুচাপ (Well-marked low)	৫	১৯–২৪	১৭–২১	৩১–৩৯
৩. নিম্নচাপ (Depression)	৬	২৫–৩১	২২–২৭	৪০–৫০
৪. গভীর নিম্নচাপ (Deep depression)	৭	৩২–৩৮	২৮–৩৩	৫১–৬১
৫. ঘূর্ণিঝড় (Cyclonic storm)	৮–৯	৩৯–৫৪	৩৪–৪৭	৬২–৮৭
৬. প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (Severe cyclonic storm)	১০–১১	৫৫–৭৩	৪৮–৬৩	৮৮–১১৭
৭. হারিকেন গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় (Severe cyclonic storm with a core of hurricane winds)	১২ বা তার ঊর্ধ্বে	৭৩ এর ঊর্ধ্বে	৬৩ এর ঊর্ধ্বে	১১৭ এর ঊর্ধ্বে

বিপরীত ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড়ের উল্টোটা হলো বিপরীত ঘূর্ণিঝড় বা এন্টিসাইক্লোন (Anticyclone)। কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস যে দিকে ঘোরে, বিপরীত ঘূর্ণিঝড়ে বাতাস ঠিক তার উল্টোদিকে ঘোরে। ঘূর্ণিঝড়ে বাতাস কেন্দ্রাভিমুখী, বিপরীত ঘূর্ণিঝড়ে বাতাস কেন্দ্র–বহির্মুখী। ঘূর্ণিঝড়ের উপরে বিপরীত ঘূর্ণিঝড় অবস্থান করে।

সারণি ১.৩ : ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণী বিভাজন (বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা অনুযায়ী)।

শ্রেণী	বাতাসের বেগ (নট)
ক. গ্রীষ্মমণ্ডলীয় নিম্নচাপ (Tropical depression)	সর্বোচ্চ ৩৩ পর্যন্ত
খ. মাঝারি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় স্টরম (Moderate tropical storm)	৩৪–৪৭
গ. প্রচণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলীয় স্টরম (Severe tropical storm)	৪৮–৬৩
ঘ. হারিকেন বা স্থানীয় নাম (Hurricane or local synonym)	৬৪ এর ঊর্ধ্বে

দ্বিতীয় অধ্যায়

বায়ু ও বায়ুমণ্ডল

ঘূর্ণিঝড় বায়ুমণ্ডলে বায়ু প্রবাহের একটি বিশেষ অবস্থা। ঘূর্ণিঝড়কে বুঝতে হলে বায়ু ও বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। তাই বায়ু ও বায়ুমণ্ডল নিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনা।

বায়ুর গঠন

পৃথিবীকে চারদিকে ঘিরে আছে এর বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল বা বায়ু অনেকগুলো গ্যাসের সমষ্টি। তন্মধ্যে বেশিরভাগই নাইট্রোজেন। অত:পর অক্সিজেন, যে অক্সিজেন আমরা প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসের সাথে নিই। আয়তনের দিক দিয়ে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রে বায়ুর শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ দখল করে আছে (নাইট্রোজেন প্রায় ৭৮%এবং অক্সিজেন প্রায় ২১%)। বাকি প্রায় ১% এর মতো রয়েছে অন্যান্য গ্যাস, যেমন জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড, র‍্যাডন, আরগন, নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, হাইড্রোজেন, জিনোন, ওজোন, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ইত্যাদি।

বায়ুর সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল উপাদান হচ্ছে জলীয়বাষ্প। জলীয়বাষ্পও একটি গ্যাস। বায়ুতে এর সর্বোচ্চ পরিমাণ আয়তনের দিক দিয়ে প্রায় ৪-৫ শতাংশ। কখনো কখনো শূন্যের কাছাকাছি হতে পারে। বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকলে এ বায়ুকে বলা হয় আর্দ্র বায়ু আর একেবারে না থাকলে বলে শুষ্ক বায়ু। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বেশি পরিমাণে থাকলেও আবহাওয়ার উপর এদের কোনো প্রভাব নেই বললেই চলে। জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ওজোন আবহাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রভাবশীল উপাদান। জলীয়বাষ্প বৃষ্টির উৎস এবং ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রীনহাউস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। আর ওজোন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে (Ultra-violet radiation) শুষে পৃথিবীকে এ রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে। পৃথিবীতে বিভিন্ন শিল্প থেকে উদগীরিত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (Chlorofluoro carbon-CFC) নামে একপ্রকার গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে ওজোনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং সি এফ সি-এ দুটি গ্যাসের বৃদ্ধি সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগানো আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

বায়ুর তাপমাত্রা

পৃথিবী এবং এর বায়ুমণ্ডলের তাপের (heat) মূল উৎস সূর্য। সূর্য কিরণ বা সূর্যের তাপ সকল সময় সমানভাবে সকল স্থানে পড়ে না বিধায় স্থান-কালভেদে তাপমাত্রার (temperature) তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে স্থান ও সময় ভেদে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। অক্ষাংশ এবং উচ্চতার সাথেও তাপমাত্রার পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ু বেশি গরম এবং মেরু অঞ্চলে বেশি ঠাণ্ডা। পাহাড়ের পাদদেশের তুলনায় এর উপরে তাপমাত্রা কম। আবহাওয়া বিজ্ঞানে তাপমাত্রার একক হিসেবে ডিগ্রি সেলসিয়াস (Celsius), ফারেনহাইট (Fahrenheit) এবং পরম তাপমাত্রা (Absolute বা Kelvin) ব্যবহৃত হয়।

তাপ ও তাপমাত্রার পরিবর্তন/তারতম্য আবহাওয়া বিজ্ঞানে মূল ভূমিকা পালন করে। অধিক তাপমাত্রা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিরও একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। এ সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

বায়ুর চাপ

সকল বস্তুর ন্যায় বায়ুরও ওজন আছে। ওজন একপ্রকার বল (force)। প্রতি একক ক্ষেত্রফল এলাকায় বায়ুর ওজনকে বায়ুর চাপ (pressure) বলে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে একক ক্ষেত্রফল হিসেবে এক বর্গসেন্টিমিটার এলাকা ধরা হয়। আর চাপের একককে বলে মিলিবার (millibar)। এক মিলিবার চাপ এক বর্গসেন্টিমিটার এলাকার উপর এক হাজার ডাইন (dyne) বলের সমান (ওজনের একককে ডাইন ধরে)। ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের পরিমাণ প্রায় ১ বার (bar) বা ১০০০ মিলিবার। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে ১ বর্গসেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বায়ুর একটি খাড়া কলামের (ভূপৃষ্ঠ থেকে সোজা উপরের দিকে পুরো বায়ুমণ্ডলের) ওজন প্রায় ১০০০ মিলিবার। সাধারণত ১০০০ মিলিবারের কিছু বেশি। প্রায় ১০১৩ মিলিবার। স্থান বিশেষে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। চাপকে কখনো ইঞ্চিতে বা মিলিমিটারেও প্রকাশ করা হয়। ১ ইঞ্চি চাপ প্রায় ৩৩.৮৬ মিলিবারের সমান। আর ১ মিলিবার প্রায় ০.০৩ ইঞ্চি বা ০.৭৬ মিলিমিটারের সমান। বর্তমানে মিলিবারের সাথে/বদলে বিজ্ঞানী প্যাসকেলের (Pascal) নামানুসারে হেক্টো-প্যাসকেল (Hecto-Pascal)ও ব্যবহৃত হচ্ছে। এক হেক্টো-প্যাসকেল এক মিলিবারের সমান।

ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ সবচেয়ে বেশি। উচ্চতার সাথে বায়ুর চাপ কমে ; কারণ তাতে বায়ুর পরিমাণ কমতে থাকে। সেজন্য উড়োজাহাজে বায়ুর চাপ পৃথিবীর চাপের কাছাকাছি রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। উচ্চতার সাথে চাপ কিভাবে কমে তার একটি ধারণা ২.১ সারণি থেকে পাওয়া যেতে পারে। এটি একটি আদর্শিক অবস্থা। বাস্তবে এর কিছু পরিবর্তন হতে পারে।

সারণি ২.১ : উচ্চতার সাথে বায়ুর চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন (একটি আদর্শিক অবস্থা)।

উচ্চতা (কিলোমিটার)	চাপ (মিলিবার)	ঘনত্ব (কিলোগ্রাম/ঘনমিটার)
০০	১০১৩	১.২২৬
০১	৮৯৯	১.১১২
০২	৭৯৫	১.০০৭
০৩	৭০১	০.৯০৯
০৪	৬১৬	০.৮১৯
০৫	৫৪০	০.৭৩৬
০৬	৪৭২	০.৬৬০
০৭	৪১১	০.৫৯০
০৮	৩৫৬	০.৫২৫
০৯	৩০৭	০.৪৬৬
১০	২৬৪	০.৪১৩
১১	২২৬	০.৩৬১
১২	১৯৩	০.৩০৯
১৩	১৬৫	০.২৬৪
১৪	১৪১	০.২২৬
১৫	১২১	০.১৯৩
১৬	১০৩	০.১৬৫
১৭	০৮৮	০.১৪১
১৮	০৭৬	০.১২১
১৯	০৬৫	০.১০৩
২০	০৫৫	০.০৮৮

সমচাপ রেখা ও সমচাপ পৃষ্ঠ

সমান চাপবিশিষ্ট বিভিন্ন স্থানকে যে রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় তাকে সমচাপ রেখা (Isobar) বলে। সমচাপ রেখা সরল, বক্র ও বৃত্তাকার হতে পারে। আর যে পৃষ্ঠে (ভূপৃষ্ঠেই হোক বা তার উপরেই হোক) চাপ সমান থাকে তাকে বলা হয় সমচাপ পৃষ্ঠ (Isobaric surface)। যেমন ১০০০ মিলিবার সমচাপ পৃষ্ঠ বললে আমরা মোটামুটি ভূপৃষ্ঠকেই বুঝবো। সমচাপ পৃষ্ঠ সাধারণত সমতল (plane) হয় না। একই সমচাপ পৃষ্ঠ বিভিন্ন উচ্চতায় হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের উপরে ৫০০ মিলিবারের সমচাপ পৃষ্ঠ বললে আমরা বুঝবো এ পৃষ্ঠের প্রত্যেক বিন্দুতে চাপ ৫০০ মিলিবার; কিন্তু বিভিন্ন বিন্দুর বিভিন্ন উচ্চতা হতে পারে।

সমচাপ রেখা ও সমচাপ পৃষ্ঠ আবহাওয়া বিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্যারামিটার (parameter)।

বায়ুর ঘনত্ব

চাপ বাড়লে বায়ুর আয়তন (volume) কমে এবং চাপ কমলে আয়তন বাড়ে। বায়ুর ভরের (mass) সাথে বায়ুর আয়তনের সম্পর্ককে ঘনত্ব (density) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ

$$\text{ঘনত্ব} = \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}$$

আয়তনের একক হিসেবে এক ঘন সেন্টিমিটার সাধারণত ধরা হয়। ভরের কোনো পরিবর্তন না করে আয়তন বাড়ালে বা চাপ কমালে বায়ুর ঘনত্ব কমবে আর আয়তন কমালে বা চাপ বাড়ালে বায়ুর ঘনত্ব বাড়বে। অর্থাৎ চাপ দিলে ঘনত্ব বাড়ে এবং চাপ কমালে ঘনত্ব কমে। উচ্চতার সাথে বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে। কারণ উচ্চতা বাড়লে চাপ কমে এবং চাপ কমলে বায়ু আয়তনে বাড়ে। কাজেই ঘনত্ব কমে। ২.১ সারণিতে বায়ুমণ্ডলের নিম্নভাগে উচ্চতার সাথে ঘনত্ব কিভাবে কমে তাও দেয়া হয়েছে।

ঘনত্ব আবার তাপের সাথেও সম্পর্কিত। কোনো নির্দিষ্ট চাপে (অর্থাৎ চাপের কোনো পরিবর্তন না করে) তাপ বাড়ালে ঘনত্ব কমবে এবং তাপ কমালে ঘনত্ব বাড়বে। এ থেকে বলা হয় গরম বায়ু হালকা এবং ঠাণ্ডা বায়ু ভারি। বায়ুর ঘনত্ব আবহাওয়া বিজ্ঞানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার।

বায়ুমণ্ডলের স্তর

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে উপরের দিকে বিস্তৃত। এর সর্বনিম্ন সীমা জানা থাকলেও সর্বোচ্চ সীমার কোনো পরিমাণ নেই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ক্রমশ সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশে গেছে।

বায়ুমণ্ডলের স্তর বিভাজন প্রধানত তাপমাত্রাভিত্তিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি মনে করা হতো উচ্চতার সাথে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশ কমে। কিন্তু পরবর্তীতে এবং আরো পরে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে যে উচ্চতা ভেদে তাপমাত্রা কমে ও বাড়ে। দুটি স্তরে উচ্চতার সাথে তাপমাত্রা কমে এবং দুটিতে বাড়ে। তাই তাপমাত্রার ভিত্তিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)
স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)
মেজোস্ফিয়ার (Mesosphere)
থার্মোস্ফিয়ার (Thermosphere)

এ চারটি স্তর ২.১ চিত্রে দেখানো হয়েছে।

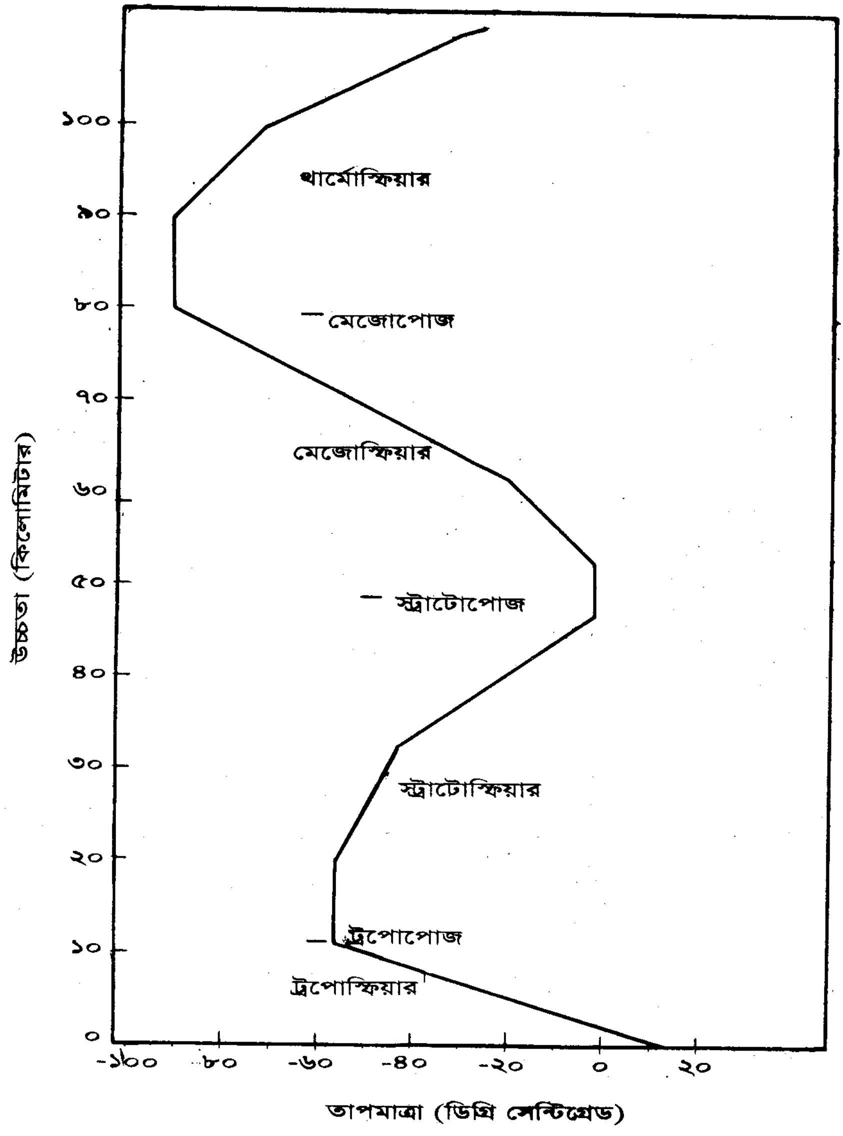

চিত্র ২.১ : উচ্চতার সাথে তাপমাত্রার পরিবর্তন অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলের চারটি স্তর।

ট্রপোস্ফিয়ার

ট্রপোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর। এখানে তাপমাত্রা উচ্চতার সাথে কমে। প্রতি কিলোমিটারে তাপমাত্রার পরিমাণ কমে প্রায় ৬.৫°C। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায়—৬০°C এ স্তরের শেষ সীমায় পরিলক্ষিত হয়। ট্রপোস্ফিয়ার উপর দিকে ক্রমশ ঠাণ্ডা হওয়াতে এর অবস্থা অনেকটা মাথা ভারির মতো। এতে বায়ু ওলট–পালট খায়। সে জন্য এর নাম গ্রীক শব্দ ট্রপোজ (Tropos যার ইংরেজি অর্থ টার্ন, Turn) হতে উদ্ভূত। ট্রপোস্ফিয়ারের শেষ সীমাকে বলা হয় ট্রপোপোজ (Tropopause) অর্থাৎ ট্রপোস্ফিয়ারের বিরতি বা পোজ (Pause)। ট্রপোপোজের গড় উচ্চতা বা ট্রপোস্ফিয়ারের গড় বিস্তৃতি (extent) প্রায় ১১ কিলোমিটার। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃতি সর্বাধিক এবং মেরু অঞ্চলে সর্বনিম্ন। ঋতু পরিবর্তনের সাথেও এ বিস্তৃতি উঠা–নামা করে। গ্রীষ্মকালে বেশি এবং শীতকালে কম। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস বা উপাদানের প্রায় ৮৫% ট্রপোস্ফিয়ারে সীমাবদ্ধ। এ ট্রপোস্ফিয়ারেই আমরা বাস করি। আবহাওয়ার বা ঘূর্ণিঝড়ের বেশিরভাগই এ স্তরের সাথে জড়িত।

স্ট্রাটোস্ফিয়ার

ট্রপোস্ফিয়ারের উপরে স্ট্রাটোস্ফিয়ার অবস্থিত। এ স্তরের নিম্নভাগে তাপমাত্রা অনেকটা অপরিবর্তিত থাকলেও পরে উচ্চতার সাথে বাড়ে এবং এর সর্বোচ্চ সীমানায় (প্রায় ৪৫ কিলোমিটার) প্রায় শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে। এ স্তরের সর্বোচ্চ সীমানাকে বলে স্ট্রাটোপোজ (Stratopause), অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বিরতি বা পোজ। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে তাপমাত্রা উচ্চতার সাথে বাড়ার দরুন এখানকার অবস্থা নিচ ভারির মতো। বায়ু এখানে অনেকটা স্তরে স্তরে থাকে। ইংরেজিতে বলা হয় বায়ুর স্ট্রাটা (Strata) বা বিন্যাস বা স্ট্রাটিফাইড বায়ু (Stratified air) বা বিন্যস্ত বায়ু। তাই এ স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার। আবহাওয়ার উপর স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বেশ প্রভাব রয়েছে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় স্ট্রাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

মেজোস্ফিয়ার

মেজোস্ফিয়ার স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপরে অবস্থিত। এখানে তাপমাত্রা কমতে থাকে। প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত এ হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়। এ উচ্চতায় তাপমাত্রা প্রায় –১০০°C –এ নেমে আসে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার এ উচ্চতাকে মেজোপোজ (Mesopause) বলে। স্ট্রাটোপোজ এবং মেজেপোজের মধ্যের স্থানকে বলা হয় মেজোস্ফিয়ার।

থার্মোস্ফিয়ার

বায়ুমণ্ডলের শেষ স্তর হলো থার্মোস্ফিয়ার। স্তরটি শেষ পর্যন্ত সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশে গেছে। এখানে তাপমাত্রা উচ্চতার সাথে ক্রমশ বাড়তে থাকে। স্তরটি বেশ গরম। তাই হয়তো এর নাম থার্মোস্ফিয়ার। থার্মোস্ফিয়ারের নিচের অংশে আয়ন কণা (ionized particles)

বিদ্যমান। সূর্যরশ্মি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে আয়ন সৃষ্টি করে। সে হিসেবে এ স্তরকে, বিশেষ করে, এর নিচের অংশকে আয়নমণ্ডলও (ionosphere) বলা হয়, যদিও বর্তমানে অধিক ব্যবহৃত শব্দ থার্মোস্ফিয়ার ব্যবহার করা হয়। আয়নমণ্ডল ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গকে (short radio waves) পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত করে বেতার যোগাযোগে সহায়তা করে। পৃথিবী থেকে ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের দিকে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান থেকে আয়ন কণা দ্বারা এ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে অনেক দূরে শ্রুত হয়।

আগেরকার এক বিভাজক অনুযায়ী থার্মোস্ফিয়ারকে এগ্‌জোস্ফিয়ার (exosphere)ও বলা হতো। কারণ এ স্তরে উচ্চ তাপ, হালকা ঘনত্ব এবং পৃথিবীর স্বল্প মাধ্যাকর্ষণ বল পরমাণু ও অণুকে মহাকাশে চলে যেতে (exit) সাহায্য করে। থার্মোস্ফিয়ারের উপরিভাগকে আবার ম্যাগনেটোস্ফিয়ার (magnetosphere) বা প্রটোস্ফিয়ার (protoshere) বলা হয় ; কারণ এখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের তুলনায় পৃথিবীর চুম্বক বল (magnetic force) অনেক বেশি এবং চুম্বক শক্তি এখানকার প্রধান উপাদান প্রোটনকে (proton) নিয়ন্ত্রণ করে।

ওজোনস্তর

আয়নমণ্ডলের মতো বায়ুর উপাদানের উপর ভিত্তি করে ওজোনস্তর (Ozonoshere) নামে আরেকটি স্তরের নামকরণ করা হয়েছে। এ স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ার জুড়ে বেশিরভাগ বিস্তৃত। এ স্তরের প্রধান উপাদান ওজোন সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মিকে (ultra-violet rays) শুষে (absorb) পৃথিবীপৃষ্ঠে এর আগমনকে বাধা দেয়। ফলে এখানে তাপ ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। বিভিন্ন শিল্প থেকে উদগত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাস ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে ওজোনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে অতিবেগুনি রশ্মি ওজোনস্তরে কম বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। পৃথিবীর কুমেরু অঞ্চলে তাই দেখা দিয়েছে ওজোন গর্তের (Ozone hole)।

জলীয়বাষ্প, মেঘ ও বৃষ্টি

জলীয়বাষ্প, মেঘ ও বৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়ের একটি প্রধান অংশ। জলীয়বাষ্প ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির মূল উৎস। উপগ্রহের সাহায্যে গৃহীত ঘূর্ণিঝড়ের ছবি মেঘেরই ছবি আর বৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়ের একটি বহিঃপ্রকাশ। ভূপৃষ্ঠ হতে পানি বাষ্প হয়ে আকাশে ওড়ে, ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে এবং ভারি হয়ে বৃষ্টি ও বরফ (যেমন শিলা) রূপে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। একে বলা হয় হাইড্রোলজিক সাইকেল (Hydrologic cycle)। পানি পদার্থের তিনটি আকারই ধারণ করতে পারে। যেমন জলীয়বাষ্প (বায়বীয় পদার্থ), পানি (তরল পদার্থ) এবং বরফ (কঠিন পদার্থ)। পৃথিবীর তাপমাত্রার মধ্যে পানি এ তিনটি রূপ ধারণ করতে পারে বলেই আবহাওয়া বিজ্ঞানে এর গুরুত্ব অনেক।

জলীয়বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি ও বরফ আবহাওয়া বিজ্ঞানে একটি বড় বিষয়। আমরা এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না এবং সে ধরনের আলোচনার তেমন সুযোগও

(scope) এখানে নেই। ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য যতটুকু দরকার মনে হয়, আলোচনা মোটামুটিভাবে তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

বাষ্পীভবন ও জলীয়বাষ্প

জলীয়বাষ্পের প্রধান প্রধান উৎস হচ্ছে সমুদ্র, হ্রদ, নদী, জলাশয় এবং ভেজা মাটি। তা ছাড়া গাছপালা থেকে প্রস্বেদনের (transpiration) মাধ্যমে জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলে যাচ্ছে। আর গাছপালা দ্বারা আবৃত ভূমি থেকে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের (evapotranspiration) সাহায্যে জলীয়বাষ্প আকাশে আসে। ঘূর্ণিঝড়ের বেলায় জলীয়বাষ্পের প্রধান উৎস হচ্ছে সমুদ্র।

প্রতিটি বস্তুর অণু (molecule) চতুর্দিকে ইতঃস্তত ছুটাছুটি করে। এ ছুটাছুটি বস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। পানির ক্ষেত্রেও তাই হয়। সূর্য থেকে প্রাপ্ত তাপে পানির অণু শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে ছুটাছুটি করে। অর্থাৎ তাপশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ছুটাছুটিতে পানিতে একপ্রকার ঊর্ধ্বমুখী চাপের সৃষ্টি হয়। বায়ু আবার পানির উপর নিম্নমুখী চাপ দেয়। মাধ্যাকর্ষণ বলও পানির অণুকে নিচের দিকে টানে। ছুটাছুটিতে অণুর গড় গতির চেয়ে কিছু অণুর গতি যদি অধিক হয়, অন্য কথায় ঊর্ধ্বমুখী চাপ যদি বায়ুর নিম্নমুখী চাপ ও মাধ্যাকর্ষণ বলের তুলনায় বেশি হয়, তখন পানির পৃষ্ঠ থেকে অধিক গতিসম্পন্ন অণুগুলো বায়ুতে এসে পড়ে এবং বাষ্পে পরিণত হয়। একে বলে বাষ্পীভবন। জলীয়বাষ্প বায়ুর চেয়ে হালকা বলে উপরে উঠে যায়।

যে অণুগুলো বায়ুতে চলে যায়, পানির অন্যান্য অণুর চেয়ে এদের শক্তি বা তাপ বেশি। বায়ুতে চলে আসা অণু তার সাথে যে শক্তি নিয়ে এলো, তা অণুর মধ্যে সুপ্ত (latent) থাকে। এ শক্তিকে বলা হয় বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপ (latent heat of vapourization)। এ তাপের পরিমাণ অনেক। এক গ্রাম পানিকে ১০০°C তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত করতে প্রায় ৫৪০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন। অর্থাৎ এক গ্রাম পরিমাণ পানির বাষ্পে ৫৪০ ক্যালরি তাপ সুপ্ত বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।

বাষ্পীভবন বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হতে পারে। যেমন তাপমাত্রা, বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, বাতাসের বেগ ও বাষ্পীভবনের এলাকা। এগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে।

বায়ুর আর্দ্রতা

আগেই বলা হয়েছে বায়ুতে কোনো জলীয়বাষ্প না থাকলে এ বায়ুকে বলে শুষ্ক বায়ু (dry air) আর জলীয়বাষ্প থাকলে বলা হয় ভেজা বা আর্দ্র বায়ু (wet air)/ জলীয়বাষ্পের পরিমাণের উপর বায়ুর আর্দ্রতা (humidity) নির্ভর করে। বায়ুর আর্দ্রতা আবহাওয়া বিজ্ঞানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর্দ্রতা সরাসরি নির্ভর করে বায়ুর তাপমাত্রার উপর। কিন্তু এরও একটি সীমা আছে। পৃথিবীর সমস্ত পানি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে চলে গেলে আকাশ কি সমস্ত বাষ্প ধরে রাখতে পারবে? নিশ্চয়ই না। কাজেই দেখা যাচ্ছে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতার একটি সীমা আছে। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু

সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধরে রাখতে পারে সে পরিমাণকে ঐ বায়ুর ধারণ–ক্ষমতা বলে। সর্বোচ্চ পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণকৃত বায়ুকে সংপৃক্ত বায়ু (saturated air) বলা হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ–ক্ষমতা বা সংপৃক্ততা বাড়ে।

বায়ুর আর্দ্রতার বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন চরম আর্দ্রতা (absolute humidity), নির্দিষ্ট আর্দ্রতা (specific humidity) এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity)। আর্দ্রতা থেকে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বা অনুপাত জানা যায়।

চরম আর্দ্রতা : কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে সে পরিমাণ জলীয়বাষ্পকে চরম আর্দ্রতা বলে। এক ঘনমিটারকে (মিটার^৩) সাধারণত নির্দিষ্ট আয়তনের একক ধরা হয়। এক ঘনমিটার আয়তনের বায়ু হতে যদি জলীয়বাষ্পকে আলাদা করে মাপা হয় এবং ঐ জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যদি ১০ গ্রাম (মনে করা যাক) হয় তবে ঐ বায়ুর চরম আর্দ্রতা হবে ১০ গ্রাম/ঘনমিটার অর্থাৎ প্রতি ঘনমিটারে ১০ গ্রাম। নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুকে যদি বর্ধিত বা সংকুচিত করা হয়, তাহলে চরম আর্দ্রতা যথাক্রমে কমবে বা বাড়বে, কারণ তাতে শুধু আয়তনেরই পরিবর্তন ঘটবে, জলীয়বাষ্পের পরিমাণের পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ তাপমাত্রার সাথে বায়ুর চরম আর্দ্রতা সম্পর্কিত। তাপমাত্রা বাড়লে আয়তন বাড়বে আর কমলে আয়তনও কমবে। চরম আর্দ্রতা দ্বারা কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে তার একটি ধারণা করা যায়।

নির্দিষ্ট আর্দ্রতা : চরম আর্দ্রতার পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের দরুন নির্দিষ্ট আর্দ্রতার ব্যবহার আবহাওয়া বিজ্ঞানে প্রচলিত হয়েছে। নির্দিষ্ট আর্দ্রতা অপরিবর্তনশীল। প্রতি একক ওজনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের ওজনকে বলে নির্দিষ্ট আর্দ্রতা। একে প্রধানত গ্রাম/কিলোগ্রামে (গ্রাম প্রতি কিলোগ্রামে) প্রকাশ করা হয়। এক কিলোগ্রাম ওজনের বায়ুতে যদি ১০ গ্রাম জলীয়বাষ্প থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট আর্দ্রতা হবে ১০ গ্রাম/কিলোগ্রাম। বায়ুর তাপ ও আয়তনের পরিবর্তনের সাথে নির্দিষ্ট আর্দ্রতার কোনো পরিবর্তন হয় না ; কারণ এতে ওজনের কোনো তারতম্য হয় না ; যদি বাইরে থেকে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প প্রবেশ না করে। ঘূর্ণিঝড় তথা বায়ু থেকে কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে তা নির্দিষ্ট আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা : সাধারণত অন্যথা না বললে আর্দ্রতা দ্বারা আমরা আপেক্ষিক আর্দ্রতা বুঝি। আবহাওয়া বার্তায় অন্যান্য তথ্যের মধ্যে আপেক্ষিক আর্দ্রতার কথাই উল্লেখ থাকে। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ এবং ঐ একই তাপমাত্রায় ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুর ধারণক্ষম জলীয়বাষ্পের পরিমাণের শতকরা অনুপাতকে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। অর্থাৎ

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ}}{\text{একই তাপমাত্রায় একই পরিমাণ বায়ুতে সংপৃক্ত অবস্থায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ}}$$

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ৪০ গ্রাম। একই তাপে একই আয়তনের বায়ুতে সংপৃক্ত অবস্থায় জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যদি ৫০ গ্রাম হয়, তাহলে

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{৪০}{৫০} \times ১০০ = ৮০\%$$

আপেক্ষিক আর্দ্রতা বায়ুর তাপমাত্রার সাথে উঠা–নামা করে। তাপমাত্রা বাড়লে জলীয়–বাষ্প ক্ষমতা বাড়বে এবং উপরের ফর্মুলায় হর বাড়বে অর্থাৎ উপরের উদাহরণে সংপৃক্ত অবস্থায় জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ৫০ গ্রামের উর্ধে চলে যাবে। ফলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যাবে। আর তাপমাত্রা কমলে একইভাবে হর কমবে, ফলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেড়ে যাবে।

ঘনীভবন ও মেঘ

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% হলে বায়ু জলীয়বাষ্প দ্বারা সংপৃক্ত হয়। আর যে তাপমাত্রায় ১০০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় বায়ু পৌঁছায়, সে তাপমাত্রাকে শিশিরাংক (dew point) বলে।

পরিষ্কার ও শান্ত রাতে ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণের মাধ্যমে ঠাণ্ডা হয়। ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ু এর সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হতে থাকে। ফলে সে বায়ুর তাপমাত্রা নামে এবং বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% এ পৌঁছে। তখন কিছু জলীয়বাষ্প ঘাস, গাছপালা ইত্যাদির উপর ছোট ছোট পানি বিন্দুতে পরিণত হয়। যাকে বলা হয় শিশির (dew)। আর সংশ্লিষ্ট তাপমাত্রাকে শিশিরের নামানুসারে শিশিরাংক বলা হয়। তাপমাত্রা শিশিরাংকের নিচে পৌঁছলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানি বিন্দুতে পরিণত হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে শিশিরাংক হচ্ছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (critical temperature), যে তাপমাত্রা পর্যন্ত জলীয়বাষ্প পানিতে পরিণত না হয়ে ঠাণ্ডা হতে পারে।

ঘনীভবন (condensation) বাষ্পীভবনের বিপরীত। বাষ্পীভবনে পানি বাষ্প হয়। এই বাষ্পই ঘনীভবনের মাধ্যমে আবার পানিতে পরিণত হয়। বাষ্পীভবনের সময় জলীয়বাষ্পতে যে সুপ্ত তাপ (latent heat of vapourization) ছিল, তা ঘনীভবনের সময় ঘনীভবনের সুপ্ত তাপ (latent heat of condensation) হয়ে বেরিয়ে আসে। এ তাপ বায়ুকে উত্তপ্ত করে ; এ তাপশক্তিই ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির প্রধান উৎস। আমরা দেখেছি ১ গ্রাম পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে প্রায় ৫৪০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন। ঘনীভবনের ফলে প্রতিগ্রাম জলীয়বাষ্প থেকে একই পরিমাণ তাপ ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির জন্য পাওয়া যায়।

জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হবার দুটো শর্ত রয়েছে : (১) তাপমাত্রা শিশিরাংকের নিচে নামতে হবে এবং (২) বায়ুতে ঘনীভবন কণা (condensation nuclei) থাকতে হবে। এ দুটি সম্পর্কে এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

তাপমাত্রার হ্রাস : পানি যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন এর আয়তন পানির আয়তনের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে যায়। বায়ুর তুলনায় হালকা বলে জলীয়বাষ্প উপরে উঠে। উপরে চাপ কম বিধায় বাষ্পকণা আরো প্রসারিত হয়। এ প্রসারণে পারিপার্শ্বিক বায়ুকে ঠেলে সরাতে হয়। ফলে এর শক্তি খরচ হয়।

প্রসারণের কারণে শক্তি কমে যাওয়াতে বাষ্প ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা হওয়ার দরুন আপেক্ষিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় ; বায়ু শেষ পর্যন্ত সংপৃক্ত হয় এবং জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়।

ঘনীভবন কণা : আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রায় ১০০% হলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পরিষ্কার বায়ুতে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রায় ৪০%

Library Dhaka

পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার বায়ু ঘনীভবনের জন্যে তেমন সহায়ক নয়। বরং অপরিষ্কার বায়ুই বেশি সহায়ক। অপরিষ্কার বলতে যে বায়ুতে ধূলিকণা, লবণকণা, ধোঁয়া ইত্যাদি আছে সে বায়ুকে বুঝায়। আর এসব কণাকে বলা হয় ঘনীভবন কণা। এগুলোর উপর জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানিতে পরিণত হয়। ঘনীভবন কণা ব্যতিরেকে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হলে তা প্রায়ই টিকে থাকতে পারে না ; অতি সহজে আবার বাষ্পীভূত হয়ে যায়। ঘনীভূত হওয়া এবং ঘনীভূত পানি টিকে থাকার জন্য বাষ্পের বা পানির আশ্রয়ের দরকার। ঘনীভবন কণা এ আশ্রয় দিয়ে থাকে। ঘনীভবন কণাগুলোর জলীয়বাষ্পের প্রতি আসক্তি থাকা প্রয়োজন (hygroscopic)। যদি আসক্তি না থাকে, তবে জলীয়বাষ্পকে আশ্রয় না দিয়ে দূরে ঠেলে দেবে। আসক্তির উপর ঘনীভবনের পরিমাণ নির্ভর করে।

বায়ুতে লবণকণা সবচেয়ে কার্যকর ঘনীভবন কণা। লবণকণার মূল উৎস হচ্ছে সমুদ্র। কারণ পৃথিবীতে সমুদ্রের পানিই বেশি লবণাক্ত। সমুদ্রে অবিরত ঢেউ পানিকে উপরের দিকে বায়ুতে ছড়াচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় এই ছোঁড়া বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ছুঁড়ে দেয়া পানি তাৎক্ষণিভাবে বাষ্পীভূত হলে পানির সাথের লবণকণা বাতাসে থেকে যায়। তাই স্থলভাগের তুলনায় জলভাগের উপর লবণকণা বেশি থাকে। তাছাড়া জলীয়বাষ্পের প্রতি লবণকণার আসক্তি অন্যান্য ঘনীভবন কণার চেয়ে বেশি। লবণকণার উপর জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হলে লবণকণা পানির মধ্যে সহজে দ্রবীভূত হয়ে যায়। লবণকণা উপস্থিত থাকলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% এর নিচে হলেও জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়ে জলীয়বাষ্প বেশ তাড়াতাড়ি ঘনীভূত হতে পারে।

জলীয়বাষ্প কখনো কখনো আবার বাষ্পীয় অবস্থা থেকে সরাসরি বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হতে সরাসরি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। উভয় প্রক্রিয়াকে বলে ঊর্ধ্বপাতন (sublimation)। অজৈব কণা, যেগুলো ঘনীভবনে তেমন সহায়ক নয়, ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিলা ঊর্ধ্বপাতনের একটি উদাহরণ।

জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ হিসেবে আকাশে ভেসে বেড়ায়। মেঘ সৃষ্টির জন্য জলীয়বাষ্পকে উপরে গিয়ে ঠাণ্ডা বা সংপৃক্ত হতে হয়। ঠাণ্ডা না হয়েও বায়ু সংপৃক্ত হতে পারে। অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প যোগের মাধ্যমে বায়ুকে সংপৃক্ত করা যায়। বাষ্পীভবন বেশি পরিমাণে হলে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প পাওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত জলীয়বাষ্পের যোগান এবং উপরে গিয়ে ঠাণ্ডা হওয়া উভয়ে মিলিতভাবে বায়ুর সংপৃক্ততা ত্বরান্বিত করে। ঘূর্ণিঝড়ে উভয় প্রক্রিয়ার (যোগান এবং ঠাণ্ডা হওয়া) সহজ এবং প্রচুর সুযোগ থাকে।

জলীয়বাষ্প প্রধানত চারভাবে বা চার কারণে উপরে উঠে মেঘের সৃষ্টি করে। যেমন :

(১) স্থানীয় উত্তাপ
(২) পাহাড় পর্বতের অবস্থান
(৩) গরম ও ঠাণ্ডা বায়ুর পাশাপাশি অবস্থান
(৪) বায়ুর অনুভূমিক কেন্দ্রাভিমুখী অভিযান (convergence)।

প্রথম প্রক্রিয়ায় কোনো স্থানের বায়ু উত্তপ্ত হলে উপরে উঠে। এটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির একটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া। পাহাড়–পর্বতের ধার ঘেঁষে বায়ু উপরে উঠতে পারে। আবার গরম ও ঠাণ্ডা

বায়ুপুঞ্জ (air mass) একে অপরের দিকে অনুভূমিকভাবে (horizontally) ধাবিত হলে গরম বায়ু উপরে উঠে। অক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে এটি একটি প্রধান প্রক্রিয়া। গরম বায়ুপুঞ্জ যদি শীতল বায়ুপুঞ্জের দিকে ধাবিত হয়, তখন যেহেতু গরম বায়ু হালকা এবং শীতল বায়ু ভারি সেহেতু গরম বায়ুপুঞ্জ শীতল বায়ুপুঞ্জের উপরে উঠে যাবে। আর শীতল বায়ুপুঞ্জ গরম বায়ুপুঞ্জের দিকে ধাবিত হলে এটি গরম বায়ুপুঞ্জের নিচে স্থান করে নেয়। উভয় ক্ষেত্রেই গরম ও হালকা বায়ু উপরে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত মেঘের সৃষ্টি করে। চতুর্থ পথ হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের চারদিক থেকে বায়ু ধাবিত হলে ধাবিত বায়ু অন্য কোনো দিকে না যেতে পেরে (যেহেতু নিচে ভূপৃষ্ঠ) উপরের দিকে উঠতে বাধ্য হয়। এটি ঘূর্ণিঝড়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মেঘ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল অবস্থায় ভেসে বেড়াচ্ছে মনে হয়। কিন্তু একটু যত্ন সহকারে দেখলে বুঝা যাবে এ ধারণা সবসময় ঠিক নয়। মেঘের আকার, গঠন, উচ্চতা, ইত্যাদি ভেদে মেঘের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে মেঘের আকার, গঠন, উচ্চতা, প্যাটার্ন, ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তথ্য (বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা সম্পর্কে) প্রদান করে। আবহাওয়া উপগ্রহের সাহায্যে ঘূর্ণিঝড়ের মেঘের ছবি দেখে ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম, বিকাশ, মৃত্যু, বায়ুর বেগ, ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান, গতি, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য আহরণ করা সম্ভব।

অধঃক্ষেপণ ও বৃষ্টি

জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে পড়াকে বলে অধঃক্ষেপণ (precipitation)। অধঃক্ষেপণের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টির সংজ্ঞা খুবই সোজা কিন্তু এর ব্যাখ্যা বেশ কঠিন। আমরা এখানে সে জটিলতায় যাব না। তবে এটি নিশ্চিত যে বৃষ্টি হতে হলে ঘনীভূত জলীয়বাষ্প অর্থাৎ পানির কণা আকারে বেশ বড় হতে হবে। পানি কণা বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী বল ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের (নিম্নমুখী) টানাটানির মধ্যে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ বল যখন জেতে (অর্থাৎ পানি কণা বড় হয় বা ঊর্ধ্বমুখী বল কমে যায়) তখন পানিকণা নিচের দিকে পড়তে থাকে। পানিকণা আকারে বড় হবার দুটি প্রধান পথ রয়েছে ; একটি হলো কয়েকটি বিন্দু বা কণা ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে এক সাথে মিশে গিয়ে বড় হওয়া। বড় ঘনীভবন কণা হলেও বড় পানি বিন্দু জন্ম নিতে পারে। কণা ছোট হলে ধাক্কাধাক্কির সম্ভাবনা কমে যায়। দেখা গেছে প্রায় ০.০৪ মিলিমিটারের নিচে ব্যাস সম্পন্ন কণার ধাক্কার সম্ভাবনা কম। ধাক্কা আবার ঘনীভবন কণার ঘনত্বের উপরও নির্ভর করে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাতাস ও বল

একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহমান বায়ুকে বাতাস বলা হয়। বায়ুর প্রবাহ বা বাতাস ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে মারাত্মক প্যারামিটার। এ বায়ুর প্রবাহই ক্ষয়-ক্ষতির প্রধান কারণ। বাতাসের উৎপত্তি, এর নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে। নিচে এর একক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বাতাসের একক

আমরা আগেই দেখেছি যে বাতাসের গতিভেদে ঘূর্ণিঝড়কে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১.২ সারণিতে বাতাসের চারটি একক দেয়া হয়েছে : বুফোর্ট স্কেল, নট, মাইল/ঘণ্টা এবং কিলোমিটার/ঘণ্টা। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুটি বাতাস ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় (যেমন গাড়ির গতি)। নট নাবিকেরা জাহাজে ব্যবহার করে থাকেন। বুফোর্ট স্কেল বাতাসের গতির জন্য প্রবর্তিত হয় ; যদিও আজকাল চারটি এককই (বা কোনোটির অন্যরূপ, যেমন : কিলোমিটার/ঘণ্টার পরিবর্তে মিটার/সেকেণ্ড) ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণ বুফোর্ট স্কেলের সাথে তেমন পরিচিত নন। তবে ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণীভাগ মূলত এ স্কেলের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, স্কেলটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজকীয় নৌবাহিনীর (বৃটিশ) এডমিরাল বুফোর্ট প্রবর্তন করেন এবং তারই নামানুসারে এ স্কেলের নামকরণ করা হয়। বর্তমান বুফোর্ট স্কেলে বাতাসের বেগকে ০ হতে ১৭ পর্যন্ত ১৮টি সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি সংখ্যা বাতাসের গতির একটি বিস্তৃতি বা রেঞ্জ (range) প্রদান করে। ৩.১ সারণিতে প্রতিটি বুফোর্ট স্কেলে সংখ্যা, মাইল/ঘণ্টায় তাদের বিস্তৃতি এবং বাতাসের সংক্ষিপ্ত নামকরণ বা বর্ণনা দেয়া হলো।

বল

বল (force) প্রয়োগে বায়ু প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ বাতাসের সৃষ্টি হয়। বল আবার বাতাসের গতি (speed) এবং দিক (direction) উভয়ই নিয়ন্ত্রিত করে। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান যে বলসমূহ কাজ করে সেগুলো হচ্ছে — ১. চাপ বল ২. কোরিওলিস বল ৩. অপকেন্দ্র বল ও ৪. ঘর্ষণ বল।

সারণি ৩.১ : বুফোর্ট স্কেল ও তার সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য।

বুফোর্ট স্কেল	গতি (মাইল/ঘণ্টা)	সমুদ্রে বাতাসের অবস্থা	স্থলভাগে বাতাসের অবস্থা
০	১	শান্ত (calm)	শান্ত, ধোঁয়া সোজা উপরের দিকে উঠে
১	১–৩	হালকা বাতাস (light air)	ধোঁয়া দ্বারা বাতাসের দিক বুঝা যায়, কিন্তু কদাচিৎ সাধারণ বাতাস মাপার যন্ত্রে (wind vane) ধরা পড়ে।
২	৪–৭	হালকা মৃদু বাতাস (light breeze)	মানুষ মুখে বাতাস অনুভব করতে পারে, গাছের পাতা নড়ে, সাধারণ বাতাস মাপার যন্ত্রে ধরা পড়ে।
৩	৮–১২	শান্ত মৃদু বাতাস (gentle breeze)	গাছের পাতা এবং ডাল নড়তেই থাকে ; পতাকা বাতাসে নড়ে।
৪	১৩–১৮	মাঝারি মৃদু বাতাস (moderate breeze)	ধুলা ও হালকা কাগজ বাতাসে উড়ে ; গাছের ছোট ছোট শাখা নড়ে।
৫	১৯–২৪	কম প্রবল মৃদু বাতাস (fresh breeze)	পাতাওয়ালা ছোট ছোট গাছ প্রায় পুরোটাই বাতাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
৬	২৫–৩১	প্রবল মৃদু বাতাস (strong breeze)	গাছের বড় বড় শাখায় আলোড়ন সৃষ্টি হয় ; টেলিগ্রাফের তারে হুইসল শব্দ শোনা যায় ; ছাতা ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দেয়।
৭	৩২–৩৮	মাঝারি ঝাপটা বাতাস (moderate gale)	সারা গাছে আলোড়ন বা গতি সৃষ্টি হয় ; বাতাসের বিপরীতে হাঁটতে অসুবিধা হয়।
৮	৩৯–৪৬	কম প্রবল ঝাপটা বাতাস (fresh gale)	গাছের ডাল ভেঙ্গে যায়।
৯	৪৭–৫৪	প্রবল ঝাপটা বাতাস (strong gale)	বিল্ডিংয়ের অল্প-স্বল্প ক্ষতি হয়।
১০	৫৫–৬৩	অতি ঝাপটা বাতাস (whole gale)	স্থলভাগে কম দেখা যায়, গাছপালা উপড়ে যায় ; বিল্ডিংয়ের বেশি ক্ষতি হয়।
১১	৬৪–৭২	ঘূর্ণিঝড় (storm)	স্থলভাগ খুব কম দেখা যায়, সমুদ্রে অতি উচ্চ ঢেউ পরিলক্ষিত হয়।
১২	৭৩–৮২	হারিকেন গতিসম্পন্ন	বাতাস সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করে।
১৩	৮৩–৯২	হারিকেন গতিসম্পন্ন	বাতাস সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করে।
১৪	৯৩–১০৩	হারিকেন গতিসম্পন্ন	বাতাস সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করে।
১৫	১০৪–১১৪	হারিকেন গতিসম্পন্ন	বাতাস সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করে।
১৬	১১৫–১২৫	হারিকেন গতিসম্পন্ন	বাতাস সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করে।
১৭	১২৬–১৩৬	হারিকেন গতিসম্পন্ন	বাতাস সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করে।

চাপ বল

কোনো স্থানে বায়ুর চাপ পারিপার্শ্বিক চাপ থেকে কমে গেলে সে স্থানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়। আর বেড়ে গেলে বলা হয় উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া তালিকায় (weather chart, সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত) নিম্নচাপকে ইংরেজি অক্ষর 'L' (Low pressure) এবং উচ্চচাপকে 'H' (High pressure) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। উচ্চচাপ/নিম্নচাপ এলাকা বৃত্তাকার, বক্রাকার বা সরলাকার হতে পারে।

পানি যেমন উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানের দিকে যায়, বায়ুও তেমনি উচ্চচাপ এলাকা থেকে নিম্নচাপ এলাকার দিকে ধাবিত হয়। দুটি স্থানের মধ্যে চাপের তারতম্য হলে বায়ু প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ চাপের পার্থক্য (pressure difference) বল হিসেবে কাজ করে। চাপের পার্থক্যের উপর বাতাসের গতি নির্ভর করে। আসলে ঠিক চাপের পার্থক্যের উপর নয়, বরং প্রতি একক দূরত্বের সাথে চাপের পরিবর্তনের (pressure gradient) উপর। ৩.১ চিত্রের সাহায্যে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

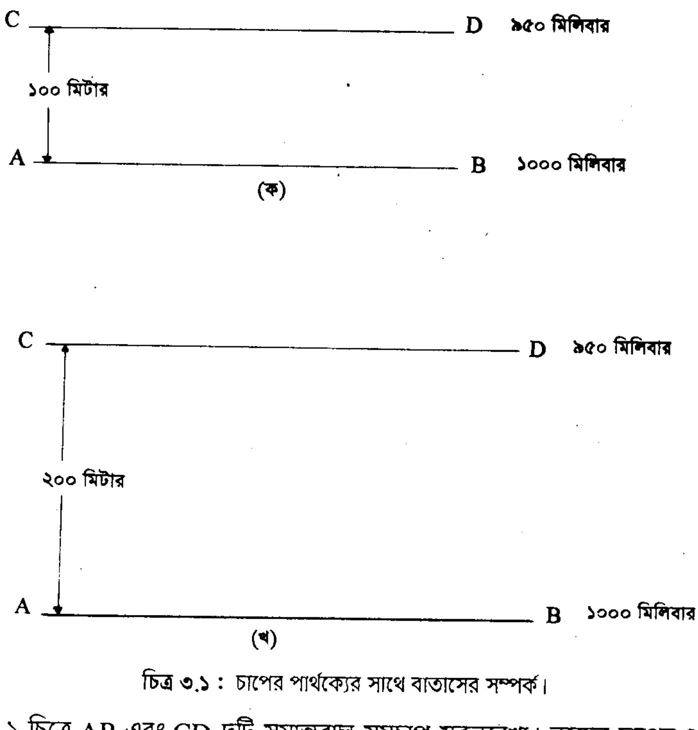

চিত্র ৩.১ : চাপের পার্থক্যের সাথে বাতাসের সম্পর্ক।

৩.১ চিত্রে AB এবং CD দুটি সমান্তরাল সমচাপ সরলরেখা। তাদের চাপের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০ মিলিবার এবং ৯৫০ মিলিবার। অর্থাৎ AB রেখার প্রতিটি বিন্দুতে বায়ুর চাপের পরিমাণ ১০০০ মিলিবার এবং CD রেখার প্রতিটি বিন্দুতে চাপের পরিমাণ ৯৫০

মিলিবার। ৩.১ (ক) চিত্রে উভয়ের দূরত্ব ১০০ মিটার এবং ৩.১ (খ) চিত্রে ২০০ মিটার। উভয় ক্ষেত্রে বায়ু AB রেখা থেকে সোজাসুজি CD রেখার দিকে প্রবাহিত হবে (যদি চাপ ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করে)। কোনো ক্ষেত্রেই দিকের কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে গতি সমান হবে না।

৩.১ (ক) চিত্রে প্রতি একক দূরত্বে (এখানে প্রতি মিটারে) চাপের পার্থক্য হচ্ছে :

$$\frac{(১০০০-৯৫০)\text{ মিলিবার}}{১০০\text{ মিটার}}$$

$$=০.৫০\text{ মিলিবার/মিটার}$$

অর্থাৎ AB রেখা থেকে CD রেখার দিকে প্রতি মিটার দূরত্বে চাপ ০.৫০ মিলিবার করে কমছে (CD রেখা থেকে AB রেখার দিকে প্রতি মিটারে চাপ ০.৫০ মিলিবার বাড়ছে)। অন্যদিকে ৩.১ (খ) চিত্রে প্রতি মিটার দূরত্বে চাপের পার্থক্য হচ্ছে (১০০০–৯৫০) মিলিবার/২০০ মিটার বা ০.২৫ মিলিবার/মিটার। কাজেই ৩.১ (ক) চিত্রে বাতাসের গতি ৩.১ (খ) চিত্রের তুলনায় বেশি হবে। সরলরেখা দুটির মধ্যে দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে চাপের পার্থক্য কম বেশি করলে বাতাসের গতির পরিবর্তন হবে। যেমন, ৩.১ (ক) চিত্রে অন্য সব কিছু অপরিবর্তিত রেখে যদি CD সমচাপ রেখার চাপ ৯৫০ মিলিবারের বদলে ৯০০ মিলিবার করা হয়, তাহলে প্রতি একক দূরত্বে চাপের পার্থক্য হবে (১০০০–৯০০) মিলিবার/১০০ মিটার, অর্থাৎ ১.০ মিলিবার/মিটার। এ ক্ষেত্রে বাতাস তীব্রতর হবে। তাই পারিপার্শ্বিক চাপের তুলনায় ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে চাপ যত কমবে, ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিও সেভাবে বাড়বে।

চাপ বল সম্পর্কিত আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে দুটি স্থানের মধ্যে চাপের পার্থক্য ঘটলে বায়ু সোজাসুজি উচ্চচাপ স্থান থেকে নিম্নচাপ স্থানের দিকে প্রবাহিত হবে (যদি অন্য কোনো বল কাজ না করে)। চাপের পার্থক্য যতই হোক না কেন, বাতাসের দিকের কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে বাতাসের গতি নির্ভর করবে প্রতি একক দূরত্বে চাপের পার্থক্যের উপর।

কোরিওলিস বল

বায়ু যদি AB থেকে CD এর দিকে (চিত্র ৩.১) সোজাসুজি যেতে থাকে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক চাপ এলাকার বায়ুতে কম চাপ এলাকা ভর্তি হয়ে যাবে। নিম্নচাপ আর নিম্নচাপ থাকবে না ; উচ্চচাপও আর উচ্চচাপ থাকবে না। সমগ্র এলাকায় চাপের সমতা এসে যাবে এবং বাতাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে এতো তাড়াতাড়ি সমতা আসে না। ঘূর্ণিঝড় এতো তাড়াতাড়ি মরে যায় না। তার একটি প্রধান কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত বল। বিখ্যাত পদার্থবিদ কোরিওলিস (C.G. Coriolis) সর্বপ্রথম এ বল নিয়ে আলোচনা করেন

এবং তারই নামানুসারে এ বলকে কোরিওলিসি বল (Coriolis force) বলা হয়। এ বল বাতাসের গতির দিকের উপর লম্বালম্বিভাবে কাজ করে—উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে। বায়ুর প্রবাহ না থাকলে কোরিওলিসি বলের পরিমাণ হয় শূন্য। যে মুহূর্তে বায়ু চলাচল শুরু করে সে মুহূর্ত থেকে কোরিওলিস বলও কাজ শুরু করে।

কোরিওলিস বল নিম্নের সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় :

কোরিওলিস বল= ২× পৃথিবীর কৌণিক বেগ × সাইন (পৃথিবীর অক্ষাংশ) × বস্তুর গতি

পৃথিবীর কৌণিক বেগ (angular velocity) হচ্ছে ০.০০০০৭২৯২/সেকেন্ড। সাইন হচ্ছে ত্রিকোণমিতির সাইন। সূত্র হতে দেখা যাচ্ছে দুটি কারণে কোরিওলিস বল শূন্য হতে পারে : (এক) বস্তুর কোনো গতি না থাকলে অর্থাৎ বস্তু স্থির থাকলে। (দুই) বস্তু বিষুবরেখায় অবস্থিত হলে, কারণ সেখানে অক্ষাংশ শূন্য এবং সাইন (০°)=০। অক্ষংশ বৃদ্ধির সাথে সাইন বাড়বে এবং সর্বোচ্চ হবে মেরুতে যেখানে সাইন (৯০°)=১। এখানে আরো লক্ষণীয় যে উত্তর গোলার্ধে সাইন যোগবোধক এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বিয়োগবোধক। সুমেরুতে সাইন (৯০°)=১ এবং কুমেরুতে সাইন (৯০°)=–১। এ কারণে গোলার্ধভেদে কোরিওলিস বলের দিকের পরিবর্তন ঘটে (উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে)। উপরের সূত্রে প্রথম তিনটির গুণফলকে কোরিওলিস প্যারামিটার বলা হয় অর্থাৎ

কোরিওলিস প্যারামিটার= ২ × পৃথিবীর কৌণিক বেগ × সাইন (পৃথিবীর অক্ষাংশ)

সে হিসেবে,

কোরিওলিস বল=কোরিওলিস প্যারামিটার × বস্তুর গতি

চাপ বল ও কোরিওলিস বল সম্মিলিতভাবে বায়ুকে সমচাপ রেখার সমান্তরালে প্রবাহিত করে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। প্রথমে আলোচনা করা হবে সমান্তরাল সমচাপ রেখা নিয়ে এবং পরে বৃত্তাকার সমচাপ নিয়ে।

চাপ বল ও কোরিওলিস বল : জিওস্ট্রোফিক বাতাস

৩.২ চিত্রে দুটি সরল ও সমান্তরাল সমচাপ রেখা দেয়া হয়েছে। এদের একটির মান P মিলিবার এবং অপরটির মান P-1 মিলিবার (P-1 থেকে P বেশি)। দুটি রেখা অনুভূমিক ক্ষেত্রে অবস্থিত। এক পাশে উচ্চচাপ এবং অন্য পাশে নিম্নচাপ, যা যথাক্রমে H এবং L দ্বারা বুঝানো হয়েছে। চাপ বলের দিক সব সময় উচ্চচাপ হতে সোজাসুজি নিম্নচাপের দিকে হবে। প্রথমে A বিন্দুতে একটি বায়ুখণ্ড (parcel of air) স্থির অবস্থায় আছে। স্থির থাকার দরুন বায়ুখণ্ডের উপর কোরিওলিস বল শূন্য। কিন্তু চাপ বলের দরুন বায়ুখণ্ড সোজাসুজি নিম্নচাপ এলাকার দিকে চলতে চাইবে। চলা শুরু হলে কোরিওলিস বল মাঠে নামবে। শুধু চাপ বলের জন্য বায়ুখণ্ডের প্রথম দিক যদি AB দ্বারা দেখানো হয়, তাহলে কোরিওলিস বল A বিন্দুতে AB রেখার ডানদিকে (এখানে উত্তর গোলার্ধ ধরে নিয়ে) লম্বালম্বিভাবে AC রেখা বরাবর

কাজ করবে। এমতাবস্থায় বায়ুখণ্ড AB এবং AC রেখার মধ্যবর্তী একটি পথ অবলম্বন করবে (চিত্র ৩.২ (ক))। এ লব্ধি পথ (resultant path) AD রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। D বিন্দুতে চাপ বলের দিক ঠিকই থাকবে (DB′); কিন্তু কোরিওলিস বলের দিক পরিবর্তিত হয়ে AD রেখার লম্বালম্বি DC′ বরাবর হবে। DB′ এবং DC′ এর লব্ধি AD রেখার চেয়ে আরেকটু ডানদিকে বেঁকে যাবে যা DD′ রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে। এভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত বায়ুখণ্ড চাপবল ও কোরিওলিস বলের মিলিত প্রভাবে প্রথম দিকে বক্রাকার পথে চলে পরে সমচাপ রেখার সমান্তরালে চলবে (চিত্র ৩.২(খ))। এবং তখন চাপবল ও কোরিওলিস বল একে অন্যের বিপরীতে কাজ করবে। বায়ু সমান্তরাল পথ থেকে আর ডানদিকে যেতে পারবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে বায়ুকে কম চাপ এলাকা থেকে বেশি চাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হতে হবে, যা নিয়মসিদ্ধ নয়।

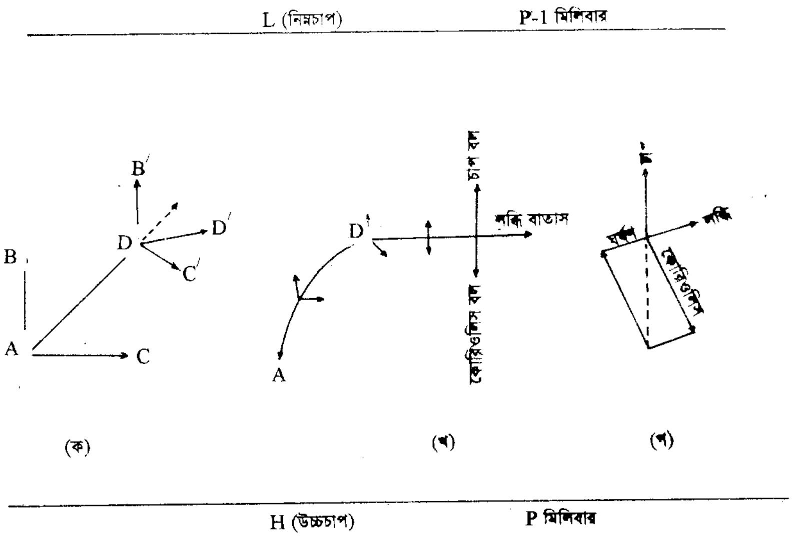

চিত্র ৩. ২ : জিওস্ট্রোফিক বাতাস।

উপরে বর্ণিত বাতাসকে জিওস্ট্রোফিক বাতাস (geostrophic wind) বলা হয়। এ রকম বাতাস প্রধানত মধ্য অক্ষাংশে (প্রায় ৩০–৬০°) দেখা যায়। জিওস্ট্রোফিক বাতাস সমচাপ রেখার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। বাতাসের ডানদিকে থাকে উচ্চচাপ এবং বামদিকে থাকে নিম্নচাপ। কাজেই দুটি অসম সমান্তরাল সমচাপ রেখা দেয়া থাকলে বাতাসের দিক সহজে নির্ণয় করা যায়। সমচাপ রেখার দূরত্ব জানা থাকলে বাতাসের বেগও নির্ণয় করা সম্ভব।

চাপ বল, কোরওালিস বল ও অপকেন্দ্র বল : গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাস

সমচাপ রেখা যদি সরল না হয়ে সমকেন্দ্রিক হয় (বৃত্তাকার এবং সবকটি সমচাপ রেখার একই কেন্দ্র) তাহলেও বায়ু সমকেন্দ্রিক সমচাপ রেখার সমান্তরালে চলবে। ৩.৩ চিত্রে CD রেখা দ্বারা এ বায়ুপ্রবাহ দেখানো হয়েছে। উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ের বেলায় বায়ু ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (চিত্র ৩.৩(ক)) এবং উচ্চচাপ বা বিপরীত ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৩.৩(খ))। দক্ষিণ গোলার্ধের বেলায় ঠিক উল্টো ঘটে [চিত্র ৩.৩(গ) এবং চিত্র ৩.৩(ঘ)]।

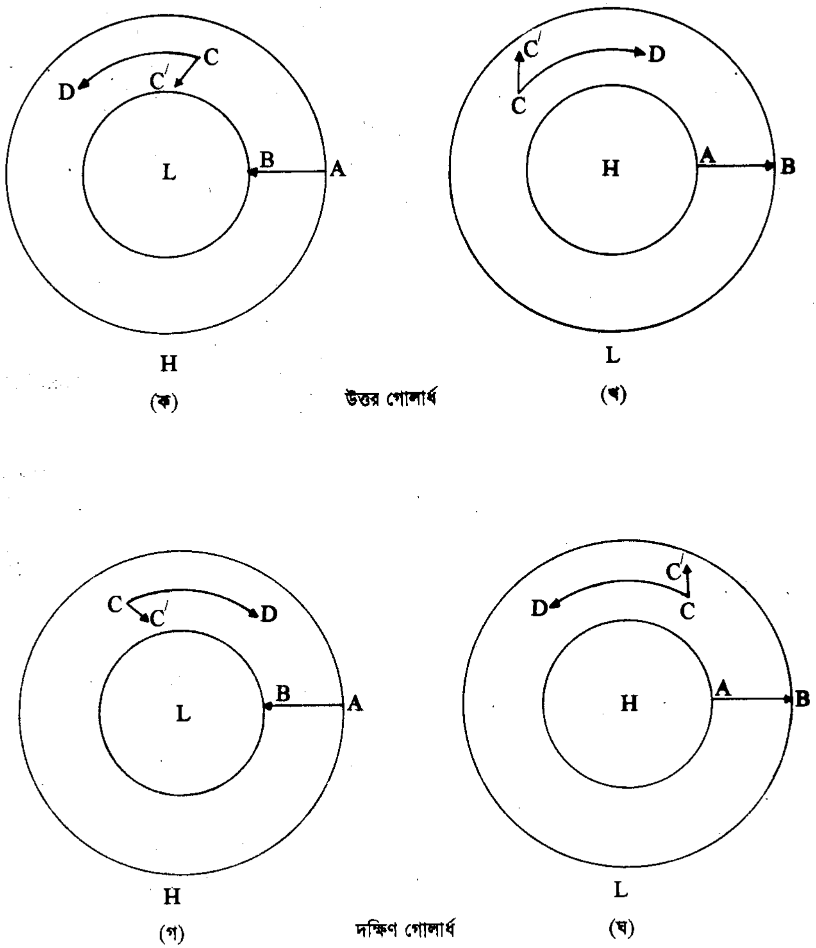

চিত্র ৩.৩ : গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাস।

দেখা যাচ্ছে, সমকেন্দ্রিক সমচাপ বা বৃত্তাকার সমচাপ রেখার ক্ষেত্রে বায়ু কেন্দ্রের চতুর্দিকে সমচাপ রেখার সমান্তরালে ঘুরতে থাকে। এ ধরনের বাতাসকে গ্র্যাডিয়েন্ট (gradient) বাতাস বলে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে জিওস্ট্রোফিক বাতাস এবং গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাস এক ; উভয়েই সমচাপ রেখার সমান্তরালে চলে। কিন্তু আসলে তা নয়। জিওস্ট্রোফিক বাতাসে চাপ বল এবং কোরিওলিস বল কাজ করে। কিন্তু গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাসে আরেকটি অতিরিক্ত বলের উৎপত্তি হয়। এ বলকে বলে অপকেন্দ্র বা কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal force)। কোনো বস্তু যখন ঘুরতে থাকে তখন কেন্দ্রের বাইরের দিকে এ বস্তুর ছুটে যাওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি রশির এক প্রান্তে কোনো বস্তুকে বেঁধে অপর প্রান্ত হাতে রেখে যদি বস্তুকে ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ ছেড়ে দেয়া হয়, তখন দেখা যাবে বস্তুটি বাইরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এ ছুটে যাওয়া হচ্ছে কেন্দ্রাতিগ বলের কারণে। চাপ বল, কোরিওলিস বল এবং কেন্দ্রাতিগ বলের লব্ধিই হচ্ছে গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাস। ৩.৪ চিত্রে উত্তর গোলার্ধের জন্য কেন্দ্রে নিম্নচাপ ও উচ্চচাপের বেলায় এ তিনটি বলের দিক এবং তাদের লব্ধি বা গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাস দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রে নিম্নচাপের বেলায় কোরিওলিস বল এবং কেন্দ্রাতিগ বল বর্হিমুখী এবং চাপ বল কেন্দ্রমুখী। কেন্দ্রে উচ্চচাপের ক্ষেত্রে চাপবল ও কেন্দ্রাতিগ বল বহির্মুখী এবং কোরিওলিস বল কেন্দ্রমুখী। লব্ধি সমচাপ রেখার সমান্তরাল।

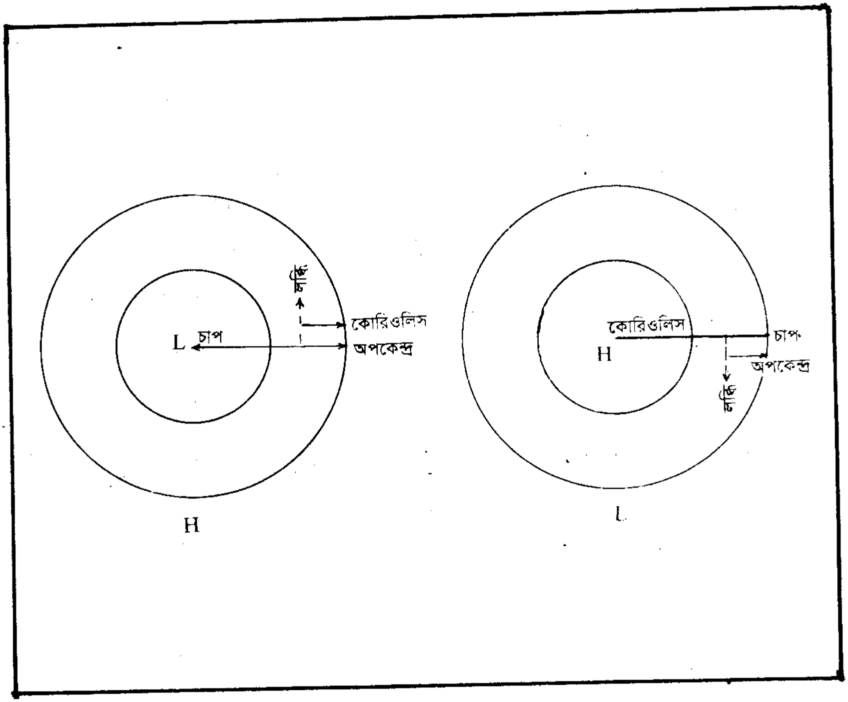

চিত্র ৩.৪ : গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাসের তিনটি উপাদান এবং লব্ধি।

আদর্শিকভাবে ঘূর্ণিঝড় এবং বিপরীত ঘূর্ণিঝড়ে বায়ু গ্র্যাডিয়েন্ট নিয়ম অনুসারে চলে। তবে আসলে তা পুরোপুরি ঠিক নয়। তার একটি প্রধান কারণ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করবো। তবে এর আগে আমরা আরেক প্রকার বাতাসের কথা উল্লেখ করতে চাই। তা হচ্ছে সাইক্লোস্ট্রোফিক বাতাস।

চাপ বল ও কেন্দ্রাতিগ বল : সাইক্লোস্ট্রোফিক বাতাস

অতি অল্প পরিসরে গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাসে কোরিওলিস বল কেন্দ্রাতিগ বলের তুলনায় অতি নগণ্য হয়। সে ক্ষেত্রে লব্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত চাপ বল এবং কেন্দ্রাতিগ বলের মধ্যে অর্থাৎ বাতাস চাপ বল ও কেন্দ্রাতিগ বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ রকম বাতাসকে বলা হয় 'সাইক্লোস্ট্রোফিক বাতাস' (Cyclostrophic wind)। যেহেতু কোরিওলিস বলের প্রভাব একেবারেই নগণ্য, সেহেতু সাইক্লোস্ট্রোফিক বাতাস একই গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার উভয় দিকে হতে পারে। এ বাতাস নিম্ন অক্ষাংশেও দেখা যায়, যেখানে কোরিওলিস বল নগণ্য। বিষুবরেখায়ও (যেখানে কোরিওলিস বল শূন্য) এ বাতাসের সৃষ্টি হতে পারে। কেন্দ্রের নিকটে ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোস্ট্রোফিক নিয়ম মেনে চলে। সাইক্লোস্ট্রোফিক বাতাসের অন্যান্য উদাহরণ হচ্ছে ধূলিঝড় (dust devils), পানি ঝড় (water spouts) এবং টর্নেডো।

জিওস্ট্রোফিক বাতাস এবং সাইক্লোস্ট্রোফিক বাতাস—উভয়েই গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাসেরই এক একটি বিশেষ রূপ। গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাসের তিনটি বলের যে কোনো একটি (চাপ বল ছাড়া) অনুপস্থিত থাকলে বা নগণ্য হলে অপর দুটি বাতাস পাওয়া যায়। যেমন : আমরা দেখেছি, কেন্দ্রাতিগ বল অনুপস্থিত হলে পাওয়া যায় জিওস্ট্রোফিক বাতাস এবং কোরিওলিস বল না থাকলে বা নগণ্য হলে পাওয়া যায় সাইক্লোস্ট্রোফিক বাতাস।

ঘর্ষণ বল

উপরে আলোচিত যে কোনো প্রকারের বাতাসই হোক না কেন, অন্য কোনো কারণ না ঘটলে এ রকম বাতাস চলতেই থাকবে। ঘূর্ণিঝড়ের চারপাশে বায়ু ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে। ঘূর্ণিঝড়ে মারা যাবে না। কারণ কেন্দ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হতে না পারলে বায়ুর সমতা আসবে না। সমতায় পৌঁছার জন্য অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হবার জন্য আরেকটি বলের প্রয়োজন। তা হচ্ছে ঘর্ষণ বল। (frictional force)। কোনো বস্তু চলা শুরু করলে ঘর্ষণ বল বস্তুর চলার বিপরীতে কাজ করে। বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটে এ বল বেশি প্রবল ; কারণ এখানে বায়ুর ঘর্ষণ হয় পৃথিবীপৃষ্ঠের সাথে। উচ্চতার সাথে আস্তে আস্তে এ বল কমতে থাকে।

জ্যামিতির সামান্তরিকের সূত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে যে চাপ বল, কোরিওলিস বল, কেন্দ্রাতিগ বল (বক্রাকার বা বৃত্তাকার ক্ষেত্রে) এবং ঘর্ষণ বলের মিলিত প্রভাবে বায়ু সমচাপ রেখার সমান্তরালে না চলে বরং সমচাপ রেখার সাথে কোণ উৎপন্ন করে (৯০ ডিগ্রির

চেয়ে কম) নিম্নচাপ রেখার দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ প্রবাহ জিওস্ট্রোফিক বাতাসের বেলায় চিত্র ৩.২ (গ)তে এবং গ্র্যাডিয়েন্ট বাতাসের বেলায় চিত্র ৩.৩ চিত্রে CC' রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় এবং বিপরীত ঘূর্ণিঝড় উভয় ক্ষেত্রেই তা হয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ে উপরে উল্লিখিত সবকটি বলই কাজ করে।

স্পর্শ-বাতাস ও ব্যাস-বাতাস

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমরা এতক্ষণ যে বাতাস নিয়ে আলোচনা করেছি তাকে বলা হয় অনুভূমিক বাতাস (horizontal wind) যা ভূপৃষ্ঠের প্রায় সমান্তরাল। অনুভূমিক বাতাস ছাড়া উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী বাতাসও রয়েছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। আমরা দেখেছি চাপ বল, কোরিওলিস বল, কেন্দ্রাতিগ বল এবং ঘর্ষণ বলের মিলিত প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়ের অনুভূমিক বাতাস সমচাপ রেখার সাথে কোণ উৎপন্ন করে প্রবাহিত হয়। অনুভূমিক বাতাসকে ত্রিকোণমিতির সূত্রের সাহায্যে দু' অংশে ভাগ (resolve) করা যায়। একটি সমচাপ রেখাকে স্পর্শ করে এবং অন্যটি ব্যাসার্ধ বরাবর ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত। এদেরকে যথাক্রমে স্পর্শ-বাতাস (Tangential wind বা Azimuthal wind) এবং ব্যাস-বাতাস (radial wind) বলা হয়। বিপরীত ঘূর্ণিঝড়ের বেলায় ব্যাস-বাতাস কেন্দ্র বহির্মুখী।

সর্বোচ্চ বাতাস ও চাপ-ঘাটতি

ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতার প্রধান মাপকাঠি হলো এর সর্বোচ্চ বাতাস। আবহাওয়া বুলেটিনে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত তথ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ বাতাস একটি প্রধান স্থান পায়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাস সবচেয়ে কম থাকে। কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে অতি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ৪০/৫০ কিলোমিটার দূরত্বে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। এরপর থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে (চিত্র ৩.৫)। অবশ্য ঘূর্ণিঝড় থেকে ঘূর্ণিঝড়ে এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে একই ঘূর্ণিঝড়ে এ দূরত্বের তারতম্য ঘটে। ঘূর্ণিঝড়ে অনেক সময় ঝাপটা বাতাসও (gales) দেখা যায়। এ বাতাস খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং এটি সর্বোচ্চ বাতাসের সংজ্ঞায় পড়ে না। সর্বোচ্চ বাতাস তাকেই বলা হয় যা বেশ কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারে ; যাকে ইংরেজিতে বলা হয় maximum sustained wind (MSW) বা সর্বোচ্চ টেকসই বাতাস। সংক্ষেপে সর্বোচ্চ বাতাস। সর্বোচ্চ বাতাস সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৩০০ মিটার উপরে পরিলক্ষিত হয়। যে ব্যাসার্ধে সর্বোচ্চ বাতাস পরিলক্ষিত হয়, সে ব্যাসার্ধকে বলা হয় সর্বোচ্চ বাতাস ব্যাসার্ধ (radius of maximum wind-RMW)। এটি ঘূর্ণিঝড়ের আরেকটি প্রয়োজনীয় উপাদান বা প্যারামিটার। সর্বোচ্চ বাতাস ব্যাসার্ধের এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। কারণ এখানে বাতাস সবচেয়ে বেশি। এ ব্যাসার্ধ থেকে বুঝা যায় স্থলভাগে আঘাতকারী ঘূর্ণিঝড় কোন স্থানে ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারে। কেন্দ্র থেকে এ ব্যাসার্ধের দূরত্ব প্রায় ৪০-৫০ কিলোমিটার। আবহাওয়াবিদরা সর্বোচ্চ বাতাসের সাথে সাথে সর্বোচ্চ বাতাস ব্যাসার্ধের উপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখেন।

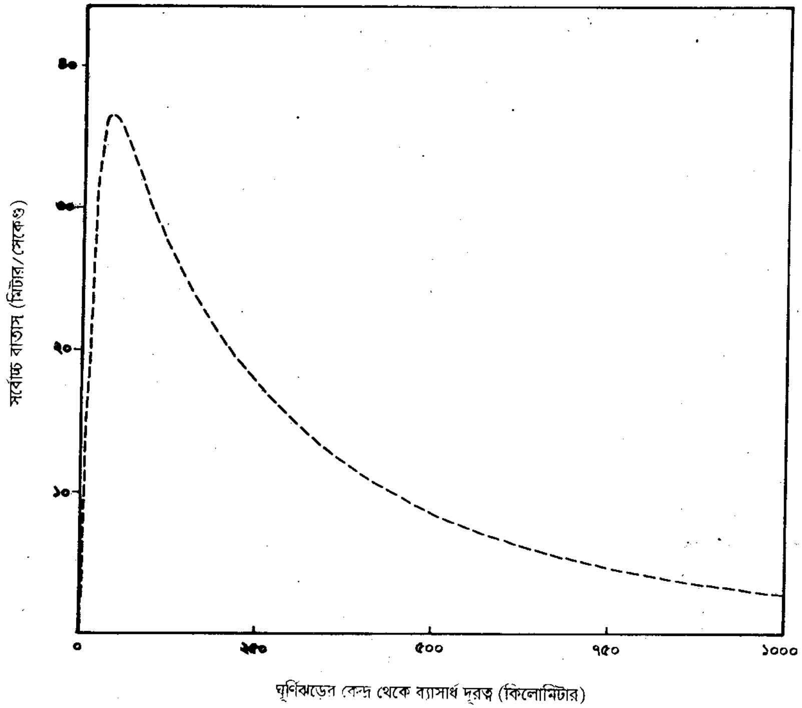

চিত্র ৩. ৫ : ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাসার্ধের সাথে সর্বোচ্চ বাতাসের পরিবর্তন।

ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতার আরেকটি মাপকাঠি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠে এর চাপ–ঘাটতি (pressure difference বা pressure drop)। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বায়ুর চাপ পারিপার্শ্বিক (বায়ুর স্বাভাবিক চাপ) চাপের তুলনায় সবচেয়ে কম। কেন্দ্র থেকে বায়ুর চাপ বাইরের দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক চাপের সাথে মিশে যায়। কেন্দ্রের চাপ পারিপার্শ্বিক চাপের চেয়ে প্রায় ৫–১০ শতাংশ কম হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের পারিপার্শ্বিক চাপ থেকে কেন্দ্রের চাপ বাদ দিলে ঘূর্ণিঝড়ের চাপের ঘাটতি বা চাপ–ঘাটতি পাওয়া যায়। ঘূর্ণিঝড়ের বাইরে স্বাভাবিক চাপ যদি P মিলিবার হয় এবং কেন্দ্রে P_0 মিলিবার হয়, তবে ঘূর্ণিঝড়ে চাপ–ঘাটতি হবে $P-P_0$ মিলিবার। চাপ–ঘাটতি, P এবং P_0 এর যে কোনো দুটি জানা গেলে অন্যটি নিম্নের সূত্রের সাহায্যে জানা যায় :

$$\text{চাপ–ঘাটতি} = P-P_0$$

সারণি ৩.২ : চাপ–ঘাটতি, সর্বোচ্চ বাতাস ও জলোচ্ছ্বাস (বাংলাদেশ উপকূলের জন্য)।

চাপ–ঘাটতি মিলিবার	সর্বোচ্চ বাতাস মাইল/ঘ: (কি:/ঘ:)	সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস ফুট (মিটার)
১০	৪০(৬৪.৪)	০৩.৮৭(১.১৮)
১২	৪৭(৭৫.৭)	০৫.৭১(১.৭৪)
১৪	৫৪(৮৬.৯)	০৭.৪৮(২.২৮)
১৬	৬০(৯৬.৬)	০৯.১৮(২.৮০)
১৮	৬৭(১০৭.৯)	১০.৮১(৩.৩০)
২০	৭২(১১৫.৯)	১২.৩৮(৩.৭৭)
২২	৭৭(১২৪.০)	১৩.৮৮(৪.২৩)
২৪	৮২(১৩২.০)	১৫.৩১(৪.৬৭)
২৬	৮৭(১৪০.১)	১৬.৬৮(৫.০৮)
২৮	৯১(১৪৬.৫)	১৭.৯৮(৫.৪৮)
৩০	৯৪(১৫১.৩)	১৯.২১(৫.৮৬)
৩২	৯৮(১৫৭.৮)	২০.৩৮(৬.২১)
৩৪	১০১(১৬২.৬)	২১.৪৮(৬.৫৫)
৩৬	১০৪(১৬৭.৪)	২২.৫১(৬.৮৬)
৩৮	১০৬(১৭০.৭)	২৩.৪৮(৭.১৬)
৪০	১০৯(১৭৫.৫)	২৪.৩৮(৭.৪৩)
৪২	১১১(১৭৮.৭)	২৫.২১(৭.৬৮)
৪৪	১১৩(১৮১.৯)	২৫.৯৮(৭.৯২)
৪৬	১১৫(১৮৫.২)	২৬.৬৮(৮.১৩)
৪৮	১১৭(১৮৮.৪)	২৭.৩১(৮.৩২)
৫০	১১৯(১৯১.৬)	২৭.৮৮(৮.৫০)
৫২	১২১(১৯৪.৮)	২৮.৩৮(৮.৬৫)
৫৪	১২৩(১৯৮.০)	২৮.৮১(৮.৭৮)
৫৬	১২৫(২০১.৩)	২৯.১৮(৮.৮৯)
৫৮	১২৭(২০৪.৫)	২৯.৪৪(৮.৯৭)
৬০	১২৯(২০৭.৭)	২৯.৭০(৯.০৫)
৬২	১৩১(২১০.৯)	২৯.৮৮(৯.১১)
৬৪	১৩৩(২১৪.১)	২৯.৯৮(৯.১৪)
৬৬	১৩৬(২১৯.০)	৩০.০১(৯.১৫)

চাপ-ঘাটতি বিভিন্নভাবে বের করা যায়। চিরাচরিত নিয়ম হলো অনুভূমিক বিভিন্ন মানের সমচাপ রেখা টানা। এসব সমচাপ রেখা থেকে কেন্দ্র এবং বাইরের চাপ নির্ণয় করা যায়। সর্ব বাইরের সমচাপ রেখা থেকে (যার পর চাপ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে) ঘূর্ণিঝড়ের বাইরের সীমা নির্ধারণ করা যায়। এ সমচাপ রেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের অনুভূমিক বিস্তৃতি নির্দেশ করে।

চাপ-ঘাটতির সাথে সর্বোচ্চ বাতাসের বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। চাপ-ঘাটতি বেশি হলে সর্বোচ্চ বাতাসের পরিমাণও বেশি হয়। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করেছেন। এসব সূত্র থেকে চাপ-ঘাটতি জানা থাকলে সর্বোচ্চ বাতাস এবং সর্বোচ্চ বাতাস জানা থাকলে চাপ-ঘাটতি বের করা সম্ভব। বংগোপসাগরের জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের উপকূলের জন্য এ রকম প্রস্তুতকৃত একটি তালিকা ৩.২ সারণিতে দেয়া হয়েছে। উন্নত দেশে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উড়োজাহাজ দ্বারা ঘূর্ণিঝড়ের ভেতরে ঢুকে বাতাস (সর্বোচ্চ বাতাসসহ), বিভিন্ন স্তরে বায়ুর চাপ, তাপ, ইত্যাদি নির্ণয় করা হয় কখনো কখনো। আজকাল উপগ্রহের ব্যাপক ব্যবহারে তা সহজ হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
ঘূর্ণিঝড়ের জীবনচক্র ও গঠন

আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে নেয়া ঘূর্ণিঝড়ের একটি চিত্র দেয়া হয়েছে (চিত্র ৪.১)। সাদা অংশটুকু মেঘ। চিত্রে দেখা যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের মূল অংশে মেঘ অনেকটা গোলাকার। এখানে বাতাস প্রায় বৃত্তাকারে ঘোরে। মেঘও বাতাসের সাথে ঘোরে। ছবিতে ঘূর্ণিঝড়ের গঠন অতি সাধারণ মনে হয়। বাস্তবে তা নয়। ঘূর্ণিঝড়ের গঠন বেশ জটিল। গঠন আবার ঘূর্ণিঝড়ের জীবনচক্রের (life cycle) সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জীবনচক্র

প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের একটি জীবনচক্র বা জীবনকাল আছে। জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যু। সব ঘূর্ণিঝড়ের জীবনচক্র এক হয় না। কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় জন্মের কয়েক ঘন্টা পর মারা যায়। কোনোটি দু'এক সপ্তাহ এমনকি কোনোটি মাস খানেকও বেঁচে থাকে। আবার এলাকা ভিত্তিতে জীবনকালেরও তারতম্য ঘটে। যেমন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের গড় জীবন ৩–৫ দিন, প্রশান্ত মহাসাগরে ৭ দিন এবং আটলান্টিকে ৯ দিন। বঙ্গোপসাগরে স্বল্প–জীবনের প্রধান কারণ হলো এখানকার তুলনামূলক কম এলাকা। বেশিদিন বাঁচার আগেই উপকূলে আঘাত হেনে নিজের মৃত্যু ঘটায়।

ঘূর্ণিঝড়ের জীবনচক্রকে মোটামুটিভাবে চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা : জন্ম, অপরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় (immature cyclone), পরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় (mature cyclone) এবং মৃত্যু (decay বা death)। জন্ম বা সৃষ্টি সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে মোটামুটিভাবে ঘূর্ণিঝড় জন্ম নেয়ার পর আস্তে আস্তে কলেবরে এবং শক্তিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরিপূর্ণ অবস্থায় এটি অপেক্ষাকৃত কম এলাকা নিয়ে বিস্তৃত থাকে এবং এর অনুভূমিক (horizontal) গঠন হয় অনেকটা প্রতিসম (symmetrical), অর্থাৎ প্রায় গোলাকার। কেন্দ্রে বায়ুর চাপ কমতে থাকে এবং বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিপূর্ণ বয়সে কেন্দ্রে চাপ সর্বনিম্নে পৌঁছায়, সর্বোচ্চ বাতাস মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে এবং আকার সর্বাধিক হয়। ঘূর্ণিঝড় প্রতিসমতা হারিয়ে ফেলে অপ্রতিসম (asymmetrical) হয়ে পড়ে। এরপর আসে মৃত্যু। সাধারণত স্থলভাগে আঘাত করার পর মৃত্যু ঘটে। অধিকতর শীতল সমুদ্র এলাকায় চলে গেলেও মৃত্যু ঘটতে পারে। বঙ্গোপসাগরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পানিতে মৃত্যু ঘটে ডিসেম্বর–মার্চ মাসে। তখন সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করা হবে।

ঘূর্ণিঝড় কখনো আবার নিজস্ব ক্রান্তীয় অঞ্চল ছেড়ে অক্রান্তীয় অঞ্চলে চলে যায়। তখন ঘূর্ণিঝড় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের গঠন আলোচনাকালে এর চারটি ভাগের মধ্যে পরিপূর্ণ অবস্থা নিয়েই আলোচনা করা হবে। কারণ বেশিরভাগ উপাত্ত ও গবেষণা পরিপূর্ণ অবস্থা সংক্রান্ত। আর এ পরিপূর্ণ অবস্থায়ই ক্ষয়-ক্ষতি বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে।

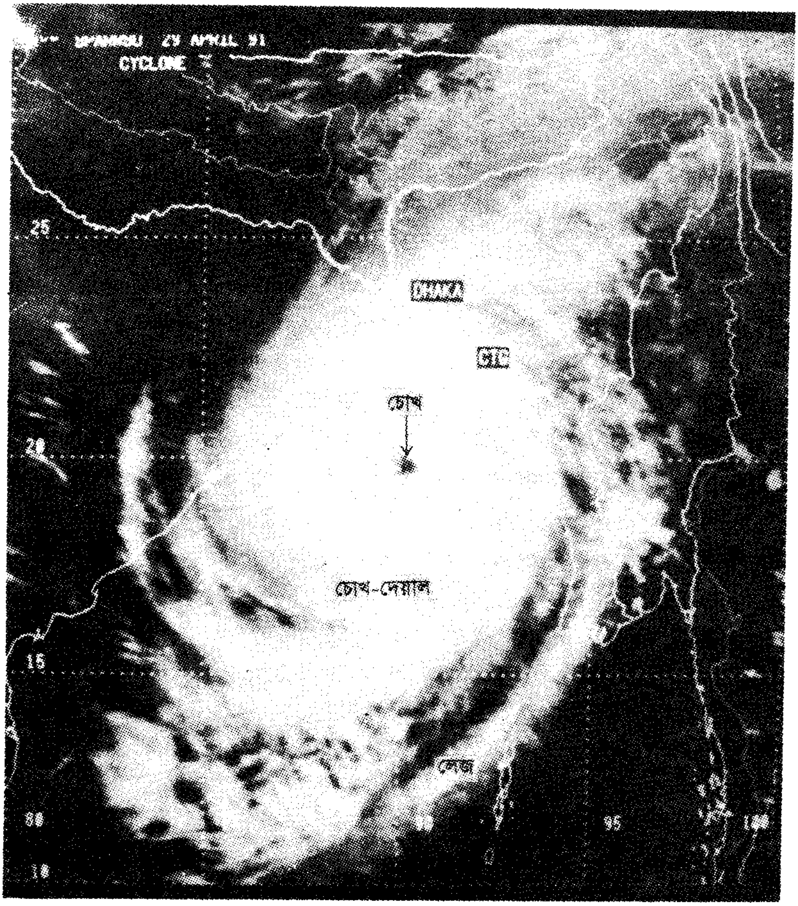

চিত্র ৪.১ : আবহাওয়া উপগ্রহের মাধ্যমে নেয়া বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের চিত্র। সাদা অংশ মেঘ এবং কালো অংশ মেঘমুক্ত। চিত্রে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ, চোখ-দেয়াল, এবং লেজ দেখা যাচ্ছে।

বিস্তৃতি

ঘূর্ণিঝড়ভেদে এবং স্থান ও কালভেদে ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন রকম বিস্তৃতি হতে পারে। একটি পরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় উপরের দিকে পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে সমস্ত ট্রপোস্ফিয়ার এবং নিম্ন স্ট্রাটোস্ফিয়ার জুড়ে বিস্তৃত থাকতে পারে। অনুভূমিক (horizontal-parallel to the earth's surface, পৃথিবীপৃষ্ঠের সমান্তরাল) দিক হতেও ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন বিস্তৃতি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের স্বাভাবিক ব্যাস প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার হতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন আকার হয়ে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের ঘূর্ণিঝড় সাধারণত সবচেয়ে বড় হয়। ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির উপর এর বিস্তৃতি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

গঠন বিভাজন

আগেই বলা হয়েছে গঠন সম্পর্কিত আলোচনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পূর্ণ অবস্থায় ঘূর্ণিঝড় সবচেয়ে মারাত্মক হয় এবং প্রায় সব ঘূর্ণিঝড়ে এ অবস্থায় প্রায় একই বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে। এ সময় গঠন ও বৈশিষ্ট্য প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

ঘূর্ণিঝড়ের গঠনকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : অনুভূমিক গঠন (horizontal structure) যা ভূপৃষ্ঠের প্রায় সমান্তরাল এবং উল্লম্ব গঠন (vertical structure) যা ভূপৃষ্ঠের উপর লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত।

অনুভূমিক গঠন

অনুভূমিক দিক থেকে ঘূর্ণিঝড়কে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায় : যেমন : অন্তরাংশ (Inner part) এবং বহিরাংশ (outer part)। কোনো কোনো আবহাওয়াবিদরা এই উভয় অংশের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী অংশ বা মিথষ্ক্রিয়া অংশের (Interaction envelope) কথা বলেছেন। তবে এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নিয়ম অনুযায়ী অন্তর্বর্তী অংশকে বহিরাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অন্তরাংশ : অন্তরাংশে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ এবং চোখ-দেয়াল অবস্থিত।

চোখ

৪.১ চিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে একটি ছোট, কালো এবং প্রায় বৃত্তাকার অংশ রয়েছে। এটিকে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ (eye) বলে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে অবস্থিত এ চোখ ঘূর্ণিঝড়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সব ঘূর্ণিঝড়ে চোখ থাকে না। সাধারণত প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে চোখ দেখা যায়। চোখ ঘূর্ণিঝড়ের আকারের তুলনায় ছোট এবং প্রায় বৃত্তাকার। কখনো এটি চ্যাপ্টা (elongated) হয়। চোখের ব্যাস প্রায় ৫–৫০ কিলোমিটার। কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড়ে বিশেষ করে টাইফুনে এ ব্যাস প্রায় দ্বিগুণও হতে পারে। চোখে চাপ থাকে সর্বনিম্ন এবং তাপমাত্রা হয় সর্বাধিক। ঘূর্ণিঝড় যতো প্রচণ্ড হয় সাধারণত চোখের তাপমাত্রাও সে অনুপাতে বেশি হয়। চোখে বাতাস থাকে হালকা এবং মেঘ থাকে না বললেই চলে। কখনো কখনো সূর্যও দেখা যায়। বায়ু এখানে প্রধানত নিম্নমুখী বায়ু থাকার কারণে বায়ুর মধ্যকার মেঘ বাষ্পে পরিণত হয় এবং অধিকতর চাপবিশিষ্ট স্তরের দিকে নামার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মেঘ না থাকা বা কম থাকার কারণে চোখে বৃষ্টিপাতও কম হয়।

Library Dhaka

উপগ্রহ চিত্রে চারপাশের ঘনমেঘের পটভূমিতে চোখ খুব স্পষ্ট দেখা যায়, যা ৪.১ চিত্রে আমরা আগেই দেখেছি। সাদা-কালো চিত্রে চোখ কালো দেখায়। কালো পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনায় অধিকতর উষ্ণ এলাকা বুঝায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপগ্রহ ঘূর্ণিঝড়ের উপরিভাগের মেঘের চিত্র গ্রহণ করে। উপরের মেঘ অনেক ঠাণ্ডা থাকে। সাদা-কালো চিত্রে ঠাণ্ডাকে সাদা এবং গরমকে কালো দেখায়। সেজন্য চোখকে কালো এবং চোখের চারদিকে ঠাণ্ডা মেঘকে সাদা দেখা যায়।

চোখ-দেয়াল

চোখ-দেয়াল (eye-wall) চোখকে চারদিকে পরিবেষ্টিত করে রাখে। এর বিস্তৃতি প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার। এখানে বাতাসের বেগ এবং বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি। চোখ-দেয়ালে জলীয়বাষ্প উপরে উঠে ঘন মেঘের সৃষ্টি করে। সর্বোচ্চ বাতাস চোখ-দেয়ালে পরিলক্ষিত হয়। কারণ এখানে প্রতি একক দূরত্বে বায়ুর চাপের পরিবর্তন অন্য স্থানের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। আবহাওয়া উপগ্রহের মাধ্যমে নেয়া ঘূর্ণিঝড়ের চিত্রে (চিত্র ৪.১) চোখের চারপাশে ঘনীভূত বৃত্তাকার মেঘমালা (rainband) চোখ-দেয়ালেরই মেঘ। চোখ-দেয়ালের সর্ব ভিতরে মেঘমালা প্রধানত বৃত্তাকার হয়। এটি চোখকে সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত করে রাখে। সাধারণত এটিকে বলা হয় ভিতরের পূর্ণ বৃত্ত (Inner closed ring)। কিন্তু কখনো কখনো একটি বৃত্ত পুরো চোখকে পরিবেষ্টিত করে রাখে না। ভেতরের পূর্ণ বৃত্তের বাইরে মেঘমালা পূর্ণ বৃত্তাকার না হয়ে বৃত্তচাপের মতো হতে পারে। এ রকম একাধিক মেঘমালার বৃত্তচাপ (arc of a circle) চোখকে ঘিরে রাখতে পারে। এগুলো চোখ-দেয়ালেরই অংশ। একাধিক মেঘমালার বৃত্তচাপ একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে বা তাদের মধ্যে ফাঁক রেখে চোখকে পরিবেষ্টিত করতে পারে। তাছাড়া চোখকে ঘিরে রাখা মেঘমালার একাধিক বৃত্ত বা বৃত্তচাপ বিভিন্ন ব্যাসার্ধের হতে পারে। বিভিন্ন বৃত্ত বা বৃত্তচাপের মধ্যকার ফাঁকা অংশ উপগ্রহ চিত্রে কালো দেখায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে বৃত্ত বা বৃত্তচাপ কোনো রেখা নয়। এদের একেকটার বিস্তৃতি কয়েক কিলোমিটার হতে পারে। শুধু আকারে বা দেখতে এরা বৃত্তচাপের মতো।

বহিরাংশ

চোখ-দেয়ালের বাইরের সীমানা থেকে বাতাসের বেগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। চোখ-দেয়ালের পর থেকে ঘূর্ণিঝড়ের বহিরাংশ শুরু হয়। বহিরাংশ ক্রমে বাইরের স্বাভাবিক চাপ, তাপমাত্রা, ইত্যাদির সাথে মিশে যায়। ঘূর্ণিঝড়ের বহিরাংশ সর্বোচ্চ বাতাস ব্যাসার্ধের প্রায় ৩-৬ গুণ দূরত্ব থেকে শুরু হয়।

উল্লম্ব গঠন

উল্লম্বভাবে ঘূর্ণিঝড়কে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভাজন উচ্চতার সাথে বাতাসের পরিবর্তনভিত্তিক। ভাগ তিনটি হচ্ছে :

নিম্নাংশ বা নিম্নের কেন্দ্রমুখী অংশ
উপরাংশ বা উপরের বহির্মুখী অংশ
মধ্যাংশ বা মধ্যের ঊর্ধ্বমুখী/নিম্নমুখী অংশ

একটি আদর্শিক (idealized) এবং অক্ষীয়ভাবে প্রতিসম (Axially symmetric) ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাস বরাবর একটি উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ (Vertical cross-section) ৪.২ চিত্রে দেখানো হয়েছে। প্রতিসম মানে ঘূর্ণিঝড়টি বৃত্তাকার ; কেন্দ্রের চতুর্দিকে সমদূরত্বে সমঅবস্থা বিরাজমান। ঘূর্ণিঝড়টির ঠিক মধ্যে এর চোখ। চিত্রে ডানপাশে দেখানো হয়েছে কেন্দ্র থেকে অনুভূমিক দূরত্ব (অর্থাৎ ব্যাসার্ধ) এবং উচ্চতার সাথে স্পর্শ বাতাস এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন। বামপাশে রয়েছে বাতাসের বিভিন্ন গতি।

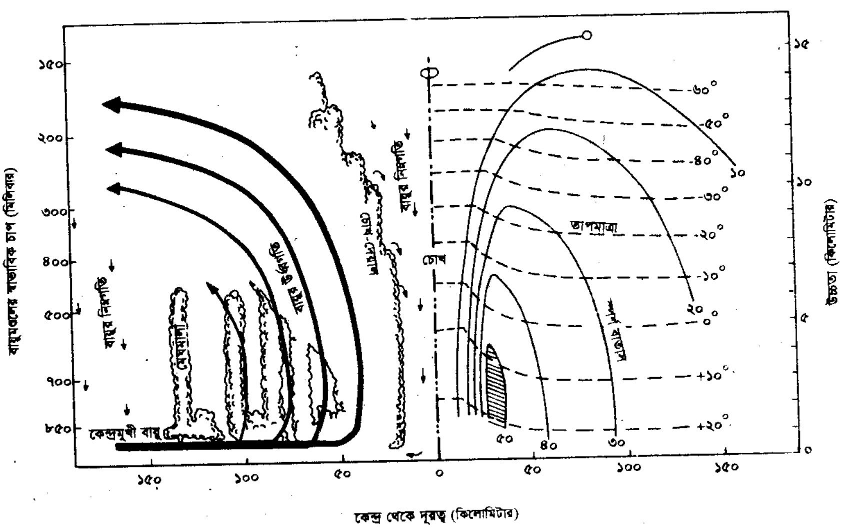

চিত্র ৪.২ : একটি আদর্শিক এবং অক্ষীয়ভাবে প্রতিসম ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাস বরাবর একটি উল্লম্ব প্রস্থচ্ছেদ। মধ্যে চোখ এবং চোখ-দেয়াল। ডান পাশে রয়েছে কেন্দ্র থেকে অনুভূমিক দূরত্ব এবং উচ্চতার সাথে স্পর্শ বাত্যাস (ক্রমশ লাইন) এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন (ড্যাশ লাইন)। বামে বায়ুর কেন্দ্রমুখী এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ এবং কিছু মেঘমালা।

ঘূর্ণিঝড়ের নিম্নাংশে চতুর্দিক (অনুভূমিক) থেকে বায়ু কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় কিন্তু ঠিক কেন্দ্রে পৌছাতে পারে না। কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত বায়ুকে নিচের দিকে বা উপরের দিকে যেতে হবে। নিচে ভূপৃষ্ঠ থাকায় একমাত্র পথ হলো উপরের দিকে যাওয়া। তাই ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যাংশে বাতাস প্রধানত উর্ধ্বমুখী। এ উর্ধ্বমুখী বাতাস চোখ-দেয়ালে বেশি পরিলক্ষিত হয়। উপরে উঠে বায়ু আবার অসীম পর্যন্ত যেতে পারে না। অল্প কিছু অংশ চোখে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়। বেশিরভাগ কেন্দ্রের বাইরের দিকে চলে যায়। বাইরের দিকে যাবার সময় বাতাস ঘড়ির কাঁটার দিকে (উত্তর গোলার্ধে) ঘুরে অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের উপরে বিপরীত ঘূর্ণিঝড় অবস্থান করে। ঘূর্ণিঝড়ের নিচের অংশে অনুভূমিক বাতাস কেন্দ্রমুখী এবং উপরের অংশে বহির্মুখী। সমতা রক্ষার্থে বাইরের দিকে প্রবাহিত বায়ু আবার ঘূর্ণিঝড়ের পার্শ্ব এলাকায় আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে। আর উপর থেকে নামে বলে এ বায়ু হয় শীতল। উর্ধ্বমুখী বায়ু থাকে গরম। চিত্রে বাম পাশে দেখা যাচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়ে বায়ু প্রবাহের একটি উল্লম্ব সেল (Cell) রয়েছে যেখানে নিচে বায়ু কেন্দ্রমুখী, চোখ-দেয়ালে উর্ধ্বমুখী, উপরে কেন্দ্র-বহির্মুখী এবং বাইরে নিম্নমুখী। কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটারের মধ্যে কেন্দ্রমুখী বায়ু বেশি প্রবল।

চিত্রে ডানপাশে দেখা যাচ্ছে স্পর্শ-বাতাস কেন্দ্রে প্রায় শূন্যমান হতে ব্যাসার্ধ বৃদ্ধির সাথে অতি দ্রুত একটি শিখরে পৌছায় এবং পরে ধীরে ধীরে কমে। এ শিখরের মান ও স্পর্শ-বাতাস উচ্চতার সাথেও কমে। সর্বোচ্চ বাতাস পরিলক্ষিত হয় ঘূর্ণিঝড়ের নিচের অংশে।

স্পর্শ-বাতাস সর্বোচ্চ বাতাসের প্রায় ৯০ শতাংশ। উপরিভাগে ঋণাত্মক মান (চিত্রে দেখানো হয়নি) স্পর্শ-বাতাসের উল্টো দিক বুঝাচ্ছে ; অর্থাৎ বায়ু ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হচ্ছে উপরের বিপরীত ঘূর্ণিঝড় থাকার জন্য (উত্তর গোলার্ধের অবস্থা)। এখানে আরো লক্ষণীয় যে একই উচ্চতায় কেন্দ্রে তাপ সর্বাধিক যা গরম চোখের পরিচায়ক। কিন্তু এই পার্থক্য উচ্চতার সাথে কমতে থাকে।

গঠন অসমতা

এতক্ষণ আমরা ঘূর্ণিঝড়কে বৃত্তাকার ও প্রতিসম মনে করেছি। বাস্তবে কিন্তু তা পুরোপুরি ঠিক নয়। মূল ঘূর্ণিঝড় সাধারণত গোলাকার কিন্তু বাইরে অসম। গোলাকার এলাকার বাইরে কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড়ে লম্বা লেজ পরিলক্ষিত হয়। লেজের কারণে ঘূর্ণিঝড়কে অনেকটা স্পাইরেল (Spiral) বা উল্টো কমার (Inverted comma) মতো মনে হয়। ৪.১ চিত্রে ঘূর্ণিঝড়ের লেজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লেজে অনেক মেঘ থাকে। এটি মূল ঘূর্ণিঝড়ের অনেকটা ফিডার (Feeder) হিসেবে কাজ করে। লেজের মাধ্যমে জলীয়বাষ্পবিশিষ্ট বায়ু মূল ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি বৃদ্ধি করে।

লেজকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রধান মেঘমালা (principal rainband) বলা যেতে পারে। মেঘমালা কেন সৃষ্ট হয়, এর সঠিক উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন আবহাওয়া বিজ্ঞানী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আসল অবস্থা এখনো অপরিষ্কার। তবে একটি সহজ ব্যাখ্যা

হচ্ছে—এ মেঘমালাসমূহ নিম্ন অক্ষাংশে সৃষ্ট হয়, যেখানে বাষ্পীভবন খুবই প্রবল। মেঘমালাসমূহ ঘূর্ণিঝড়ের ডানপাশে স্পাইরেলিং করে প্রবেশ করে লেজের সৃষ্টি করে। ডানপাশ দিয়ে কেন বা কিভাবে প্রবেশ করে, তা বাতাসের অসমতা হতে অনুমান করা যেতে পারে।

বাতাসের অসমতা

কেন্দ্রের উভয় পার্শ্বে বাতাস প্রতিসম নয়। উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড়ের ডানদিকে (দর্শক ঘূর্ণিঝড়ের পিছনে এর চলার দিকে তাকিয়ে) বাতাস বেশি থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে। অর্থাৎ বাতাস ঘূর্ণিঝড়ের চতুর্দিকে সমতা বা সিমেট্রি (symmetry) রক্ষা করে না।

ঘূর্ণিঝড় এবং যে পরিবেশে ঘূর্ণিঝড় অবস্থান করে সে পরিবেশের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়াকে (interaction) ঘূর্ণিঝড়ের অসমতার অন্যতম কারণ মনে করা হয়। মিথষ্ক্রিয়া বিভিন্ন কারণে বা বিভিন্নভাবে হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতির সাথে ঘূর্ণিঝড়ের আপন চলার গতির (translational speed) মিথষ্ক্রিয়ার সাহায্যে অসমতার একটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে এবং তা নিম্নরূপ :

ডানপাশে ঘূর্ণিঝড়ের গতি এবং বাতাসের গতি একই দিকে। কাজেই এখানে দুটি বেগ যোগাত্মক (additive)। অন্যদিকে বামপাশে দুটি বেগ একটি অন্যটির বিপরীত। অর্থাৎ তারা বিয়োগাত্মক (subtractive)। সাধারণত উত্তর–পূর্বাংশে সবচেয়ে বেশি বাতাস পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড়ে বাতাস বামপাশে সর্বাধিক।

উপরের আলোচনা হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমুদ্রের দক্ষিণ দিক থেকে ঘূর্ণিঝড় যখন উত্তরে বাংলাদেশকে আঘাত করে, তখন ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ডান অংশে ক্ষয়–ক্ষতির পরিমাণ বেশি হবে। এ ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সর্বোচ্চ বাতাস ব্যাসার্ধের নিকট সর্বাধিক, কারণ এ ব্যাসার্ধে বাতাস সর্বোচ্চ থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি ও বিকাশ

কোনো স্থানে বায়ু উত্তপ্ত হলে তা হালকা হয়ে উপরে উঠে। ফলে চারপাশের বায়ুর তুলনায় উত্তপ্ত এলাকার বায়ুর চাপ কমে যায়। তখন অপেক্ষাকৃত কম চাপ এলাকার দিকে পার্শ্ববর্তী অধিক চাপবিশিষ্ট এলাকা থেকে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। কোরিওলিস বল ও ঘর্ষণ বলের জন্য বায়ু সোজাপথে উচ্চচাপ এলাকা থেকে নিম্নচাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত না হয়ে উত্তর (দক্ষিণ) গোলার্ধে ডান (বাম) দিকে কিছু বেঁকে ঘুরে ঘুরে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। অতি সাধারণভাবে বলতে গেলে ঘূর্ণিঝড় এভাবে সৃষ্টি হয় বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় এতো সহজভাবে সৃষ্ট হয় না। এর জন্ম ও শক্তি বৃদ্ধির অনেক কারণ রয়েছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা সব কারণ সম্পর্কে এখনো পুরোপুরি একমত হতে পারেননি। একমত না হতে পারার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত পর্যাপ্ত পরিমাণ সঠিক উপাত্তের অভাব যা সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং সমগুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে স্থানকাল ও ঘূর্ণিঝড়ভেদে ঘূর্ণিঝড়ের জন্মের ভিন্নতা। ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম ও বিকাশের কারণ নিয়ে এখনো প্রচুর গবেষণা চলছে। তবে প্রধান কয়েকটি কারণ/শর্তাবলি সম্পর্কে আবহাওয়াবিদরা মোটামুটি একমত। সেগুলো হচ্ছে :

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রধান প্রধান শর্তাবলি

(১) গরম সমুদ্র পানি, পানির ন্যূনতম তাপমাত্রা ২৬–২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
(২) কোরিওলিস বলের উপস্থিতি।
(৩) উচ্চতার সাথে অনুভূমিক সাধারণ বায়ু প্রবাহের স্বল্প বা শূন্য বাড়তি।
(৪) পূর্ব-বিদ্যমান গোলযোগ।
(৫) নিচে নিম্নচাপ এবং উপরে উচ্চচাপ।

এগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

গরম সমুদ্র পানি

দেখা গেছে যে, যে সকল স্থানে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় সে সকল স্থানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ২৬–২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একারণে সম্ভবত পৃথিবীর সর্বত্রই স্থানীয় গরমকালে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। আবার গরম স্থান থেকে শীতল স্থানে চলে গেলে ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারায় ; অনেক সময় ঘূর্ণিঝড়ের মৃত্যুও ঘটে। বঙ্গোপসাগরে এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, সে সম্পর্কে দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর গোলার্ধের তুলনায় স্থলভাগ কম থাকাতে দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলীয় ঠাণ্ডা পানি উত্তর দিকে সহজেই প্রবাহিত হতে পারে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে বিযুবরেখা থেকে দক্ষিণ দিকে ঘূর্ণিঝড়ের জন্মস্থানের বিস্তৃতি উত্তর গোলার্ধের চেয়ে বেশ কম (বিস্তারিত দশম অধ্যায়ে)।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বছরে মোটামুটিভাবে একবার ঘূর্ণিঝড় স্থানীয় সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছায়। কিন্তু বঙ্গোপসাগর তার ব্যতিক্রম। এখানে সর্বোচ্চ শিখর দুটি ; দক্ষিণ–পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের পূর্বে এবং পরে। ইংরেজিতে বলা হয় pre-monsoon এবং post-monsoon শিখর। এ দু'সময়ে বঙ্গোপসাগরে পানির তাপমাত্রাও সর্বোচ্চ দুটি শিখরে পৌঁছে। এ বিষয়ে দশম অধ্যায়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা প্রধানত দুটি কারণে প্রয়োজনীয় হতে পারে : নিম্নচাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ু গরম ও হালকা হওয়ার জন্যে (সৃষ্টি) এবং পানি উত্তপ্ত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তির মূল উৎস জলীয়বাষ্প যোগানোর জন্যে (বিকাশ)।

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য ন্যূনতম তাপমাত্রা প্রয়োজনীয় হলেও অনেক সময় দেখা যায় তাপমাত্রা ২৬–২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ উপরে আছে ; কিন্তু ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় না। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা এবং পানির তাপমাত্রার মধ্যে পরিসংখ্যানগত কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক (Statistically significant correlation) কোথাও পাওয়া যায়নি। তাই দেখা যাচ্ছে ন্যূনতম তাপমাত্রা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়।

গ্রীনহাউস গ্যাস প্রভাবের (effect) ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু উপরের শর্ত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে এ জাতীয় কোনো উপসংহার সহজে টানা যাবে না।

কোরিওলিস বলের উপস্থিতি

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য কোরিওলিস বল অপরিহার্য। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উচ্চতার সাথে বাতাসের পরিবর্তন

ঘূর্ণিঝড়ের সাথে প্রধানত দু'ধরনের বাতাস জড়িত থাকে। একটি ঘূর্ণিঝড়ের নিজস্ব বাতাস, অন্যটি স্থানীয় বা পারিপার্শ্বিক সাধারণ বায়ুপ্রবাহ। ঘূর্ণিঝড় না থাকলেও এ পারিপার্শ্বিক বায়ু প্রবাহ সর্বদাই বিদ্যমান। একটি উদাহরণ হচ্ছে মৌসুমী বায়ু যদিও এটি ঋতুভিত্তিক। উভয়ের মিলিত মিথষ্ক্রিয়া ঘূর্ণিঝড়ের বিকাশ ও গঠনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। উচ্চতার সাথে পারিপার্শ্বিক বাতাসের পরিবর্তনের উপর ঘূর্ণিঝড়ের বিকাশ অনেকাংশে নির্ভরশীল।

উচ্চতার সাথে পারিপার্শ্বিক বাতাসের পরিবর্তনের চারটি উদাহরণ ৫.১ চিত্রে দেয়া হলো। (ক) চিত্রে বাতাস পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। উচ্চতার সাথে বাতাসের গতি বাড়ছে। এ রকম বাতাস মধ্য অক্ষাংশে (প্রায় ৩০–৬০ ডিগ্রি) দেখা যায়। এ বাতাসকে সাধারণত বলা হয় পশ্চিমা বাতাস (westerly wind)। (খ) চিত্রে নিম্নভাগে বাতাস পূব

থেকে পশ্চিম দিকে (পূবাল বাতাস বা Easterly wind) এবং উপরিভাগে পশ্চিম থেকে পূবদিকে। (গ) চিত্রে (খ) চিত্রের ঠিক উল্টো। (খ) এবং (গ) অবস্থাকে অনেকটা এ উপমহাদেশের শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে (মৌসুমী বায়ুর ক্ষেত্রে পূর্ব–পশ্চিমের বদলে উত্তর–দক্ষিণ হবে)। (ঘ) চিত্রে বাতাসের কোনো পরিবর্তন নেই।

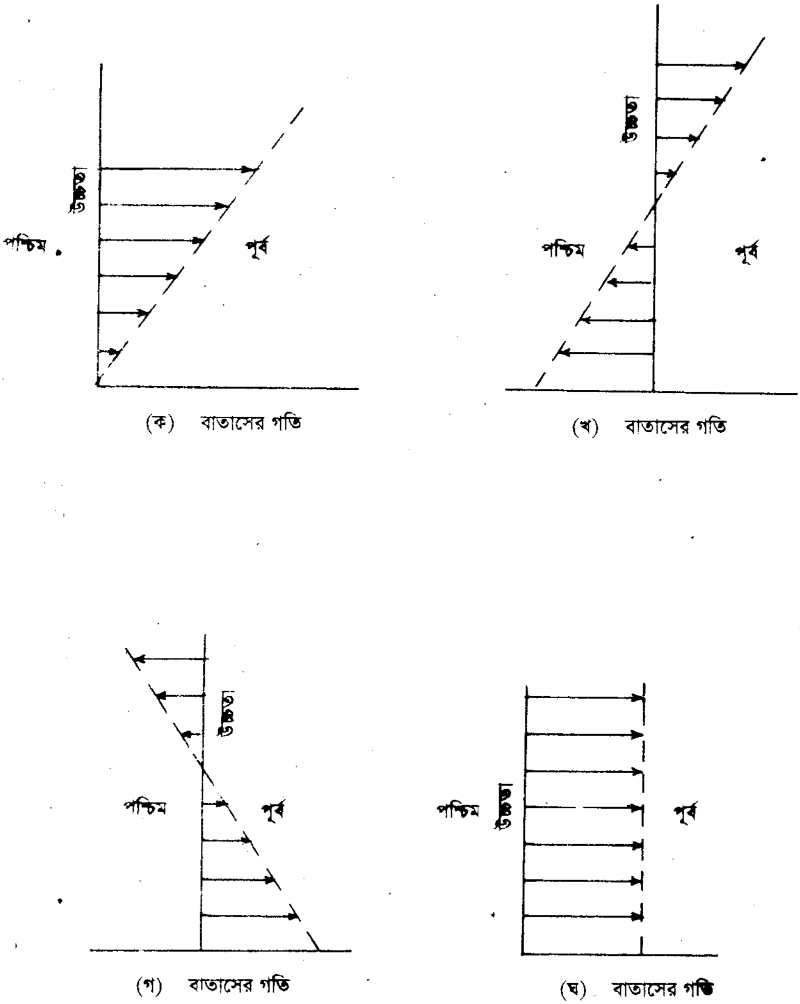

চিত্র ৫.১ : উচ্চতার সাথে পারিপার্শ্বিক বাতাসের পরিবর্তন। (ক) পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে (পশ্চিমা বাতাস) উচ্চতার সাথে বাড়ছে, মধ্য অক্ষাংশে দেখা যায় ; (খ) নিচে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উপরে পশ্চিম থেকে পূর্বে। (গ) খ–এর ঠিক উল্টো এবং (ঘ) অপরিবর্তনশীল বাতাস।

উচ্চতার সাথে বাতাসের পরিবর্তনকে ইংরেজিতে বলা হয় wind shear বা 'বাতাসের উঠা-নামা'। কম বা শূন্য পরিবর্তন (উদাহরণ 'ঘ') ঘূর্ণিঝড়ের উচ্চতা তথা শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সহায়ক। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় উপরের দিকে অনেক দূর বিস্তৃত থাকে। কিন্তু অধিক শিয়ারসম্পন্ন পরিবেশ এ বিস্তৃতিকে বাধা দেয়। উপরের দিকে উঠন্ত ঘূর্ণিঝড়ের উপরের ভাগকে অনেকটা 'চপ অফ' (Chop off) করে ঘূর্ণিঝড় এলাকা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার প্রবণতা থাকে। উপরের দিকে বেশি উঠতে না পারায় ঘূর্ণিঝড়ের বিস্তৃতি সীমিত থাকে এবং জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সুপ্ত তাপ সৃষ্টি সীমিত হয়ে পড়ে ; ফলে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি তেমন বৃদ্ধি পায় না।

মৌসুমী বায়ু প্রবাহকালে বঙ্গোপসাগর এলাকায় উইন্ড-শিয়ার বেশ প্রবল থাকে। এ প্রবল শিয়ার মৌসুমী নিম্নচাপের উপরের দিকে তেমন বিস্তৃত তথা অধিক শক্তিসম্পন্ন না হওয়ার একটি প্রধান কারণ। পক্ষান্তরে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের পূর্বে এবং পরে (এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর) এ শিয়ার অনেক দুর্বল থাকে। ফলে ঘূর্ণিঝড় উপরের দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে তেমন বাধার সম্মুখীন হয় না। দুর্বল শিয়ারের কারণে তাই এ দু'সময় ঘূর্ণিঝড় আমাদের এলাকায় প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠে।

পূর্ব-বিদ্যমান গোলযোগ

পূর্ব-বিদ্যমান গোলযোগের (pre-existing disturbance) অবস্থান বা উপস্থিতি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির আরেকটি প্রধান শর্ত। কালের পরীক্ষায় এ শর্ত উত্তীর্ণ হয়েছে। এ শর্ত অনুযায়ী আগে থেকেই অবস্থিত কোনো গোলযোগ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম হয়। তবে কেন এবং কিভাবে এ গোলযোগের সৃষ্টি হয় তা এখনো অজানা। খুব অল্প ক্ষেত্রে মৃত-প্রায় ঘূর্ণিঝড় পূর্ব-বিদ্যমান গোলযোগ হিসেবে কাজ করে এবং পুনর্জীবন লাভ করে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। যেমন আটলান্টিক মহাসাগরের কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় মধ্য আমেরিকা অতিক্রম করে (অতিক্রম করার সময় দুর্বল হয়ে পড়ে) প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে নতুন জীবন লাভ করে। বঙ্গোপসাগরের কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় (সংখ্যায় অতি অল্প) জাপান-ফিলিপাইন এলাকার টাইফুন থেকে জন্ম নেয়। ১৯৭২ সালে টাইফুন 'এল সি' এবং 'ফ্লোসি' বঙ্গোপসাগরে এসে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসের ঘূর্ণিঝড় ছিল টাইফুন 'স্কিপ' এর উত্তরসূরি। এই টাইফুন ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামে প্রচণ্ড ক্ষতি করার পর শ্যাম উপসাগর থেকে মিয়ানমার অতিক্রম করে আন্দামান সাগরে প্রবেশ করে এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড়/মৌসুমী নিম্নচাপ ভারত/শ্রীলংকা অতিক্রম করে দুর্বল হয়ে আরব সাগরে পড়ে আবার নতুন জীবন লাভ করে। তবে এ জাতীয় পুরাতোন ঘূর্ণিঝড়কে ঠিক গোলযোগ পর্যায়ে ফেলা বোধ হয় ঠিক হবে না ; কারণ এদের সংখ্যা মোট গোলযোগের সংখ্যার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

গোলযোগ অনেক মেঘমালা বা মেঘপুঞ্জের (cloud clusters) সমষ্টি। অতি সহজে এগুলো আবহাওয়া উপগ্রহে ধরা পড়ে। পৃথিবীর কোথায় কোথায় গোলযোগ আছে, তা আবহাওয়া উপগ্রহের সাহায্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। সকল মেঘপুঞ্জ বা গোলযোগ আবার ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয় না। সাধারণত দেখা যায় যে মেঘমালা/গোলযোগ বেশ কয়েকদিন ধরে বিদ্যমান কিন্তু তা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ লাভ করেনি। তবে সব ঘূর্ণিঝড়ই এ রকম অবস্থা থেকে সৃষ্ট হয়।

নিচে নিম্নচাপ এবং উপরে উচ্চচাপ

ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি এবং বিকাশের আরেকটি শর্ত হলো নিম্নস্তরে কেন্দ্রমুখী প্রবাহ (নিম্নচাপ) এবং উপরে কেন্দ্রবহির্মুখী প্রবাহ (উচ্চচাপ বা বিপরীত ঘূর্ণিঝড়)। যখন নিম্নস্তরের নিম্নচাপের উপরে উচ্চচাপের অবস্থিতি ঘটে তখন ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি বা বিকাশ সহজতর হয়। আর যদি নিম্নচাপের উপরে আরেকটি নিম্নচাপ বা ট্রাফ (trough, এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে) থাকে, তাহলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি/বিকাশ দমিত হয়। বলা যেতে পারে যে উপরের উচ্চচাপ অনেকটা পাম্পের মত নিচ থেকে বায়ুকে টেনে নেয়। নিম্নচাপ থেকে উপরের দিকে উঠন্ত বায়ুকে সমতা রক্ষার্থে বাইরের দিকে প্রবাহিত হতে হয়। উচ্চচাপ এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করে। পূর্ব-বিদ্যমান কোনো গোলযোগের উপরে যদি ঘটনাচক্রে কোনো উচ্চচাপ এসে পড়ে বা সৃষ্ট হয়, তাহলে গোলযোগের ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয়

আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয়ের (Intertropical Convergence Zone—ITCZ আই টি সি জেড) সাথে ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বর্ণনার সুবিধার্তে আমরা এখানে মিলন বলয় বা শুধু বলয় ব্যবহার করবো।

আমরা জানি বিষুবরেখা অঞ্চলে সারা বছর পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি সূর্য কিরণ পড়ে। ফলে সারা বছর এখানে তাপ এবং তাপমাত্রাও বেশি থাকে। অধিক তাপমাত্রার জন্য বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে। ফলে উভয় পার্শ্বে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় এখানে বায়ুর চাপ কম হয়। সুতরাং উভয় দিক হতে বায়ু ট্রপোস্ফিয়ারের নিম্নভাগে বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে সোজাসুজি প্রবাহিত হতে চায়। কোরিওলিস বলের কারণে এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৫.২)। (এখানে স্মরণযোগ্য যে কোরিওলিস বল উত্তর গোলার্ধে বলের ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে কাজ করে)। এই দু-প্রবাহ যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু (North-east trade wind) এবং দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু (South-east

trade wind) নামে পরিচিত। বাণিজ্য বায়ুর বিস্তৃতি মোটামুটিভাবে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ হতে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত। এ বিস্তৃতিকে কখনো আবার বাণিজ্য বায়ু বেল্টও (trade wind belt) বলা হয়। উভয় বাণিজ্য বায়ুর মিলনস্থলকে বলা হয় আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয়। এ বলয় পৃথিবীর চারপাশে প্রায় সমস্ত বিষুবীয় অঞ্চল জুড়ে পৃথিবীকে ঘিরে আছে। মধ্যে মধ্যে ফাঁকা জায়গা দৃষ্ট হয়। মিলন বলয়ে সারা বছরই মেঘ দেখা যায় ; কারণ এখানে পানি প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত হয়ে জলীয়বাষ্প সৃষ্টি করছে যা থেকে মেঘ/মেঘমালা জন্ম নিচ্ছে। আবহাওয়া উপগ্রহে এ মেঘের ছবি সুন্দরভাবে ধরা পড়ে। এসব ছবির সাহায্যে মিলন বলয়ের অবস্থান, বিস্তৃতি এবং অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য পাওয়া আজকাল একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

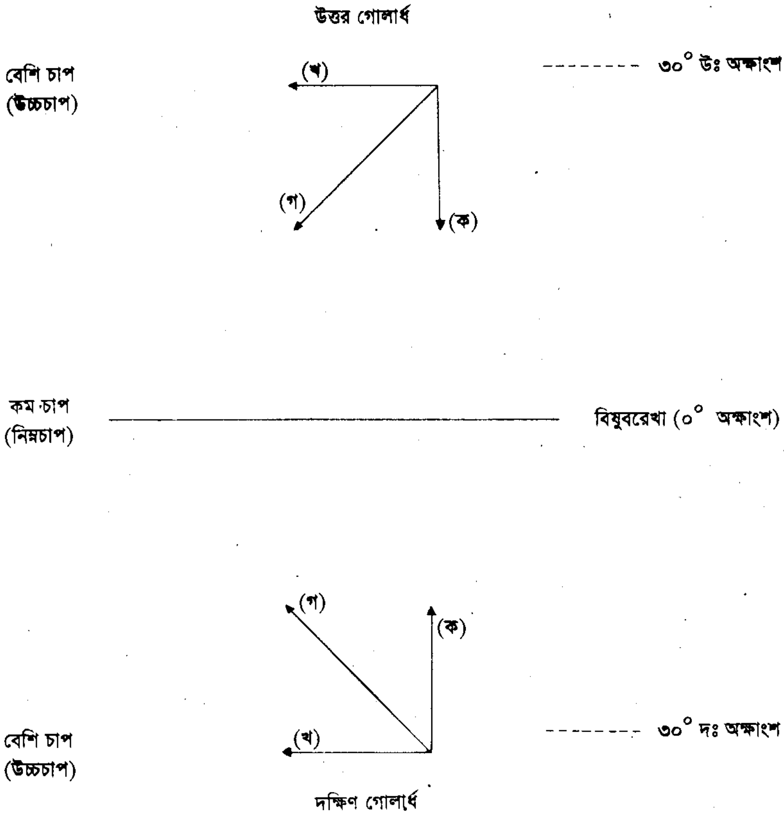

চিত্র ৫.২ : উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব বাণিজ্য বায়ু। (ক) চাপের তারতম্যের কারণে বায়ুপ্রবাহ (খ) কোরিওলিস বল এবং (গ) লব্ধি বাতাস বা বাণিজ্য বায়ু

আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয়কে কখনো কখনো আবার মৌসুমী ট্রাফ (monsoon trough)ও বলা হয়, যদিও কোনো কোনো আবহাওয়াবিদরা উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করে থাকেন। কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু বা স্থানের চারদিকে উচ্চচাপের বদলে যদি কোনো লাইনের/লাইন এলাকার উভয় পার্শ্বে (ঐ লাইন বা লাইন এলাকার তুলনায়) উচ্চচাপ থাকে, তখন ঐ লাইন বা এলাকাকে বলা হয় ট্রাফ। আবহাওয়া চার্টে একে সাধারণত লাইন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ট্রাফের উল্টো হচ্ছে রিজ (ridge)–লাইন বরাবর উচ্চচাপ এবং উভয়পার্শ্বে কম চাপ। (পাহাড়ি অঞ্চল এবং সমুদ্র–তলে অধিকতর উঁচু এবং লম্বা বিস্তীর্ণ এলাকাকেও রিজ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ৯০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ বরাবর রিজ—যাকে ৯০ ডিগ্রি পূর্ব–দ্রাঘিমা রিজ (90°E ridge) বলা হয়। এর উভয় পার্শ্বে পূর্বে–পশ্চিমে সমুদ্র তল অপেক্ষাকৃত গভীর)।

আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয় বা মৌসুমী ট্রাফ ছাড়াও বিভিন্ন আবহাওয়াবিদরা বিভিন্ন যুক্তিতে মিলন বলয়ের বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেছেন। তাদের কয়েকটি ইংরেজি নাম হচ্ছে : Intertropical Front, Equatorial Front, Equatorial Trough, Near-Equatorial Trough, Equatorial Convergence Zone, Equatorial Shear Line এবং Trade Confluence। তবে বেশিরভাগ প্রবণতাই আই টি সি জেড এর পক্ষে এবং তাই আমরা এখানে ব্যবহার করেছি।

মিলন বলয় সারা বছর এক জায়গায় স্থির থাকে না। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যে সূর্যের চলাচলের সাথে এ বলয়ও উত্তর–দক্ষিণে প্রচরণ (migrate) করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি এবং ঋতু পরিবর্তনের সাথে ঘূর্ণিঝড়ের জন্মস্থানের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় মিলন বলয় এবং এর প্রচরণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। উত্তর ভারত মহাসাগরে (আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরে) এ সম্পর্ক স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এ এলাকায় মিলন বলয়ের প্রচরণের সাথে ঘূর্ণিঝড়ের জন্মস্থানের পরিবর্তনের তুলনামূলক সম্পর্ক ৫.৩ চিত্রে দেখানো হলো। চিত্রে ঘূর্ণিঝড়ের গড় জন্মস্থান এবং বলয়ের গড় অবস্থান নির্দেশিত করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি মাসে মিলন বলয় অনেক দক্ষিণে থাকে, বিষুবরেখার প্রায় কাছাকাছি। এ সময় আমাদের এলাকায় কোনো ঘূর্ণিঝড় হয় না বললেই চলে (এ সম্পর্কে দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। যে কয়টিই জন্ম নেয় সেগুলো বিষুবরেখার কাছাকাছি (বিষুবরেখায় নয়, কিছু দূরে) সৃষ্ট হয়। মিলন বলয় মার্চ মাস থেকে আস্তে আস্তে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। একই সাথে ঘূর্ণিঝড়ের জন্মস্থানও উত্তর দিকে সরে যায়। দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী কালে (জুন–সেপ্টেম্বর) মিলন বলয় উপমহাদেশের স্থলভাগের উপর চলে আসে। অনেকটা উত্তর–পশ্চিম এবং দক্ষিণ–পূর্ব দিক বরাবর অবস্থান নেয়। এ সময় যখন এর পূর্বাংশ বঙ্গোপসাগরে পড়ে তখন প্রায়ই মৌসুমী নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মিলন বলয় আবার আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে এবং ঘূর্ণিঝড়ের জন্মস্থানও ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। সবশেষে বলয় বঙ্গোপসাগরের প্রায় দক্ষিণ মাথায় ফিরে যায়।

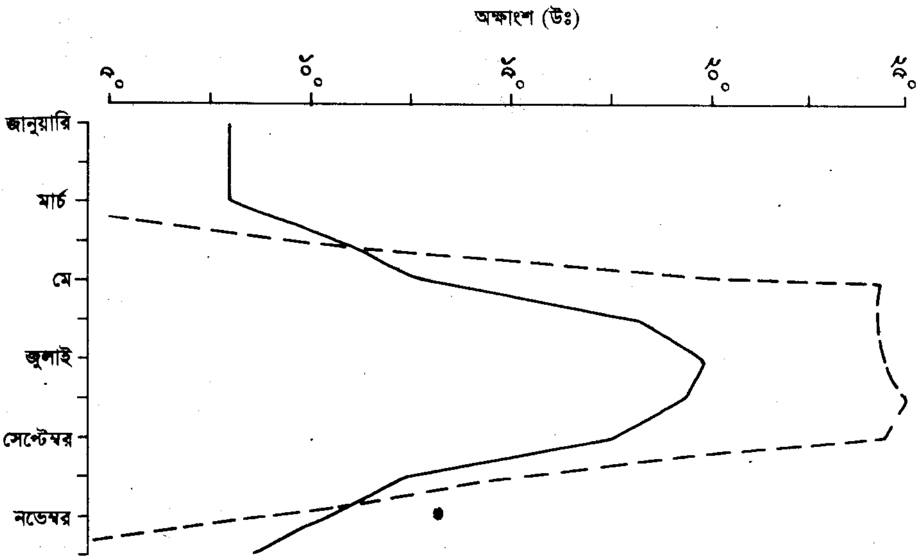

চিত্র ৫.৩ : ৬০–১০০ ডিগ্রি পূ: দ্রাঘিমাংশের মধ্যে আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয়ের উত্তর–দক্ষিণে প্রচরণের সাথে (ড্যাশ লাইন) বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের জন্মস্থানের পরিবর্তন (ক্রমশ লাইন)।

মিলন বলয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্পর্কে এখনো সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে বলয়ের মেঘমালা (গোলযোগ) এর একটি প্রধান কারণ হতে পারে।

পুবাল তরঙ্গ

ঘূর্ণিঝড়ের আরেকটি উৎস/কারণ হচ্ছে পুবাল তরঙ্গ (Easterly waves)। এ তরঙ্গ সাধারণত আয়ন বায়ুতে পরিলক্ষিত হয়। পুব থেকে পশ্চিমে ঢেউ–এর আকারে প্রবাহিত হয় বলে এর এ নাম। আফ্রিকা অঞ্চল এ তরঙ্গ সৃষ্টির প্রধান এলাকা। এখানে সৃষ্টির পর এ তরঙ্গ আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে আমেরিকার দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়। উত্তর আটলান্টিকের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল) প্রায় অর্ধেকের বেশি ঘূর্ণিঝড় পুবাল তরঙ্গ থেকে সৃষ্ট। অনেক তরঙ্গ আবার মধ্য আমেরিকা অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি জন্মায়। অস্ট্রেলিয়ার নিকটে কিছু ঘূর্ণিঝড় এ তরঙ্গ থেকে জন্মায়, যার উৎস হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ।

মৌসুমী বায়ু প্রবাহ

মৌসুমী বায়ু প্রবাহ বা 'মনসুন' (Monsoon wind) আমাদের উপমহাদেশে খুবই পরিচিত। এ সময় এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কখনো কখনো বন্যা দেখা দেয় ; জান–মালের

প্রচুর ক্ষতি হয়। আরার এ মৌসুমী ঋতু আমাদের আর্থ–সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক অবদান রাখে।

মনসুন আরবি শব্দ 'মৌসিন' হতে উদ্ভূত। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঋতু। মৌসুম মানে ঋতুভিত্তিক বাতাস। এ শব্দটি সর্বপ্রথম আরব সাগরের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জল ও স্থলভাগের মধ্যে বায়ুপ্রবাহের জন্য ব্যবহার করা হয়।

শীতকালে উপমহাদেশ এবং এর উত্তরের এলাকায় ঠাণ্ডা পড়ে এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উত্তর ভারত মহাসাগর তুলনামূলকভাবে উত্তরে স্থলভাগের চেয়ে অধিকতর উত্তপ্ত থাকে। এর প্রধান কারণ হলো সূর্য তখন দক্ষিণ গোলার্ধে খাড়াভাবে কিরণ দেয় এবং বঙ্গোপসাগরের তুলনায় উপমহাদেশ সূর্য থেকে অধিক দূরে থাকে। ফলে ট্রপোস্ফিয়ারের নিম্নভাগে আমাদের এ এলাকায় বায়ু উত্তর দিক হতে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ু ঠিক উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় না। কোরিওলিস বলের জন্য বায়ু তার প্রবাহ–দিকের ডানদিকে বেঁকে ধাবিত হয়। ফলে এ বায়ুপ্রবাহকে উত্তর–পূর্ব (উত্তর–পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয় বলে) মৌসুমী বায়ু বলা হয়। উত্তর–পূর্ব মৌসুমী বায়ু সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত দৃষ্ট হয়। বায়ুপ্রবাহে সমতা রক্ষার্থে উপরিভাগের বায়ু সমুদ্র থেকে অর্থাৎ দক্ষিণ–পশ্চিম দিক হতে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়।

গরমকালে ঘটে ঠিক উল্টো। এ সময় সূর্য স্থলভাগের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয় ; তখন স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় বেশি উত্তপ্ত থাকে। ফলে ট্রপোস্ফিয়ারের নিম্নভাগে বায়ু দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে প্রবাহিত হতে চায় ; আবার পৃথিবীর ঘূর্ণন বা কোরিওলিস বলের জন্য ডানদিকে বেঁকে দক্ষিণ–পশ্চিম দিক হতে আমাদের উপমহাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। আমাদের এলাকায় এ বায়ুকে বলা হয় দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। সংক্ষেপে মৌসুমী বায়ু বলে অধিক পরিচিত। তখন আমরা বলি মনসুন শুরু হয়েছে। মৌসুমী বায়ু সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। শীতকালের মতো সমতা রক্ষার্থে গ্রীষ্মকালে উপরিভাগে বায়ু উত্তর–পূর্ব দিক হতে (স্থল হতে জলের দিকে) সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়।

মৌসুমী বায়ুপ্রবাহকালের আগের ও পরের সময়কালকে আমাদের অঞ্চলে বিশেষ দুটি নামে অভিহিত করা হয় : মৌসুম–পূর্ব (pre-monsoon) এবং মৌসুম–উত্তর (post-monsoon)। এপ্রিল–মে এ দুমাস মৌসুম-পূর্ব এবং অক্টোবর–ডিসেম্বরকে মৌসুম-উত্তরকাল বলা হয়। এই দুই সময় বঙ্গোপসাগর সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত থাকে এবং তখনকার ঘূর্ণিঝড়গুলো সবচেয়ে প্রবল আকার ধারণ করে। মৌসুমকালে যে সকল ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়, তাদের বেশিরভাগকে মৌসুমী নিম্নচাপ বলা হয়।

গ্রীনহাউস প্রভাব

শীতপ্রধান দেশে সূর্যের আলোর স্বল্পতার কারণে (এবং বরফের প্রভাব হতে শস্য বাঁচানোর জন্যে) গ্রীনহাউস (Greenhouse) বা 'সবুজ ঘর'–এ শস্য ফলানোর প্রচলন আছে। ঘরটি কাচের–বেড়া ও ছাদ উভয়ই। ভেতরের সবুজ শস্য। তাই এর এ রকম নাম।

সূর্যের মতো প্রতিটি বস্তু তাপ বিকিরণ করে। তবে সূর্যের বিকিরণ এবং পৃথিবীর বিকিরণের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। সূর্যের আলো অতি সহজে গ্রীনহাউসের কাচ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে তাপ বৃদ্ধি করে। কিন্তু ভেতর থেকে শস্য, মাটি, পানি ইত্যাদি কর্তৃক বিকিরণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হওয়াতে কাচ সে তাপকে বাইরে যেতে বাধা দেয়। ফলে গ্রীনহাউসের ভেতর গরম থাকে, যা শস্যের ফলনের জন্য উপযোগী।

আমাদের এ পৃথিবীকে গ্রীনহাউসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে বায়ুমণ্ডলে কোনো কাচ নেই ; তবে বায়ুমণ্ডলের কিছু কিছু গ্যাস কাচের মত (!) কাজ করে। এদের বলা হয় গ্রীনহাউস গ্যাস (Greenhouse gas)। কার্বনডাই-অক্সাইড (CO_2) এদের অন্যতম। বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা তা দেখেছি)। কিন্তু এর প্রভাব খুবই লক্ষণীয়। সূর্য থেকে আগত আলো অতি সহজে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছে পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং এর নিকটতম বায়ুকে উত্তপ্ত করে। কিন্তু গ্রীনহাউসের মতো পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হওয়াতে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে বায়ুমণ্ডলের গ্রীনহাউস গ্যাস কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাপ অনেকটা ফাঁদে (trap) পড়ে আটকে যায়। তবে সব তাপ যে আটকা পড়ে তেমন নয়। আটকে পড়াতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পৃথিবীর উপর বিভিন্ন রকম প্রভাব ফেলে। এ প্রভাবকে আমরা বলি গ্রীনহাউস গ্যাস প্রভাব বা শুধু গ্রীনহাউস প্রভাব (Greenhouse effect)।

বছরের পর বছর ধরে সূর্যের আলো, পৃথিবীর বিকিরণ এবং গ্রীনহাউস প্রভাবের কারণে পৃথিবীতে একটি সমভার তাপমাত্রা (Equilibrium temperature) বজায় রয়েছে যার গড় মান প্রায় ১৫° সেলসিয়াস। সেদিক থেকে গ্রীনহাউস গ্যাস আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। যদি গ্রীনহাউস গ্যাস না থাকতো তবে সমস্ত তাপ আবার মহাকাশে চলে যেতো এবং পৃথিবী হতো শীতল, বসবাসের অনুপযোগী। যেমনটি মঙ্গলগ্রহে। সেখানে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ শূন্য বলে তাপমাত্রা হিমাংকের অনেক নিচে (প্রায় ঋণাত্মক ৬৩° সেলসিয়াস)। অন্যদিকে শুক্রগ্রহে কার্বনডাই-অক্সাইড বেশি বলে এর তাপমাত্রা অনেক (প্রায় ৪৬৮° সেলসিয়াস)।

এখন যদি কোনো কারণে আমাদের বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইড এবং/বা অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে পৃথিবী থেকে নির্গত তাপ মহাকাশে বেরিয়ে যেতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অধিক বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ গ্লোবেল ওয়ার্মিং (global warming) হবে। বাস্তবে তাই হচ্ছে। শিল্প-কারখানা থেকে অনবরত কার্বনডাই-অক্সাইড নির্গত হচ্ছে, গাড়ি থেকে কার্বন মনোঅক্সাইড বের হচ্ছে, রিফ্রিজারেটর স্প্রে ইত্যাদি হতে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বায়ুমণ্ডলে আসছে, কৃষিক্ষেত থেকে মিথেন গ্যাস (Methane) আকাশে ছড়াচ্ছে। এ সবগুলোই গ্রীনহাউস গ্যাস। এ ছাড়া গাছপালা কমে যাওয়াতে সে পরিমাণ কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস নিতে পারছে না। ফলে ভবিষ্যতে পৃথিবী আরো উষ্ণতর হবার আশংকা রয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সমূহ সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, যা নিয়ে এখানে আলোচনার তেমন সুযোগ নেই। একটি প্রধান প্রসঙ্গ বলতে গেলে

Dhaka

প্রথম প্রভাব হচ্ছে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পাহাড়ে বরফ গলবে এবং সমুদ্রের পানি স্ফীত হবে (thermal expansion)। এ উভয় কারণে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিম্ন উপকূল এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।

গ্রীনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড়ের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এখানে কিছু আলোকপাত করা হলো।

আমরা দেখেছি যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে গরম-সমুদ্র পানি। তাপমাত্রা–নির্ভরতা আমাদের ধারণা দেয় যে গ্রীনহাউসের প্রভাবে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু এ পর্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যায়নি। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গত একশ বছরের অধিক ঘূর্ণিঝড়ের উপাত্ত হতে সমুদ্রতাপ বৃদ্ধির সাথে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কোনো প্রবণতা (trend) পরিলক্ষিত হয়নি। এর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য তাপমাত্রা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও যথেষ্ট নয়, যে সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি। তবে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সাথে পানির তাপমাত্রার সম্পর্কের অন্য রকম একটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে।

১৮৭৭–১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে প্রায় ৩৬৫টি ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত না হেনেই সমুদ্রে মারা যায়। এমনও হতে পারতো যে সমুদ্রের তাপমাত্রা অধিক থাকলে এ ৩৬৫টি ঘূর্ণিঝড়ের কিছু না কিছু অকাল মৃত্যুর মুখে কবলিত না হয়ে উপকূলে আঘাত হেনে ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিত। পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায়, তবে এ আশংকা থেকে যাবে ভবিষ্যতের জন্য।

বঙ্গোপসাগরে মৃত ঘূর্ণিঝড়ের বেশিরভাগই মধ্য বা দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে জন্মায়। এদের মৃত্যুর একটি কারণ হতে পারে উত্তরে অধিকতর শীতল এলাকার দিকে অগ্রসর হয়ে সমুদ্রে পর্যাপ্ত তাপমাত্রা না পাওয়া। গ্রীনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তখন হয়ত এ জাতীয় মৃত ঘূর্ণিঝড়ের সবকটি মারা যাবে না। তাদের কিছু কিছু উপকূলে আঘাত হানতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ সমুদ্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মোট ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলেও উপকূলে আঘাতকারী ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

তাপমাত্রা শুধু ঘূর্ণিঝড়ের জন্মই দেয় না, ঘূর্ণিঝড়ের শক্তিও যোগায়। সেদিক থেকে গ্রীনহাউস প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক বা না পাক, ঘূর্ণিঝড়ের প্রবলতা বাড়বে ; একথা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পাবে এবং জলীয়বাষ্প ঘনীভবনের মাধ্যমে সুপ্ত তাপের সৃষ্টি করে বাতাসের বেগের শক্তি বাড়াবে। আর বাতাসের তীব্রতা বাড়লে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাও বৃদ্ধি পাবে।

এল নিনিও, এনসো এবং কিউ বি ও

প্রায় প্রতিটি ঘূর্ণিঝড় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের বার্ষিক গড় সংখ্যা থেকে প্রতিটি বছরের মোট ঘূর্ণিঝড় সংখ্যার বেশ তারতম্য দেখা যায়। এ কম-বেশি হওয়াকে অনেক আবহাওয়াবিদ সমগ্র পৃথিবী বিশেষ করে বৃহৎ ক্রান্তীয় বায়ুপ্রবাহের (Large scale tropical air circulation) ধীর পরিবর্তনের (slowly varying) সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ পরিবর্তনের

উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে কেউ কেউ আবার ঘূর্ণিঝড়ের ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাস দেয়ারও চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলে কোনো ঘূর্ণিঝড় ঋতুতে (cyclone season) কতটি ঘূর্ণিঝড় হতে পারে, ঘূর্ণিঝড়–দিন (Cyclone days—কোনো অঞ্চলে কোন ঋতুতে সৃষ্ট সব কটি ঘূর্ণিঝড়ের জীবনকালের যোগফল) কত হবে, ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে তারা এ ধীর পরিবর্তনকে ব্যবহার করেছেন। আবহাওয়া বা বায়ুমণ্ডলের ধীর পরিবর্তনশীল কয়েকটি অবস্থা হচ্ছে এল নিনিও (El Nino), দখিনা দোলন (Southern oscillation), এনসো (ENSO) এবং কিউ বি ও (QBO-Quasi Biennial Oscillation)। এল নিনিও, দখিনা দোলন, এনসো এবং এদের সাথে ঘূর্ণিঝড়ের সম্পর্ক নিয়ে একাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কিউ বি–ও হচ্ছে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বায়ুপ্রবাহের দিকের পরিবর্তনের একটি বিশেষ অবস্থা। উক্ত লেভেলে বায়ু একবার পশ্চিম থেকে পুবে, পরে পুব থেকে পশ্চিমে, আবার পশ্চিম থেকে পুবে, এভাবে প্রবাহিত হয়। দিকের এ পরিবর্তন চলতে থাকে। একবার পুরো পরিবর্তনে (অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পুবে এবং পুব থেকে পশ্চিমে ফিরে আসতে) সময় লাগে প্রায় ২৬ মাস। বাতাসের এ পরিবর্তন বা দোলনকে বলে QBO, Quasi Biennial Oscillation বা প্রায়–দ্বিবার্ষিক বা দ্বিবার্ষিক দোলন। আটলান্টিক মহাসাগরে এ দোলনের সাথে ঘূর্ণিঝড় কর্মকাণ্ডের (cyclone activity) সম্পর্ক রয়েছে বলে দেখা গেছে। সেখানে OBO এর পশ্চিম থেকে পুব দিকে বায়ুপ্রবাহের সময়ে ঘূর্ণিঝড় কর্মকাণ্ড পুব হতে পশ্চিমদিকে প্রবাহের সময়ের কর্মকাণ্ডের প্রায় ১.৪ গুণ বেশি। অন্যান্য অঞ্চলের জন্য এ রকম তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঘূর্ণিঝড়ের সাথে এল নিনিও, দখিনা দোলন, এনসো, কিউ বি ও ইত্যাদির সম্পর্ক মোটামুটিভাবে একটি নতুন বিষয়। স্বভাবতই এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত ও অনিশ্চিত। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ধারণা ও জ্ঞান আরো প্রসারিত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঘূর্ণিঝড়ের গতি ও গতিপথ

ঘূর্ণিঝড়ের দুটি গতি আছে : একটি ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের গতি (wind speed) এবং অন্যটি পুরো ঘূর্ণিঝড়ের চলার গতি (translational speed of the cyclone)। বাতাসের গতি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঘূর্ণিঝড়ের চলার গতি এবং চলার পথ বা গতিপথ (track) নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে গতিপথই প্রাধান্য পাবে। ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রে সৃষ্টি হয়ে যদি সেখানে স্থির থাকে, তাহলে এর প্রলয়ংকারী ক্ষয় ক্ষতি তেমন হবে না। সমুদ্রগামী জাহাজ এতে হয়ত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় এক জায়গায় স্থির থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানে আঘাত করে মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, ইত্যাদির ক্ষতি সাধন করে।

গড় গতি ও গড় গতিপথ

ঘূর্ণিঝড় থেকে ঘূর্ণিঝড়ের চলার গতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সকল ঘূর্ণিঝড় একই গতিতে চলে না, আবার একই ঘূর্ণিঝড়ে সারাক্ষণ একই গতি থাকে না। তাই অনেক সময় গড় গতি ব্যবহার করা হয়। বঙ্গোপসাগরে একটি পূর্ণ ঘূর্ণিঝড়ের গড় গতি প্রায় ৮–১০ নট। বাংলাদেশের দিকে ধাবিত ঘূর্ণিঝড়ের গতি ২০–৩০ নট হতে পারে। মৌসুমী নিম্নচাপ সবচেয়ে মন্থর গতিতে চলে (প্রায় ৫ নট)।

ঘূর্ণিঝড়ের গতি সবচেয়ে বেশি উত্তর–পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে এবং উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমাংশে। সবচেয়ে কম উত্তর–ভারত মহাসাগরে (আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে)। এ ব্যবধানের প্রধান কারণ হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের সামনে স্থল/জলভাগের উপস্থিতি। বঙ্গোপসাগরে তিন দিকে স্থল থাকায় গতি হয়ত কম। পক্ষান্তরে যেখানে এ রকম তেমন স্থলভাগের বাধা নেই বা সমুদ্রে চলার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে, সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের গতি বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। যেমন উল্লিখিত আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা।

চলার গতির মতো এক ঘূর্ণিঝড় থেকে অন্য ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথও ভিন্নতর হয়ে থাকে। দুটি ঘূর্ণিঝড় কখনো একপথ অনুসরণ করে না। তবে কোনো এলাকায় অনেক বছরের গতিপথের গড় নিলে একটি সাধারণ ছবি ফুটে উঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের একটি গড় অবস্থা ৬.১ চিত্রে দেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বলা যায় ঘূর্ণিঝড় উত্তর

গোলার্ধে পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় আবার উত্তর ও উত্তর–পূর্ব দিকে (উত্তর গোলার্ধে) বেঁকে (recurve) যায়। বাস্তবে সাধারণ অবস্থা থেকে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্যতিক্রমধর্মী গতিপথের সংখ্যা দক্ষিণ–পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ৩৫%, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে ১৬% এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ৩১%।

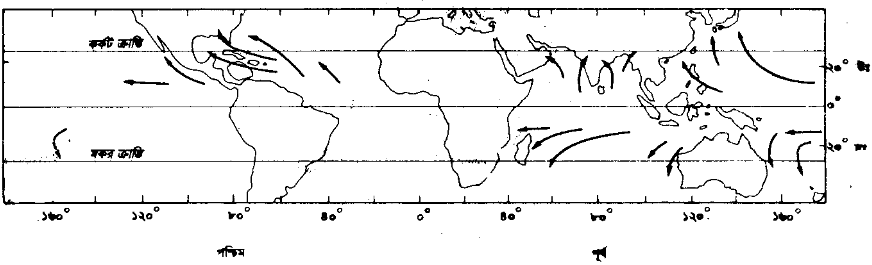

চিত্র ৬.১ : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের গড় অবস্থা। তীর চিহ্নিত রেখা দ্বারা গতিপথ নির্দেশ করা হয়েছে।

অক্ষাংশ এবং ঋতু নির্ভরশীলতা

ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এবং গতি অক্ষাংশ ও ঋতুর উপর বেশ নির্ভরশীল। উত্তর–পশ্চিম প্রশান্ত এবং দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে প্রায় ২৩–২৪° অক্ষাংশের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় স্বাভাবিক গতিপথ থেকে বেঁকে যায়। উত্তর আটলান্টিকে প্রায় ২৮–২৯° অক্ষাংশে গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বঙ্গোপসাগরে বড় ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত ১৮° অক্ষাংশের পরে উত্তর, উত্তর–পূর্ব বা পূর্ব/উত্তর–পূর্ব দিকে বেঁকে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের গতি আবার বেঁকে যাবার আগে এবং পরে ভিন্নতর হয়ে থাকে। কখনো বেশি আবার কখনো কম।

ঘূর্ণিঝড় জন্মের পর বিষুবরেখার দিকে যায় না। তার কারণ, নিম্ন অক্ষাংশের দিকে কোরিওলিস বল ক্রমশ কমে যায়। তবে কখনো গতিপথ ঘুরে 'লুপের' (loop)সৃষ্টি করে। ১৯৭২–১৯৭৯ সালের মধ্যে উত্তর ভারত মহাসাগরে ৭টি ঘূর্ণিঝড় 'লুপ' করেছিল। 'লুপ' করার সময় গতি বিষুবরেখার দিকেও থাকে, তবে 'লুপ' আকারে তেমন বড় হয় না। স্থির বা লুপিং ঘূর্ণিঝড় সমুদ্র থেকে বেশি শক্তি আহরণ করার সময় পায়।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ মাস বা ঋতুভেদে বেশ পরিবর্তনশীল। যেমন জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় (যদিও এ সময় খুবই কম ঘূর্ণিঝড় জন্মায়) পশ্চিম বা উত্তর–পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এপ্রিল মাসে সাধারণত উত্তর বা উত্তর–পশ্চিম দিকে আগায় এবং পরে বেঁকে গিয়ে আরাকান উপকূলে আঘাত হানে। কখনো আবার শুরুতেই উত্তর বা উত্তর–পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। মে মাসের গতিপথ প্রায় এপ্রিলের মতোই, তবে তখন ভারতের সমস্ত পূর্ব উপকূল, বাংলাদেশ উপকূল এবং আরাকান উপকূল–এ সমগ্র এলাকা ঘূর্ণিঝড় দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। জুন মাসে প্রধান গতিপথ হচ্ছে উত্তর–পশ্চিম দিকে। এ

সময় ভারতের উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ ও পশ্চিম বাংলা উপকূল এবং বাংলাদেশের পশ্চিম উপকূল (সুন্দরবন এলাকা) আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। জুলাই ও আগস্ট মাসে ঘূর্ণিঝড় পশ্চিম বা উত্তর–পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলা উপকূলে আঘাত হানে। এ সময়কার ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ প্রায় ২০–২৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় প্রধানত পশ্চিম বা উত্তর–পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং পরে কখনো কখনো উত্তর–পূর্ব দিকে বেঁকে যায়। অক্টোবর–নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ অনেকটা মে মাসের গতিপথের মতোই। ডিসেম্বর মাসে বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ–পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে জন্মায়। এরা প্রাথমিকভাবে উত্তর–পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতের তামিলনাড়ু উপকূল বা শ্রীলংকার উত্তর–পূর্ব উপকূলে আঘাত হানে। এদের কোনো কোনোটি আবার আরব সাগরে গিয়ে পতিত হয়। দক্ষিণ–পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এ মাসে যে সকল ঘূর্ণিঝড় জন্মায়, সেগুলো উত্তর ও উত্তর–পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পরে উত্তর–পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় দুর্বল হয়ে যাবার প্রবণতা দেখা যায় এবং অনেক সময় সমুদ্রেই প্রাণ হারায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের মাসভিত্তিক জন্মস্থান ও উপরে বর্ণিত গতিপথ হতে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায় : মৌসুমীকাল এবং এর আগের (মৌসুম–পূর্ব) ও পরের (মৌসুম–উত্তর) কাল। মৌসুমীকালে ঘূর্ণিঝড় উত্তর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট হয়ে উত্তর–পশ্চিম/পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং অধিকাংশ সময় ভারতের উপকূলে আঘাত হানে। এ সময়কার ঘূর্ণিঝড় থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমীকালের আগের ও পরের ঘূর্ণিঝড় নিম্ন অক্ষাংশে সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গোপসাগরের যে কোনো উপকূল এলাকা এদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। এগুলো খুব প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন হয়। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় গত প্রায় ১১৯ বছরে (১৮৭৭–১৯৯৫) আশেপাশের কোন দেশে কতবার আঘাত হেনেছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ভরশীলতা

ঘূর্ণিঝড়ের গতি বা গতিপথ এর অভ্যন্তরীণ এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে থাকতে পারে ঝড়ের গঠনের পরিবর্তন, কোরিওলিস বলের বিভিন্ন রকম প্রভাব ইত্যাদি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রার পরিবর্তন, ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তন, এল নিনিও, দখিনা দোলন, দ্বি–বার্ষিক দোলন ইত্যাদি। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মিথস্ক্রিয়াও অনেকাংশে দায়ী থাকতে পারে। আর এসব কারণেই ঘূর্ণিঝড়ের বিশেষ করে এর গতিপথের পূর্বাভাস দেয়া খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিভাবে গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে বা করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু একটি প্রধান বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হবে। তা হচ্ছে নিয়ন্ত্রক প্রবাহ।

নিয়ন্ত্রক প্রবাহ

অনেক সময় দেখা যায় ঘূর্ণিঝড়ের গতি ও গতিপথ পারিপার্শ্বিক বৃহত্তর সাধারণ বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হয়। এ প্রবাহকে বলে নিয়ন্ত্রক প্রবাহ (steering current)। ট্রপোস্ফিয়ারের কোনো নির্দিষ্ট লেভেলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রক প্রবাহ হিসেবে ধরা হয়। মধ্য ট্রপোস্ফিয়ারকে কখনো কখনো এ নির্দিষ্ট লেভেল হিসেবে গণনা করা হয়। তবে নিয়ন্ত্রক লেভেলের উচ্চতা সম্পর্কে আবহাওয়াবিদরা এখনো একমত হতে পারেননি এবং হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ এ লেভেল স্থানকালভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। কেউ কেউ আবার পুরো ট্রপোস্ফিয়ারের গড় প্রবাহের লেভেলকে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ধরার পক্ষপাতি। অনেকে আবার ৮৫০, ৫০০ এবং ২৫০ মিলিবার লেভেলের গড় প্রবাহকে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ধরার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রক প্রবাহের জন্য যে লেভেলকেই ধরা হোক না কেন, সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এ সকল উচ্চতর লেভেল থেকে নিয়মিত উপাত্ত সংগ্রহ করা।

অনেক সময় ঘূর্ণিঝড় আবার নিয়ন্ত্রক প্রবাহকে প্রভাবিত করে। ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি এবং উপরের দিকে এর বিস্তৃতির উপর এ প্রভাব অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত ঘূর্ণিঝড়ের চাপ–ঘাটতি যত বেশি (অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় যতো বেশি শক্তিশালী) হবে নিয়ন্ত্রক লেভেল নির্ধারণের জন্য ট্রপোস্ফিয়ারের ততো গভীরতর লেভেলের গড় নিতে হয়। পৃথিবীর কয়েকটি এলাকার ঘূর্ণিঝড়–কেন্দ্রের চাপ ও এর জন্য কোন কোন লেভেলের গড় প্রবাহ সবচেয়ে ভাল নিয়ন্ত্রক প্রবাহ হিসেবে কাজ করে তা ৬.১ সারণিতে দেখা যেতে পারে। সারণি হতে দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এলাকায় তিনটি লেভেল রয়েছে। কেন্দ্রে বায়ুর চাপ ৯৭৫ মিলিবারের উপরে হলে বায়ুমণ্ডলের ৮৫০ মিলিবার হতে ৫০০ মিলিবার পর্যন্ত লেভেলের গড় থেকে সবচেয়ে ভাল নিয়ন্ত্রক লেভেল ও প্রবাহ পাওয়া যায়। কেন্দ্র চাপ ৯৫৫–৯৭৫ মিলিবার হলে নিয়ন্ত্রক লেভেল হয় ৮৫০–৪০০ মিলিবারের মধ্যকার গড়। এ রকম অন্যান্য স্থানের জন্য। ঘূর্ণিঝড় যতো প্রবল, লেভেলের রেঞ্জও সে অনুপাতে বেশি।

সারণি ৬.১ : বিভিন্ন এলাকার ঘূর্ণিঝড়ের নিয়ন্ত্রক প্রবাহ লেভেল।

এলাকা	ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি	নিয়ন্ত্রক লেভেলের সীমা (মিলিবার)
অস্ট্রেলিয়া	কেন্দ্র চাপ ৯৭৫ মিলিবারের ঊর্ধ্বে	৮৫০–৫০০
অস্ট্রেলিয়া	কেন্দ্র চাপ ৯৫৫–৯৭৫ মিলিবার	৮৫০–৪০০
অস্ট্রেলিয়া	কেন্দ্র চাপ ৯৫৫ মিলিবারের নিচে	৮৫০–৩৫০
প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশ	হারিকেন গতিসম্পন্ন বাতাস বা তদূর্ধ্বে	৮৫০–৪০০
প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশ	হারিকেন গতিসম্পন্ন বাতাসের নিচে	৮৫০–৭৫০
আটলান্টিক মহাসাগর	হারিকেন গতিসম্পন্ন বাতাস বা তদূর্ধ্বে	৮৫০–২০০
আটলান্টিক মহাসাগর	হারিকেন গতিসম্পন্ন বাতাসের নিচে	৮৫০–৪০০

কাজেই দেখা যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি বৃদ্ধির সাথে পারিপার্শ্বিক নিয়ন্ত্রক প্রবাহ নির্ধারণের জন্য বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন লেভেলের গড় প্রবাহ নেয়া উচিত। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নিয়ন্ত্রক প্রবাহ একা ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ নির্ধারণে যথেষ্ট নয়। আটলান্টিক মহাসাগরে ২৪–৭২ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ নির্ধারণে নিয়ন্ত্রক প্রবাহ প্রায় ৩০–৮০% সময়ে সফল হয়েছে। তবে আগেই বলা হয়েছে নিয়ন্ত্রক প্রবাহ নির্ধারণের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন লেভেলের উপাত্ত সংগ্রহ।

ঘূর্ণিঝড় উত্তর/পশ্চিম দিকে কেন যায়

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ নানা কারণে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। তবে সব ঘূর্ণিঝড়ই বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরুর দিকে অগ্রসর হয় এবং অনেক সময় পশ্চিম দিকে তাদের একটি গতি থাকে। এ রকম গতিকে আবহাওয়াবিদরা গাণিতিকভাবে অক্ষাংশভেদে কোরিওলিস প্যারামিটারের পরিবর্তনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। নিচে অগাণিতিকভাবে অতি সহজভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হলো।

আগেই আমরা দেখেছি (তৃতীয় অধ্যায়ে) কোরিওলিস প্যারামিটারের মান বিষুবরেখায় শূন্য থেকে মেরুর দিকে বাড়তে বাড়তে মেরুতে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছে। ঘূর্ণিঝড়ের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে কম কোরিওলিস ঘূর্ণন এলাকা থেকে বেশি কোরিওলিস ঘূর্ণন এলাকার দিকে যাওয়া। তাই ঘূর্ণিঝড়ের একটি গতি মেরুর দিকে থাকে। উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাশের (ডান) তুলনায় পশ্চিম পাশে (বাম) কোরিওলিস ঘূর্ণন বেশি (দর্শক উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে)। এর কারণ হলো নিম্নরূপ : পূর্ব পাশে বায়ুর উত্তরমুখী প্রবাহ নিম্ন অক্ষাংশ থেকে কম কোরিওলিস ঘূর্ণন (যেহেতু নিম্ন অক্ষাংশে কোরিওলিস প্যারামিটারের মান কম উচ্চ অক্ষাংশের তুলনায়) উত্তর দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাশে বায়ুর দক্ষিণমুখী প্রবাহ উচ্চ অক্ষাংশ থেকে অধিকতর কোরিওলিস ঘূর্ণন দক্ষিণ দিকে ঠেলে দেয়। ফলে পূর্ব পাশের তুলনায় পশ্চিম পাশে কোরিওলিস ঘূর্ণন বেশি। কাজেই কম ঘূর্ণনবিশিষ্ট এলাকা থেকে বেশি ঘূর্ণনবিশিষ্ট এলাকার দিকে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতার কারণে ঘূর্ণিঝড় পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। একইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড় পূর্ব দিকে কেন চলে তা ব্যাখ্যা করা যায়। তবে গতিপথে যা ব্যতিক্রম হয়, তা অন্যান্য কারণে হতে পারে। তন্মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্যতম। ব্যতিক্রমের কিছু কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

ঘূর্ণিঝড় পর্যবেক্ষণ

ঘূর্ণিঝড়ের ছোবল থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে ঘূর্ণিঝড়কে সার্বক্ষণিকভাবে বা যতো ঘন ঘন সম্ভব পর্যবেক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। ঘূর্ণিঝড় কখন, কোথায় জন্ম নিতে পারে, কখন জন্ম নিল, কি পরিবেশে জন্ম নিল, তার গঠন, আকার, বিকাশ, গতি, গতিপথ ইত্যাদি সম্পর্কে যতো বেশি তথ্য থাকবে ততোই মঙ্গল। এসব তথ্যের জন্য দরকার ঘূর্ণিঝড় এবং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত উপাত্ত সংগ্রহের। উপাত্ত প্রধানত দুটি কাজের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়। প্রথমত ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত আহরিত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের জন্য পূর্বাভাস দেয়া। উপাত্ত থেকে নিকট অতীত অবস্থা জেনে এর উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেয়া যায়। পূর্বাভাস কতটুকু সঠিক হয়েছে তা নিরূপণেও উপাত্ত সাহায্য করে। আর এ নিরূপণ পূর্বাভাস পদ্ধতিকে উন্নতি করতে অধিক সহায়ক হয়। উপাত্ত আবার ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত বিভিন্ন মডেল পরীক্ষা করতে সাহায্য করে।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন লেভেলের উপাত্ত ঘন ঘন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। যতো ঘন ঘন এবং যতো বেশি লেভেল ও স্থান থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা যাবে, ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে ততো বেশি জানা যাবে এবং পূর্বাভাস অধিকতর উন্নতমানের হবে। যেমন ঘূর্ণিঝড় ও তার চারপাশের ১০টি জায়গায় ভূপৃষ্ঠ হতে উপরের দিকে ৫টি লেভেল থেকে ১০ ঘন্টা পর উপাত্ত সংগ্রহের চেয়ে ২০টি জায়গার ৮টি লেভেল থেকে ৫ ঘন্টা পর পর উপাত্ত সংগ্রহ অধিক উপকারী। কিন্তু বাস্তবে অনেক অসুবিধার জন্য এভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। যেমন ঘূর্ণিঝড় অধিকাংশ সময়ই সমুদ্রে কাটায়। সে ক্ষেত্রে সমুদ্র এলাকায় এতো ঘন ঘন এবং ঘনভাবে উপাত্ত সংগ্রহ প্রায় অসম্ভবই বলা যেতে পারে। অধিকন্তু এতো অধিক পরিমাণে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণও একটি দুরূহ ব্যাপার, যদিও এসব কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের উপাত্ত সংগ্রহ বা এর পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয় ; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হচ্ছে : (ক) প্রচলিত পন্থা (Conventional methods) (খ) উড়োজাহাজ (Aircrafts) (গ) রাডার (Radars) এবং (ঘ) উপগ্রহ (Satellites)।

প্রথম তিনটি সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোকপাত শেষে চতুর্থটি নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, কারণ শেষেরটি অর্থাৎ উপগ্রহ ঘূর্ণিঝড় পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অতি উত্তম পন্থা হিসেবে পরিণত হয়েছে এবং দিন দিন এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে।

প্রচলিত পন্থা

প্রচলিত পন্থা হলো প্রচলিত নিয়মে প্রচলিত আবহাওয়া যন্ত্রপাতি দ্বারা উপাত্ত সংগ্রহ করা। সাধারণত বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট আবহাওয়া অফিস এ দায়িত্ব পালন করে থাকে, যদিও অন্যান্য সংস্থা বিশেষ বিশেষ কারণে নিজস্বভাবেও উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রতিটি দেশে আবহাওয়ার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ছোট বড় আবহাওয়া স্টেশন নেটওয়ার্ক থাকে, যেখানে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রচলিত উপাত্তকে ভূপৃষ্ঠ/ নিকট ভূপৃষ্ঠ এবং ভূপৃষ্ঠের উপরে উচ্চতর লেভেল–এ দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ভূপৃষ্ঠ/নিকট ভূপৃষ্ঠ

ভূপৃষ্ঠ এবং এর নিকটতম বায়ুমণ্ডলের উপাত্ত সংগ্রহ অতি প্রয়োজনীয়। এর প্রধান কারণ এ অংশের আবহাওয়ার সাথে মানুষের জীবন সরাসরি সংপৃক্ত। ঘূর্ণিঝড়ের সময় এ অংশের বাতাস আমাদের ক্ষতির জন্য বেশি দায়ী। এ বাতাস ঘর–বাড়ি উড়িয়ে নেয়, শস্যের ক্ষতি করে, মৃত্যুর কারণ হয় এবং সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে।

আবহাওয়া স্টেশন স্থলভাগের উপাত্ত নিয়মিত গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেহেতু ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাতের আগ পর্যন্ত তার জীবনের অধিকাংশ সময় সমুদ্রে কাটায়, সেহেতু সমুদ্র এলাকা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ সবচেয়ে বেশি দরকার হলেও সেটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাই সমুদ্র এলাকা থেকে পর্যাপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ করতে না পারাতে ঘূর্ণিঝড় জানা ও এর পূর্বাভাস দেয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

সমুদ্র এলাকার উপাত্ত সংগ্রহে অতীতে এমন কি বর্তমানেও একটি উত্তম পন্থা হচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজের ব্যবহার। কিন্তু দিন দিন ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসের উন্নতির সাথে (বিশেষ করে ভূ–উপগ্রহের মাধ্যমে) জাহাজ ঘূর্ণিঝড় এলাকা পরিহার করে চলে। আগে উপগ্রহ না থাকাতে জাহাজ প্রায়ই ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়তো এবং উপাত্ত সংগ্রহ হয়ে যেতো ; এটি যদিও কাম্য নয়। কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহে আবহাওয়া জাহাজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব জাহাজ সার্বক্ষণিকভাবে সমুদ্রে অবস্থান করে উপাত্ত নিতে পারে। কিন্তু এ প্রকার জাহাজের সংখ্যাও আজকাল কমে যাচ্ছে। তার মূল কারণ ব্যয়বহুলতা এবং ভূ–উপগ্রহের সুবিধা। সমুদ্রে বোয়া (Buoy) দ্বারাও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তবে এটি প্রচলিত পথ নয়। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

উর্ধ্বাকাশের উপাত্ত

সমুদ্র এলাকা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা যেমন কঠিন (কিন্তু প্রয়োজনীয়), ঠিক তেমনি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতা থেকে উপাত্ত সংগ্রহও একটি দুরূহ ব্যাপার। স্থলভাগের বিভিন্ন উচ্চতার চেয়ে জলভাগের বিভিন্ন উচ্চতার উপাত্ত সংগ্রহ আরো কঠিন। ফলে ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক পূর্বাভাস দেয়া যে কত অসুবিধাজনক, তা সহজেই আঁচ করা যায়। তবু

আবহাওয়াবিদরা বসে নেই। তারা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উপাত্ত সংগ্রহ আরো সহজ এবং উন্নতর করার জন্যে।

উপরের লেভেলের উপাত্ত সংগ্রহের একটি প্রসিদ্ধ যন্ত্র হচ্ছে রেডিওসন্ড (Radiosonde) বা রেবিনসন্ড (Rawinsonde) যা বেলুনের সাহায্যে বা অন্য কোনোভাবে আকাশে উড়ানো হয়। সেখান থেকে এটি উপাত্ত সংগ্রহ করে টেলিমেট্রি (Telemetry) পদ্ধতিতে নিচে ভূপৃষ্ঠে প্রেরণ করে। তাছাড়া পাইলট বেলুন (Pilot balloon) নামক একপ্রকার বেলুনের উড্ডয়ন পর্যবেক্ষণ করে ঊর্ধ্বাকাশের বাতাস মাপা যায়।

এয়ারলাইনস (airlines) তাদের নিয়মিত রুটে চলাচলের সময় উপরের লেভেলের আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ করে। কিন্তু রুট নির্দিষ্ট থাকাতে এদের ব্যবহার সীমিত। হয়তো কোনো ঘূর্ণিঝড়ের কাছাকাছি কোনো রুটই নেই, বা রুট থাকলে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ফ্লাইট বাতিল করা হয় বা রুট পরিবর্তন করা হয়। তাই ঊর্ধ্বাকাশের আবহাওয়া উপাত্তের জন্য এয়ারলাইনস একটি ভাল মাধ্যম হলেও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য তেমন উপযোগী নয়। ভূ-উপগ্রহ দ্বারাও নিয়মিত ঊর্ধ্বাকাশের উপাত্ত পাওয়া যায়।

আবহাওয়া চার্ট

আবহাওয়া বিজ্ঞানে আবহাওয়া তালিকা (Weather chart বা Synoptic chart) একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। এ তালিকায় আবহাওয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ম্যাপ/চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ তালিকা থেকে তাপ, চাপ, বাতাসের গতি ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিভিন্ন এলাকার জন্য এগুলো নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তৈরি করা হয়ে থাকে।

উড়োজাহাজের ব্যবহার

কোনো কোনো উন্নত দেশে উড়োজাহাজের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আসলে ঘূর্ণিঝড়ের গঠন, বিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে বেশিরভাগ জ্ঞানই উড়োজাহাজের সাহায্যে প্রাপ্ত। এ রকম উপাত্ত খুবই বিশ্বাসযোগ্য। উড়োজাহাজ ঘূর্ণিঝড়ের ভেতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন লেভেল থেকে বিভিন্ন রকমের উপাত্ত সংগ্রহ করে।

ঘূর্ণিঝড়ের ভিতরে যাওয়া বৈমানিকের জন্য অনেক সময় বিপদজনক হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে রিমোট কনট্রোলের সাহায্যে বৈমানিকবিহীন উড়োজাহাজ ব্যবহার করার চিন্তাভাবনা চলছে।

রাডার ব্যবহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ঘূর্ণিঝড় পর্যবেক্ষণের জন্য আবহাওয়া রাডার (Radar) ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং এর পরে রাডার টেকনোলজিতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। রাডারের সাহায্যে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান, কেন্দ্রের অবস্থান, বৃষ্টির পরিমাণ, বাতাসের বেগ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অনবরত পাওয়া যায়।

বেশিরভাগ রাডার উপকূলীয় অঞ্চলে স্থলভাগে স্থাপন করা হয়। (তবে রাডার সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ, এমনকি ভূ-উপগ্রহেও থাকতে পারে)। ঘূর্ণিঝড়ের পর্যবেক্ষণ রাডারের রেঞ্জের উপর নির্ভর করে। ঘূর্ণিঝড় যখন স্থলভাগে স্থাপিত রাডারের রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়ে তখন থেকে উপাত্ত সংগ্রহ শুরু হয়। রেঞ্জের বাইরে থাকলে তখন রাডার তেমন কোনো কাজে আসে না। এ রকম ক্ষেত্রে আবহাওয়া উপগ্রহই হয় প্রধান সম্বল।

আবহাওয়া উপগ্রহ

উপগ্রহ গ্রহের চারদিকে ঘূরে। আমাদের পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ রয়েছে, যাকে আমরা চাঁদ বলি। চাঁদ পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহ (Natural satellite)।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর চতুর্দিকে বর্তমানে মানুষ কর্তৃক নির্মিত অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial satellite) পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক আকাশে সফলতার সাথে নিক্ষেপ করা হয়। এর নাম ছিল স্পুটনিক-১ (Sputnik-1)। কৃত্রিম উপগ্রহকে আবার ভূ-উপগ্রহও (Earth satellite বা Artificial earth satellite) বলা হয়। এখন থেকে উপগ্রহ বলতে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহকেই (Artificial earth satellite) বুঝানো হবে।

স্পুটনিকের পর থেকে অনেক উপগ্রহ আকাশে ছোড়া হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। দিন দিন এদের সংখ্যা এতো বাড়ছে যে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীপৃষ্ঠে যানজটের মতো আকাশে উপগ্রহ জটের সৃষ্টি হতে পারে। ইতোমধ্যে এর আলামত শুরু হয়ে গেছে।

উপগ্রহ পৃথিবীর চতুর্দিকে নিয়মিত প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এদের উচ্চতা বা পৃথিবীর কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণের কক্ষপথের ব্যাসার্ধের উপর প্রদক্ষিণ কাল নির্ভর করে। উচ্চতা যতো বেশি প্রদক্ষিণকালও ততো বেশি।

উপগ্রহের একটি নির্দিষ্ট জীবনও আছে। অনেক সময় নির্দিষ্ট জীবনের আগেই এগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আবার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়েও বেশি এদের জীবন হয়ে থাকে।

বিভিন্ন উপগ্রহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ছাড়া হয়। ব্যবহারের উপর নির্ভর করে এদের নামকরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন : (১) আবহাওয়া উপগ্রহ (Meteorological satellite) (২) ভূসম্পদ জরিপ উপগ্রহ (Earth resources satellite) (৩) যোগাযোগ উপগ্রহ (Communication satellie) (৪) প্রতিরক্ষা উপগ্রহ (Defence satellite) ইত্যাদি।

আবহাওয়া উপগ্রহ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। জরিপ উপগ্রহ পৃথিবীর সম্পদ জরিপ, মানচিত্র প্রণয়ন, ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। যোগাযোগ উপগ্রহ দ্বারা পৃথিবীর একস্থান থেকে অন্যস্থানে যোগাযোগ (টেলিফোন, টেলিভিশন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি) করা হয়। প্রতিরক্ষা উপগ্রহ প্রতিরক্ষাবিষয়ক ক্ষেত্রে প্রধানত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বেসামরিক (Civilian) বিষয়েও এগুলোকে কাজে লাগানো হয়।

এ ছাড়া রয়েছে অনুসন্ধান ও উদ্ধার (Search & rescue) উপগ্রহ যাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিশেষ করে সমুদ্র এলাকায় জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি বিপদে পড়লে তাদেরকে উদ্ধার করার কাজে লাগানো হয়। এখানে আবহাওয়া উপগ্রহের মধ্যেই আলোচনা বিশেষ করে সীমিত থাকবে। আবহাওয়া উপগ্রহ দু'প্রকার : (১) মেরুবৃত্তীয় (Polar orbiting) এবং (২) ভূস্থির (Geostationary)।

মেরুবৃত্তীয় উপগ্রহ

মেরুবৃত্তীয় উপগ্রহ পৃথিবীকে প্রায় উত্তর-দক্ষিণে প্রদক্ষিণ করে (চিত্র ৭.১)। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এদের উচ্চতা প্রায় ৮০০–৯০০ কিলোমিটার। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এদের প্রায় ৯০–১০০ মিনিট সময় লাগে। উপগ্রহ একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে। নিচে পৃথিবী আপন কক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরার ফলে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর নতুন নতুন এলাকা উপগ্রহের চোখের আওতায় আসে। উপগ্রহ প্রতিবার ঘুরার অর্ধেক সময় দিবাভাগে এবং অর্ধেক সময় রাত্রিভাগে অতিবাহিত করে। অনেক সময় প্রদক্ষিণ পথ এমনভাবে ঠিক করা হয়, যাতে করে উপগ্রহ একই জায়গার উপর দিয়ে প্রতিদিন একই সময়ে অতিক্রম করে। এ রকম উপগ্রহকে 'সান-সিনক্রোনাস' (Sun-synchronous) উপগ্রহ বলা হয়। চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তের মতো মেরুবৃত্তীয় উপগ্রহও 'উদয়' হয় এবং 'অস্ত' যায়।

স্পুটনিকের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল আবহাওয়া উপগ্রহ নিক্ষেপ করে। এটি ছিল মেরুবৃত্তীয় একটি আবহাওয়া উপগ্রহ। নাম ছিল 'টাইরোস–১' (TIROS-Television and Infrared Observation Satellite)। তখন থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞানে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়। আজকাল আবহাওয়া উপগ্রহের বদৌলতে কোনো ঘূর্ণিঝড় উপগ্রহের চক্ষু এড়াতে পারে না। আগে অনেক সময় ঘূর্ণিঝড় মানুষের অগোচরে থেকে যেতো, বিশেষ করে যেগুলো উপকূলে আঘাত না হেনে সমুদ্রেই মারা যেতো। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত টাইরোস সিরিজে পর পর ১০টি উপগ্রহ আকাশে ছোঁড়া হয়। এর পরে আসে দ্বিতীয় জেনারেশন উপগ্রহ সিরিজ 'ইসা' (ESSA-Environmental Science Services Administration)। ১৯৬৬–৬৯ সাল পর্যন্ত ছিল এদের সময়কাল। এই সিরিজে ইসা–১ হতে ইসা–৯ মোট নয়টি উপগ্রহ পর পর ছোঁড়া হয়। তৃতীয় জেনারেশন আবহাওয়া উপগ্রহ সিরিজ 'টাইরোস'–এম (TIROS-M) ১৯৭০সালে শুরু হয়। এই জেনারেশনের প্রথম উপগ্রহ 'আইটোস–১' (ITOS-Improved TIROS Operational Satellite) ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে নিক্ষেপ করার পর উপগ্রহের নাম বদলিয়ে বর্তমানে বহুল পরিচিত নাম 'নোয়া' (NOAA-National Oceanic and Atmospheric Administration) রাখা হয়। চতুর্থ জেনারেশন 'টাইরোস'–এন (TIROS-N) সিরিজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। এই জেনারেশনের উপগ্রহের নামও নোয়া। সেজন্য কখনো কখনো টাইরোস–এন/নোয়া সিরিজও বলা হয়। বর্তমানে নোয়া সিরিজের উপগ্রহ ছোঁড়া হচ্ছে। বলতে গেলে এ নোয়া উপগ্রহ পৃথিবীতে একমাত্র মেরুবৃত্তীয় আবহাওয়া উপগ্রহ যা থেকে গৃহীত উপাত্ত ও ছবি বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত

হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত সবকটি মেরুবৃত্তীয় আবহাওয়া উপগ্রহই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ছোঁড়া। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মেরুবৃত্তীয় আবহাওয়া উপগ্রহ হচ্ছে রাশিয়ার মেটিওর (Meteor) । তবে এর ব্যবহার নোয়ার তুলনায় অনেক সীমিত।

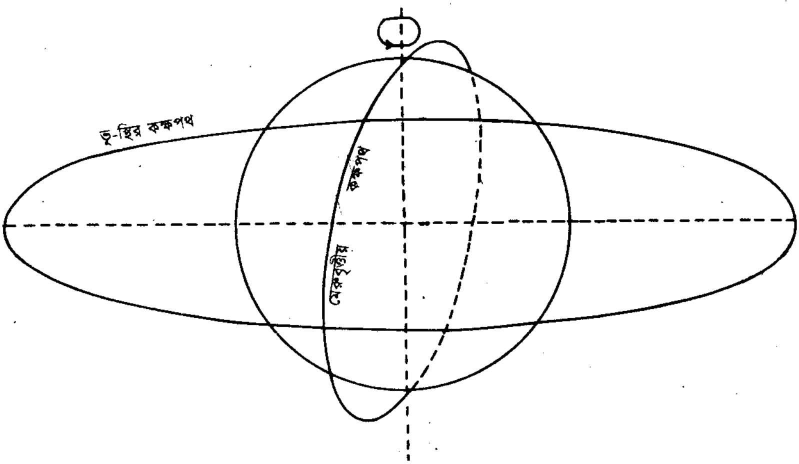

চিত্র ৭.১ : মেরুবৃত্তীয় ও ভূস্থির উপগ্রহের কক্ষপথ।

নোয়া উপগ্রহ প্রায় উত্তর–দক্ষিণে সান–সিনক্রোনাস কক্ষপথে প্রায় ১০২ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। প্রতিদিন এটি প্রায় ১৪.১ বার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে। উপগ্রহটি প্রতিটি জায়গার উপর দিয়ে প্রায় ১২ ঘন্টা পরপর রাতদিন দুইবার অতিক্রম করে। দুটি উপগ্রহ থাকলে পরিভ্রমণ সময় এমনভাবে ঠিক করা হয় যাতে করে প্রতি জায়গার উপর দিনে ৬ ঘন্টা পরপর উপগ্রহ উপস্থিত হয়।

ভূস্থির উপগ্রহ

আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর চতুর্দিকে উপগ্রহের প্রদক্ষিণকাল পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা বা পৃথিবীর কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে কক্ষপথের ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০০–৯০০ কিলোমিটার উপরে অবস্থিত উপগ্রহের প্রদক্ষিণ কাল প্রায় ৯০–১০০ মিনিট। ব্যাসার্ধ বা উচ্চতা বাড়লে প্রদক্ষিণকাল বাড়বে। পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৮৪,৪০০ কিলোমিটার ; তাতে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের সময় লাগে প্রায় ২৮ দিন। উপরিউক্ত দুটি উচ্চতা/ব্যাসার্ধের মাঝামাঝি নিশ্চয় এমন একটি উচ্চতা/ব্যাসার্ধ রয়েছে, যার জন্য প্রদক্ষিণকাল হবে ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন। এ ব্যাসার্ধ হচ্ছে

প্রায় ৪২,২৫০ কিলোমিটার, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা হিসাবে প্রায় ৩৫,৯০০ কিলোমিটার। (কক্ষপথের ব্যাসার্ধ থেকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বাদ দিলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপগ্রহের উচ্চতা পাওয়া যায়)। কোনো উপগ্রহ যদি এ উচ্চতায় বিষুবরেখা বরাবর.(Equatorial plane) পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরতে থাকে তবে উপগ্রহ বিষুবরেখার উপর একই বিন্দুতে স্থির বলে মনে হবে। এই জাতীয় উপগ্রহকে বলে ভূস্থির উপগ্রহ (Geostationary satellite) (চিত্র ৭.১)। ব্যাপারটি আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। মনে করি একজন লোক পৃথিবীপৃষ্ঠে বিষুবরেখার উপর ১০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি যদিও স্থির, তথাপি সে কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির (আপন কক্ষপথে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘূর্ণন) জন্য পৃথিবীর সাথে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যাচ্ছে। (যেমন আমরা যখন ট্রেনে বসে থাকি তখন ট্রেন চলার সাথে আমাদেরও একটি গতি থাকে)। এখন যদি একই স্থানের উপর, অর্থাৎ লোকটির ঠিক মাথার উপর প্রায় ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় একটি উপগ্রহ পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরতে থাকে, তখন লোকটির নিকট উপগ্রহটি স্থির মনে হবে। অর্থাৎ উভয়ের (লোক ও উপগ্রহ) প্রদক্ষিণকাল এক এবং একই দিকে।

ভূস্থির উপগ্রহের প্রধান উদাহরণ হলো যোগাযোগ উপগ্রহ (Communication satellite)। বাংলাদেশে ঢাকা, বেতবুনিয়া ও তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ স্টেশন থেকে যোগাযোগ উপগ্রহের মাধ্যমে বিদেশী প্রোগ্রাম তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দেখানো হয়ে থাকে। একটি ভূস্থির উপগ্রহ দ্বারা সারা পৃথিবী দেখা যায় না। এরকম একটি উপগ্রহ পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দেখতে পারে। তাই সমস্ত পৃথিবীর জন্য ন্যূনতম তিনটি ভূস্থির উপগ্রহের দরকার।

আগেই দেখা গেছে যে সার্বক্ষণিকভাবে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য মেরুবৃত্তীয় উপগ্রহ যথেষ্ট নয়। এজন্য ভূস্থির আবহাওয়া উপগ্রহ খুবই প্রয়োজনীয়। বর্তমানে প্রধান প্রধান যে কয়টি ভূস্থির আবহাওয়া উপগ্রহ আছে, তা ৭.১ সারণিতে দেয়া হলো। কোন কোন দেশ এগুলোর মালিক এবং এগুলো কত দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত, তাও সারণিতে দেয়া হয়েছে।

সারণি ৭.১ : ভূস্থির আবহাওয়া উপগ্রহ।

উপগ্রহের নাম	দেশ/মালিক	যে দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত
গোউজ-ই (GOES-E)	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭৫° পশ্চিম
গোউজ-ডব্লিউ (GOES-W)	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৫° পশ্চিম
মেটিওস্যাট (Meteosat)	ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সী	০°
গোমস ((GOMS)	রাশিয়া	৭০° পূর্ব
জি এম এস (GMS)	জাপান	১৪০° পূর্ব
ইনস্যাট (INSAT)	ভারত	৮৩° পূর্ব

GOES–Geostationary Operational Environmental Satellite (E-East, W-West)
Meteosat–Meteorological Satellite
GOMS–Geostationary Operational Meteorological Satellite
GMS–Geostationary Meteorological Satellite
INSAT–Indian Satellite

ভূ-উপগ্রহ স্টেশন

আবহাওয়া উপগ্রহ কর্তৃক গৃহীত ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়াবিষয়ক বিভিন্ন উপাত্ত ও ছবি উপগ্রহ থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে সরাসরি গ্রহণ করার জন্য ভূ-উপগ্রহ স্টেশনের (Satellite ground station) প্রয়োজন। এসব স্টেশন বা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় অ্যান্টেনা (Antenna) ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি থাকে। ছবি ও উপাত্ত গ্রহণ, এদের সংশোধন, প্রসেসিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি কাজ এ সকল স্টেশনে করা হয়ে থাকে।

এন্টেনা সাধারণত দু'রকমের। মেরুবৃত্তীয় উপগ্রহের জন্য ব্যবহৃত এন্টেনা বিভিন্ন দিকে ঘুরানো যায়। দিগন্তে যখন উপগ্রহের 'উদয়' হয় (অর্থাৎ দেখা যায়), এন্টেনাকে তখন উপগ্রহের দিকে স্থির করা হয়। উপগ্রহ যতই দিগন্ত থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে, এন্টেনাও আপনা-আপনি (automatically) উপগ্রহকে অনুসরণ করতে থাকে। উপগ্রহের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত স্থানীয় ভূ-উপগ্রহ স্টেশনে ছবি/উপাত্ত সংগৃহীত হয়। ভূস্থির উপগ্রহ সর্বক্ষণ উপগ্রহের দিকে মুখ করে থাকে। টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখার জন্য ব্যবহৃত 'ডিস' এন্টেনা তার একটি উদাহরণ। ডিস এন্টেনা যোগাযোগ উপগ্রহের (যা ভূস্থির) দিকে সর্বক্ষণ মুখ করে থাকে।

যে সকল দেশের নিজস্ব ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র আছে, সে সকল দেশ সরাসরি তাৎক্ষণিকভাবে (real time) আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে ছবি/উপাত্ত সংগ্রহ করে। যে সব দেশের নিজস্ব স্টেশন নেই তাদেরকে পরবর্তী সময়ে অন্য দেশ বা স্টেশন থেকে ছবি/উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়।

উপগ্রহ দ্বারা ছবি গ্রহণ ও প্রেরণ

উপগ্রহ কর্তৃক পৃথিবী ও উহার বায়ুমণ্ডলের ছবি গ্রহণ এবং এ ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ বেশ একটি জটিল পদ্ধতি। প্রযুক্তিগত ব্যবহার ব্যতিরেকে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত ছবি ও উপাত্ত গ্রহণ ও প্রেরণ সম্পর্কে এখানে অতি সাধারণভাবে একটু আলোকপাত করা হলো (চিত্র ৭.২)।

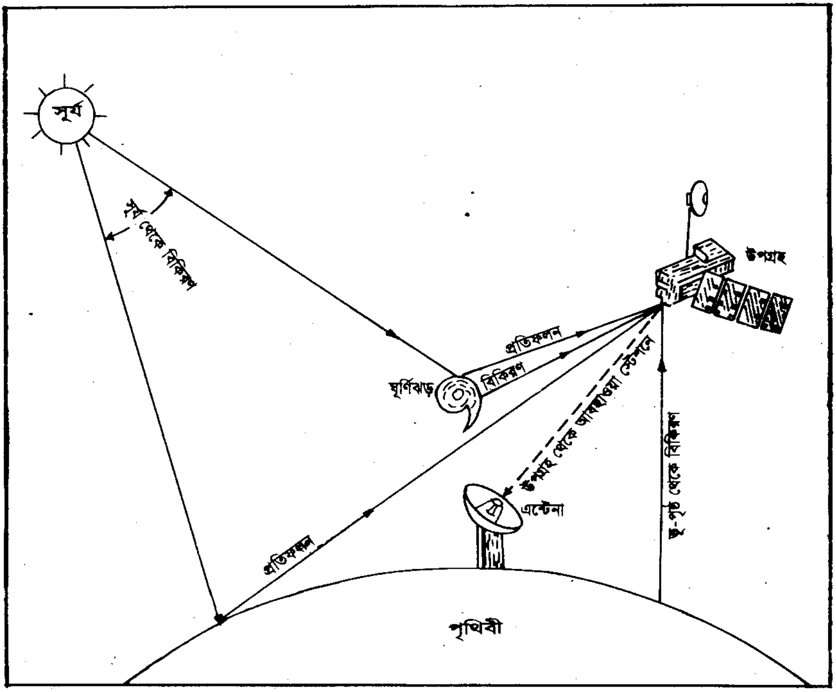

চিত্র ৭.২ : আবহাওয়া উপগ্রহ কর্তৃক চিত্র ও উপাত্ত গ্রহণ ও প্রেরণ।

সূর্য থেকে আলো প্রতিনিয়ত বিকিরিত হচ্ছে। পরিষ্কার আকাশে সূর্য দেখা যায়। কিন্তু মেঘ থাকলে দেখা যায় না। ঘূর্ণিঝড়ে প্রচুর মেঘ থাকে। মেঘ সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে। প্রতিফলিত আলো উপগ্রহের ক্যামেরা বা সেন্সরে (sensor) ধরা পড়ে। উপগ্রহ মেঘের ছবি গ্রহণ করে পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করে। পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত ভূ-উপগ্রহ স্টেশন এন্টেনার সাহায্যে মেঘের ছবি তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়। মেঘের ছবি বিশ্লেষণ করে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি বের করা হয়।

সূর্যের আলো শুধু ঘূর্ণিঝড় দ্বারাই প্রতিফলিত হয় না। ভূপৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলে ভাসমান বিভিন্ন কণা (যেমন : ধুলা, ধোঁয়া) দ্বারাও সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হয়। এছাড়া পৃথিবী এবং ঘূর্ণিঝড় হতেও তাপ বিকিরিত হয়। এসবের কিছু অংশ, যা উপগ্রহের দিকে যায়, উপগ্রহে ধরা পড়ে।

ছবির বিশ্লেষণ

ঘূর্ণিঝড়ের ছবি থেকে প্রধান যে দু'টো তথ্য পাওয়া যায় তা হলো ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান ও তাতে বাতাসের সর্বোচ্চ গতি। ছবির উপর ম্যাপ প্রতিস্থাপন করে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। ছবিতে মেঘের গঠন বা ফিচার (Feature) থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বাতাসের সর্বোচ্চ গতি সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন।

মেঘমালার প্যাটার্ন ও বাতাসের সর্বোচ্চ গতি অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়কে চারটি পর্যায়ে (stage) ভাগ করা হয়ে থাকে। এ.বি.সি এবং এক্স পর্যায়। এ এবং বি নিম্নচাপ বা তার নিচের শ্রেণীতে পড়ে। এ অবস্থায় মেঘমালা তেমন সুগঠিত থাকে না। দেখতে মেঘগুচ্ছ মনে হয়। সি পর্যায় সাধারণত ঘূর্ণিঝড় (cyclonic storm) শ্রেণীভুক্ত। এ পর্যায়ে মেঘ ঘনীভূত মনে হয়। চতুর্থ পর্যায় এক্সকে আবার চার ক্যাটাগরিতে (category) ভাগ করা হয়, যে সব ক্যাটাগরির কথা ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাসে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। ক্যাটাগরি–১ এ মেঘ বেশ সুগঠিত থাকে এবং ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র গঠনের আলামত দেখা যায়। একটি প্রশস্ত এবং লম্বা লেজ থাকতে পারে। চোখ দেখা যায় না। বাতাসের গতি হয় ঘণ্টায় প্রায় ৪৮–৮০ কিলোমিটার (৩০–৫০ মাইল)। ক্যাটাগরি–২ অনেকটা ক্যাটাগরি–১ এর মতোই। তবে বাতাসের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৬৫–১২৯ কিলোমিটার (৪০–৮০ মাইল)। ক্যাটাগরি–৩ এ চোখ সাধারণত দেখা যায়, তবে দেখতে অনেকটা ঝাপসা এবং অসংগঠিত। মেঘ হয় প্রায় ঘন (compact) এবং বৃত্তাকার। বাতাসের গতি থাকে ঘণ্টায় ৮০–২০১ কিলোমিটার (৫০–১২৫ মাইল)। ক্যাটাগরি–৪ এর ঘূর্ণিঝড় সবচেয়ে মারাত্মক। চোখ স্পষ্ট দেখা যায় এবং বৃত্তাকার আকার ধারণ করে। মেঘমালা হয় প্রায় গোলাকার। বাতাসের গতি থাকে ঘণ্টায় প্রায় ১২৯–৩২২ কিলোমিটার (৮০–২০০ মাইল)। এখানে উল্লেখ্য যে কাছাকাছি ক্যাটাগরি বা কাছাকাছি পর্যায়ের মধ্যে বাতাসের গতি আংশিক আবৃত (overlapped) রয়েছে। যেমন 'এ' পর্যায়ের সাথে 'বি' পর্যায়, 'বি' পর্যায়ের সাথে 'সি' পর্যায়, 'সি' পর্যায়ের সাথে 'এক্স' পর্যায়, ক্যাটাগরি–১ এর সাথে ক্যাটাগরি–২ ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত বিভাজন ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে তেমন একটা ব্যবহৃত হয় না। শ্রেণী বিভাজনকে আরো সূক্ষ্মতর করার জন্য বর্তমানে বহুল প্রচলিত টি–নম্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টি–নম্বর

টি–নম্বর সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মেঘের প্যাটার্ন ও বাতাসের গতি অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য আটটি পূর্ণ টি–নম্বর (T-Tropical) বা সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। টি–নম্বর বেশি বলতে বাতাসের গতি বেশি আর কম বলতে বাতাসের গতি কম। টি–নম্বরকে অনেক সময় আবার সি. আই (C.I.-Current Intensity) নম্বরও বলা হয়। উভয়ে এক হলেও তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে। বিকাশমান (developing) বা পরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড়ের জন্য টি–নম্বর এবং সি. আই নম্বর এক। কিন্তু দুর্বল হয়ে যাওয়া অবস্থায় সি.আই নম্বরকে টি–নম্বরের চেয়ে কিছু বেশি রাখা হয়। দুর্বল ঘূর্ণিঝড়কে নিয়ে মানুষ অবশ্য তেমন

চিন্তিত থাকে না। তাই এখানে টি–নম্বর এবং সি. আই নম্বর একই ধরা হয়েছে এবং টি–নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

সর্বনিম্ন টি–নম্বর হচ্ছে ১ এবং সর্বোচ্চ ৮। নম্বর ০.৫ করে বাড়ে। টি–নম্বর দ্বারা সর্বোচ্চ বাতাসের গতি নির্ণয় করা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের ছবি বিশ্লেষণ করে তার প্যাটার্ন দেখে টি–নম্বর ঠিক করা হয় এবং টি–নম্বর ও সর্বোচ্চ বাতাসের মধ্যে সম্পর্কিত একটি সারণি (৭.২) ব্যবহার করে বাতাসের সর্বোচ্চ গতি নির্ধারণ করা হয়। আমেরিকার বিখ্যাত আবহাওয়াবিদ ভি. এফ. ভোরাক (V.F. Dvorak) এই সারণির উদ্ভাবক। মূল সারণিতে বাতাসের বেগ নটে দেয়া আছে। এখানে কিলোমিটার এবং মাইলও দেয়া হয়েছে।

সারণি ৭.২ : টি নম্বর এবং বাতাসের সর্বোচ্চ গতি।

টি নম্বর/সি আই নম্বর	বাতাসের সর্বোচ্চ গতি		
	নট	কিলোমিটার/ঘণ্টা	মাইল/ঘণ্টা
১	২৫	৪৬	২৯
১.৫	২৫	৪৬	২৯
২	৩০	৫৬	৩৫
২.৫	৩৫	৬৫	৪০
৩	৪৫	৮৩	৫২
৩.৫	৫৫	১০২	৬৩
৪	৬৫	১২২	৭৫
৪.৫	৭৭	১৪৩	৮৯
৫	৯০	১৬৭	১০৪
৫.৫	১০২	১৮৯	১১৭
৬	১১৫	২১৩	১৩২
৬.৫	১২৭	২৩৬	১৪৬
৭	১৪০	২৬০	১৬১
৭.৫	১৫৫	২৮৭	১৭৮
৮	১৭০	৩১৫	১৯৫

সি. আই/টি–নম্বরের সাথে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রচাপের একটি সম্পর্ক রয়েছে। স্থানভেদে এটি ভিন্ন হয়ে থাকে। টি–নম্বরের সাথে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর–পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বায়ুচাপের একটি তুলনামূলক সারণি ৭.৩ সারণিতে দেয়া হয়েছে। বঙ্গোপসারের জন্য এই সারণি ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড়ের বাইরের স্বাভাবিক চাপ থেকে (প্রায় ১০১৩ মিলিবার) এই চাপ দিলে চাপ–ঘাটতি বের করা সম্ভব। চাপ–ঘাটতি জানা গেলে সর্বোচ্চ বাতাসও এই সারণির সাহায্যে অনুমান করা যায়।

সারণি ৭.৩ : টি নম্বরের সাথে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর–পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে সমুদ্রপৃষ্ঠে গড় চাপের সম্পর্ক।

টি নম্বর	ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে সমুদ্রপৃষ্ঠে গড় চাপ (Mean sea level pressure) (মিলিবার)		
	আটলান্টিক মহাসাগর	উত্তর–পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর	বঙ্গোপসাগর
১	—	—	—
১.৫	—	—	—
২	১০০৯	১০০৩	৯৯৮
২.৫	১০০৫	৯৯৯	৯৯৭
৩	১০০০	৯৯৪	৯৯৫
৩.৫	৯৯৪	৯৮৮	৯৯২
৪	৯৮৭	৯৮১	৯৮৯
৪.৫	৯৭৯	৯৭৩	৯৮৩
৫	৯৭০	৯৬৪	৯৭৫
৫.৫	৯৬০	৯৫৪	৯৬৫
৬	৯৪৮	৯৪২	৯৪৯
৬.৫	৯৩৫	৯২৯	৯৩৭
৭	৯২১	৯১৫	—
৭.৫	৯০৬	৯০০	—
৮	৮৯০	৮৮৪	—

উপগ্রহ থেকে অন্যান্য তথ্যাদি

আবহাওয়া উপগ্রহ শুধু ঘূর্ণিঝড়ের ছবিই প্রেরণ করে না, এর মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর প্রবাহ, আর্দ্রতা, চাপ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের গঠন নির্ধারণ এবং পূর্বাভাসে যথেষ্ট সহায়ক হয়। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড় থেকে কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে তারও অনুমান করা সম্ভব। সে হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের মেঘ ছাড়াও অন্যান্য মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও হিসাব করা যায়। এটি বন্যার পূর্বাভাসে বিশেষ উপকারে আসে। উপগ্রহের সাহায্যে মেঘের দৈনন্দিন অবস্থা এবং অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা যায়। এবং কখন কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হতে পারে, তা বুঝা যায়। যেমন যদি দেখা যায় যে হিমালয়ের দিকে প্রচুর মেঘ যাচ্ছে, তাহলে মনে করতে পারা যায় যে সেখানে বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং সে কারণে বাংলাদেশের নদীতে বন্যার ডাক আসতে পারে। বাংলাদেশে স্থানীয় বৃষ্টি সম্পর্কেও আভাস দেয়া সম্ভব।

পক্ষান্তরে আকাশ যদি মেঘমুক্ত থাকে, তখন উপগ্রহ পৃথিবীপৃষ্ঠের ছবি নেয়। নোয়া আবহাওয়া উপগ্রহের এ জাতীয় ছবি বিভিন্ন কাজে লাগে। যেমন : ফসল, বন্যা, বনাগ্নি

(forest fire) ও স্থলভাগের বিভিন্ন অবস্থা নির্ধারণ, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, পানির স্রোত, সমুদ্র দোষণ, সমুদ্রে মাছ ধরার অনুকূল এলাকা নির্ণয় ইত্যাদি। তবে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য আজকাল বিষয়ভিত্তিক উপগ্রহও রয়েছে। যেমন স্থলভাগের সম্পদ জরিপের জন্য ল্যাণ্ডস্যাট (Landsat-land satellite), স্পট (SPOT) এবং আই. আর. এস (IRS-Indian Remote-sensing Satellite) বেশি উপকারী। সমুদ্রের জন্যও বিশেষ উপগ্রহ রয়েছে। কিছু উপগ্রহে আবার মাইক্রোওয়েভ (microwave) সেন্সর রয়েছে যা মেঘের ভিতর দিয়ে এবং রাতেও পৃথিবীপৃষ্ঠের ছবি বা উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে।

জরিপ উপগ্রহের সাহায্যে কৃষি, বন সম্পদ, মৎস্য-সম্পদ, ভূমি-ব্যবহার, পানি সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ আজকাল নিয়মিত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে সম্পদ সংরক্ষণ, বর্ধন এবং টেকসই উন্নয়নে উপগ্রহ অনেক অবদান রাখছে। এ ছাড়া স্থল ও জলভাগের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জায়গায় উপাত্ত সংগ্রহ প্লাটফরম (Data Collection Platform-DCP) স্থাপন করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে (যেখানে সবসময় যাওয়া সম্ভব নয়) উপাত্ত সংগ্রহের এটি একটি উত্তম পন্থা। বিশেষ করে সমুদ্র এলাকার জন্য। সমুদ্র এলাকায় এদের বিশেষ নাম হচ্ছে 'বয়া' (buoy)। বয়া সমুদ্রে ভাসমান থাকে। এদের কোনোটি দীর্ঘ চেইন দ্বারা সমুদ্রের তলদেশের সাথে বাঁধা থাকে। আবার কোনটি থাকে মুক্ত। মুক্ত বয়া পানির স্রোতে ও বাতাসের বেগে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে বেড়ায়। ডিসিপি/বয়ার যন্ত্রপাতি নিয়মিত এবং আপনা-আপনি উপাত্ত সংগ্রহ করতে থাকে। সমুদ্রের তাপ, স্রোত, পানির উঠা-নামা, লবণাক্ততা, ইত্যাদি এবং নদী বা হ্রদে হলে সেখানকার পানির উচ্চতা, স্রোত, ইত্যাদির উপাত্ত সংগ্রহ করে। এসব উপাত্ত আবহাওয়াবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান এবং পানিবিদ্যায় বেশি কাজে লাগে।

উপাত্ত সংগ্রহ করে ডিসিপি/বয়া আপনা-আপনি নিকটবর্তী উপগ্রহে তা পাঠিয়ে দেয়। উপগ্রহ আবার প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে এসব উপাত্ত নিকটবর্তী আবহাওয়া উপগ্রহ স্টেশনে প্রেরণ করে। এভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিত উপাত্ত সংগ্রহ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

BANSDOC Library Dhaka

অষ্টম অধ্যায়

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস

ঘূর্ণিঝড়ের আক্রমণ থেকে জান-মাল রক্ষার্থে সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং আক্রমণের আগে এর পূর্বাভাস দেয়া অত্যন্ত জরুরি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পূর্বাভাসের উপর কিছু আলোকপাত করা হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক পূর্বাভাস দেয়া খুবই জটিল এবং কঠিন। তথাপি আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাসের উন্নতি করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আরো উন্নত পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হবে।

পূর্বাভাসে থাকে ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম, গতি ও গতিপথ, উপকূলে আঘাতের সম্ভাব্য স্থান ও সময়, ঘূর্ণিঝড় কর্তৃক সৃষ্ট সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা, বাতাসের সর্বোচ্চ গতি, কেন্দ্রে নিম্নচাপের পরিমাণ ইত্যাদি। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসের প্রাথমিক পর্যায় হলো এর জন্মের পূর্বাভাস। পরবর্তী পর্যায় হলো এর গতিপথ, গতি ও অন্যান্য বিষয়। তবে পূর্বাভাসের বেশির-ভাগই গতিপথ সম্পর্কিত। গত প্রায় দু'দশক ধরে ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাসেরও প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাস

ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাসের মূল উদ্দেশ্য হলো কোন এলাকায় কোন ঘূর্ণিঝড় ঋতুতে (cyclone season) কতটি ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হতে পারে, তা আগাম বলে দেয়া।

প্রায় প্রতিটি ঘূর্ণিঝড় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের বার্ষিক গড় (কয়েক বছরের ঘূর্ণিঝড়-সংখ্যার সমষ্টিকে মোট বছর দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত) হতে প্রতি বছরের ঘূর্ণিঝড় সংখ্যার ব্যবধান বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উঠানামা করে। দেখা গেছে এ উঠানামা ক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রের বৃহত্তর অবস্থার ধীর পরিবর্তনের (slowly varying) সাথে সম্পর্কিত। পরিবর্তনশীল উপাদানের মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর এলাকা জুড়ে বায়ুপ্রবাহ, এল নিনিও, দখিনা দোলন, কিউ.বি.ও, সমুদ্রের তাপমাত্রা, সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ ইত্যাদি। ধীর পরিবর্তন আগে থেকে পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী ঋতুতে কতটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে, তার পূর্বাভাস কোনো কোনো অঞ্চলে দেয়া হয়েছে এবং মোটামুটি সফলতাও পাওয়া গিয়েছে। প্রধান প্রধান যে সকল অঞ্চলে এ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তাহলো আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ এবং অস্ট্রেলিয়া এলাকা।

জন্মের পূর্বাভাস

ঘূর্ণিঝড়ের সর্বপ্রথম পূর্বাভাস হলো এর জন্ম সম্পর্কিত। কখন, কোথায় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হবে তা গাণিতিক মডেলের সাহায্যে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য জন্মের পূর্বাভাস দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চলছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবহাওয়া উপগ্রহের সাহায্যে নেয়া হয় যার মাধ্যমে প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়। আগেই আমরা দেখেছি যে যেখানে মেঘপুঞ্জ বিদ্যমান, সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের জন্মের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু সব মেঘপুঞ্জ আবার ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয় না। তবে একই সাথে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের উপাত্ত/তথ্য এবং আবহাওয়া তালিকার সাহায্য নিলে জন্মের পূর্বাভাস কিছুটা সহজতর হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। অন্যান্য তথ্য/উপাত্ত যা ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের স্থানীয় পরিসংখ্যান (Local cyclone climatology)।

কিন্তু দেখা গেছে অধিকাংশ আবহাওয়া কেন্দ্র জন্মের পূর্বাভাস নিয়ে তেমন চিন্তিত নন। জন্মের পর থেকে চিন্তা শুরু হয়। ঘূর্ণিঝড় যখন সৃষ্টি হয়, তখন সাধারণত এটি উপকূল থেকে অনেক দূরে থাকে এবং শক্তিতে হয় দুর্বল। কাজেই তাৎক্ষণিকভাবে অথবা অতি নিকট ভবিষ্যতে এর দ্বারা ক্ষতির তেমন সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। সে হিসেবে জন্মের পূর্বাভাস নিয়ে তেমন বিচলিত না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

গতিপথের পূর্বাভাস

আগেই বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় যে পথ দিয়ে চলে সে পথকে বলা হয় ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ (track)। কোনো ঘূর্ণিঝড়ের জীবনকালে বিভিন্ন সময়ে তার কেন্দ্রের অবস্থান একটি রেখা দ্বারা যোগ করলে গতিপথ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এ পথ কোন দিকে যাবে, তা বলাকে বলা হয় গতিপথের পূর্বাভাস। কাজেই দেখা যাচ্ছে গতিপথ নির্ধারণের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা উচিত।

ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান নির্ণয়

সমুদ্রে কখন এবং কোথায় ঘূর্ণিঝড় ছিল এবং বর্তমানে কোথায় আছে, যতো সঠিকভাবে তা নির্ণয় করা যাবে, ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ–পূর্বাভাস ততো উন্নতর হবে। ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য প্রধান প্রধান যে সব উপাত্ত ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর থেকে গৃহীত উপাত্ত এবং সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ও আবহাওয়া উপগ্রহ দ্বারা গৃহীত উপাত্ত। এগুলো সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে ভূ-উপগ্রহ সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত উপায় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেখা গেছে উপগ্রহের সাহায্যে বেশ সহজেই ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

বিদ্যমানতা

ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ পূর্বাভাসের সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো বিদ্যমানতা পূর্বাভাস (Persistance forecast)। এ ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে ঘূর্ণিঝড় এর নিকট অতীত চলার পথ অনুসরণ

করবে। অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের চলার পথ যে যে কারণে প্রভাবিত হয় সে সব কারণসমূহের মাত্রা নিকট ভবিষ্যতে প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে। গত ১২–২৪ ঘণ্টা ধরে ঘূর্ণিঝড় যে দিকে যাচ্ছিল, পরবর্তী ১২–২৪ ঘণ্টাও সে পথে চলবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবহাওয়াবিদরা এ 'নিয়ম' মেনে চলেন।

স্বল্প–মেয়াদি (Short-term) পূর্বাভাসের জন্য এ পন্থা একটি সহজতর উপায়। কিন্তু দীর্ঘ–মেয়াদি (Long-term) পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম ভাল ফল দেয় না। কারণ স্বল্প–মেয়াদি নিয়মের পিছনে যে অনুমান করা হয়, দীর্ঘ–মেয়াদির বেলায় তা সঠিক থাকে না। নিকট অতীতের অবস্থা ভবিষ্যতে অপরিবর্তিত থাকে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিয়ন্ত্রক প্রবাহ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। স্বল্প সময়ের জন্য এ পরিবর্তন তেমন অনুভূত বা লক্ষণীয় না হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেজন্য এ পন্থার প্রয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। তথাপি প্রায় সব পূর্বাভাসেই বিদ্যমানতার দিকে নজর রাখা হয়।

অতীত ইতিহাস

এ ক্ষেত্রে অতীত ঘূর্ণিঝড়সমূহের গতিপথের ইতিহাসের (Climatology of past cyclone tracks) সাহায্য নেয়া হয়। ধরে নেয়া হয় যে বর্তমান ঘূর্ণিঝড় একই সময়ে একই স্থানে আগের ঘূর্ণিঝড়ের গড় গতি ও দিক মেনে চলবে। মনে করা যাক, ১২ ঘণ্টা পর বর্তমান ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান কি হবে তা বলতে হবে। বর্তমান স্থানে বছরের এ সময় ঐতিহাসিক গড় গতিকে ১২ দ্বারা পূরণ করলে ১২ ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড় কত দূরত্ব অতিক্রম করবে, তা পাওয়া যাবে। যেহেতু গড় দিক জানা আছে, তাই বর্তমান অবস্থার সাথে হিসাবকৃত দূরত্ব যোগ করলে ১২ ঘণ্টা পরে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থানের পূর্বাভাস দেয়া যাবে।

এ নিয়ম প্রয়োগের জন্য ঘূর্ণিঝড় এলাকাকে সাধারণত ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে/আয়তক্ষেত্রে ভাগ করা হয়। প্রধানত ২.৫ ডিগ্রি অক্ষাংশ এবং ২.৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রতি বর্গে অতীত ঘূর্ণিঝড়ের গড় গতি ও দিক দেয়া থাকে। এভাবে প্রস্তুতকৃত তালিকা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে খুবই সহায়ক হয়। তালিকাগুলি মাসভিত্তিক বা ঋতুভিত্তিক হতে পারে।

অতীত ইতিহাসভিত্তিক ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সেখানেই এবং তখনই বেশি সফলতর হয় যে স্থানে এবং যে মাসে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেশি হয় ; কারণ তাতে গড় গতি ও দিক অধিক নির্ভরযোগ্য হয়। আর যেখানে এবং যে মাসে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা কম (যেমন আমাদের দেশে ডিসেম্বর মাসে) সে স্থানে ও সময়ে প্রাপ্ত গড় কম নির্ভরযোগ্য।

অতীত ইতিহাসভিত্তিক পূর্বাভাসের প্রধান ত্রুটি হলো : এতে অতীত ঘূর্ণিঝড়সমূহের গড় গতিপথের ব্যতিক্রম (Deviation from the mean track) হিসেবে আসে না। গড় গতিপথ থেকে প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রতি দুটি ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ কখনো এক হয় না। তাছাড়া এ রকম পূর্বাভাসে তেমন কোনো দক্ষতারও দরকার হয় না ; কারণ এতে ঘূর্ণিঝড়ের বর্তমান অবস্থার তেমন কোনো তথ্য বা উপাত্তের প্রয়োজন পড়ে না।

ক্লিপার

উপরে বর্ণিত অতীত ইতিহাস (Climatology) এবং বিদ্যমানতা (Persistance)–এ দুটির পৃথক প্রয়োগের বদলে উভয়ের মিলিত বা গড় ব্যবহার থেকে উন্নততর পূর্বাভাস আশা করা যায়। এ রকম নিয়মকে বলা হয় ক্লিপার (CLIPER-Climatology এবং Persistance)। এ পন্থায় প্রধানত অর্ধেক ইতিহাস এবং অর্ধেক বিদ্যমানতা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ উভয়কে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ২৪ ঘন্টা পরে ঘূর্ণিঝড় কোথায় অবস্থান করবে তার পূর্বাভাস দরকার। উভয় নিয়ম দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে ২৪ ঘন্টা পরে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য দুটি স্থান বের করা হয়। তারপর এ দুটি স্থানের গড় (arithmetic mean) অর্থাৎ ঠিক মধ্যবর্তী স্থানকে ২৪ ঘন্টা পরে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস–স্থান (Forecast location) হিসেবে ধরা হয়।

কখনো কখনো আবার অর্ধেক–অর্ধেক ভিত্তিতে পূর্বাভাস না দিয়ে পন্থা দুটির আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী গুণিতক গড় (weighted mean) ব্যবহার করা হয়। যেমন প্রথম দিকের পূর্বাভাসে বিদ্যমানতা এবং পরের দিকে ইতিহাসের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সেভাবে গুণিতক গড় ব্যবহার করে পূর্বাভাস–স্থান নির্ণয় করা হয়।

ক্লিপার পন্থার মূল সুবিধা হলো এর ব্যবহার খুবই সোজা এবং মোটামুটিভাবে এটি বেশ সফলকাম। তবে অসুবিধা হলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এটি নির্ভরশীল নয়. এ ছাড়া যেসব এলাকায় অতীত উপাত্ত অপর্যাপ্ত, সে সব এলাকার জন্য এবং ব্যতিক্রমধর্মী গতিপথের জন্য ক্লিপার নিয়মের প্রয়োগ তেমন সফলতা দেয় না।

পরিসংখ্যান মডেল

ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ পূর্বাভাসে অনেক সময় পরিসংখ্যান মডেল (Statistical model) ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় মডেল সাধারণত রিগ্রেশন সমীকরণ (Regression equation) ভিত্তিক। সমীকরণের সমাধান থেকে বেরিয়ে আসে ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী অবস্থানের পূর্বাভাস। এ সব সমীকরণে প্রধানত আবহাওয়া ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্যারামিটার থাকে ; যেমন ঘূর্ণিঝড়ের অতীত গতি ও দিক, বিভিন্ন চাপ–স্তরের উচ্চতার পরিবর্তন (Change of height fields of pressure surface), তাপ, চাপ ইত্যাদি। এসব প্যারামিটারের মান ঘূর্ণিঝড়ের বিদ্যমানতা, অতীত ইতিহাস, আবহাওয়া তালিকা, গাণিতিক মডেল, প্রভৃতি হতে পাওয়া যায়। প্যারামিটার সমীকরণে 'ইনপুট' (Input) হিসেবে কাজ করে। আর 'আউটপুট' (Output) হিসেবে বেরিয়ে আসে ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী অবস্থান।

পরিসংখ্যান মডেলও ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ পূর্বাভাসে সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। এর প্রধান কারণ হলো : যে সব প্যারামিটার সমীকরণে রয়েছে, তাদের মান সবসময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া সকল সমীকরণে সকল প্যারামিটারও ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন মডেলে বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহৃত হয়। কি কি প্যারামিটার ব্যবহৃত হবে, তা মডেল উদ্ভাবনকারী,

মডেল ব্যবহারকারী ও মডেলের ফলাফলের উপর নির্ভর করে। সকল প্যারামিটার একই মডেলে ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

গাণিতিক মডেল

বিশ্ব আবহাওয়া ও জলবায়ু পূর্বাভাসের জন্য আজকাল বড় বড় গাণিতিক মডেল (mathematical model) ব্যবহার করা হয়। এসব মডেলে বায়ুর গতি, ভর, তাপ ইত্যাদি জটিল সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। সমীকরণের সমাধানের মধ্যে পূর্বাভাস নিহিত।

সাধারণ গাণিতিক নিয়মে (Analytical procedure) এ সকল সমীকরণের পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়, তাই কম্পিউটারের সাহায্যে নেয়া হয়। কম্পিউটার থেকে সমাধান সংখ্যা বা number বা numeric এ প্রকাশিত হয় বলে এসব গাণিতিক মডেলকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিউমারিক্যাল মডেল (numerical model) বলা হয়। আর মডেলের সাহায্যে প্রদত্ত পূর্বাভাসকে বলে নিউমারিক্যাল আবহাওয়া পূর্বাভাস (numerical weather prediction)।

আজকালকার বিভিন্ন বড় বড় বিশ্ব আবহাওয়া/জলবায়ু মডেল কম্পিউটারভিত্তিক। মডেলের সাহায্যে সময়ের অপেক্ষক (function) হিসেবে আবহাওয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্যারামিটারের মান প্রকাশ করা হয়। যেমন, ২৪ ঘণ্টা পরে কোনো স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর গতি ইত্যাদি কত হবে, ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান কোথায় হবে, তা কম্পিউটারের সাহায্যে আগাম বলা সম্ভব।

বিশ্ব আবহাওয়া মডেলের সাহায্যে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস নিয়মিত দেয়া সম্ভব। ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের পূর্বাভাস এ সকল মডেলের সাহায্যে দেয়া বেশ সহজসাধ্য হয়ে পড়ছে দিন দিন। বিশ্ব মডেলের পরিবর্তে বা এর সাথে সাথে কখনো কখনো আবার স্বল্প পরিসরভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় মডেলও ব্যবহৃত হয়। এদের বিস্তৃতি বিশ্ব মডেলের তুলনায় অনেক কম। বিশ্ব মডেল হয়তো পুরো উত্তর গোলার্ধ নিয়ে হতে পারে। পক্ষান্তরে ঘূর্ণিঝড় মডেল হয়ত শুধু বঙ্গোপসাগর এলাকার মধ্যেই সীমিত থাকবে। তবে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের জন্য স্বল্প পরিসরভিত্তিক মডেল উপযোগী। কিন্তু প্রধান অসুবিধা হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে ঘূর্ণিঝড়ের মিথস্ক্রিয়া স্বল্প পরিসর মডেলে তেমন প্রাধান্য পায় না। তবে উভয় মডেলের প্রয়োগ উন্নতর পূর্বাভাস প্রদানে অধিকতর সহায়ক।

তীব্রতা পূর্বাভাস

ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা (Intensity) বলতে ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতি এবং বা কেন্দ্রে বায়ুর সর্বনিম্ন চাপকে বুঝায়। তবে প্রধানত বাতাসের সর্বোচ্চ গতিকেই তীব্রতা হিসেবে ধরা এবং সেভাবেই ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ বা শ্রেণীভাগ করা হয়, যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি। সর্বোচ্চ বাতাসের গতি এবং কেন্দ্রে নিম্নচাপ বা চাপ-ঘাটতি একে অন্যের সাথে অবশ্য বিপরীত অনুপাতে সংপৃক্ত। এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কেন্দ্র-চাপ যতো কম বা চাপ-ঘাটতি যতো বেশি হবে, বাতাসের গতিও সে

অনুপাতে বাড়বে। কাজেই সর্বনিম্ন চাপের পরিমাণ জানা থাকলে সর্বোচ্চ বাতাসের গতি নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন সমীকরণ উদ্ভাবন করা হয়েছে উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে। অতীতের ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস পরিসংখ্যান হতে সমীকরণের উদ্ভাবন করা হয়।

বর্তমান/অতীত চাপ/বাতাসের গতি আবহাওয়া তালিকা, উপগ্রহ ছবি ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায়। কিন্তু ভবিষ্যৎ-তীব্রতার পূর্বাভাস খুবই কঠিন। গতিপথ পূর্বাভাসের চেয়ে তীব্রতা পূর্বাভাস অনেক জটিল এবং কঠিন। নির্ভরযোগ্য কোনো পন্থা এখনো উদ্ভাবিত হয়নি। তবে আমেরিকান বিজ্ঞানী ভোরাকের (Dvorak) নিয়ম অনুসরণ করে উপগ্রহ ছবির সাহায্যে তীব্রতার পূর্বাভাস প্রদান আজকাল বেশ প্রসার লাভ করেছে। গাণিতিক মডেলের সাহায্যের তীব্রতা-পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে আরো গবেষণার প্রয়োজন।

BANSDOC Library
Accession No. 17870
BANSDOC Library Dhaka

নবম অধ্যায়

জলোচ্ছ্বাস

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এ দুইভাবে ঘূর্ণিঝড় আমাদের ক্ষতি সাধন করে। প্রত্যক্ষ ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড বায়ুতে ঘরবাড়ি, গাছপালা, শস্য ইত্যাদি বিনষ্ট হওয়া। পরোক্ষভাবে ঘূর্ণিঝড় ক্ষতি সাধন করে মূলত জলোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে। ঘূর্ণিঝড়জনিত ক্ষয়-ক্ষতির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কারণই জলোচ্ছ্বাস। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তীকালে বিভিন্ন রোগের প্রকোপও দেখা দেয়।

বাংলাদেশে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস অন্যতম। এ জলোচ্ছ্বাস বা জলের উচ্ছ্বাসকে ইংরেজি ভাষায় বলে 'স্টরম সারজ' (Storm surge)। স্টরম মানে সাইক্লোনিক স্টরম বা ঘূর্ণিঝড়, আর সারজ মানে উচ্ছ্বাস। সুতরাং স্টরম সারজ অর্থ হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সমুদ্রে সৃষ্ট প্রবল জলতরঙ্গ বা জলের উচ্ছ্বাস, সংক্ষেপে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা শুধু জলোচ্ছ্বাস।

ঘূর্ণিঝড় ছাড়া সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক বায়ুতে সমুদ্রে পানি উঠানামা করে ; কিন্তু একে আমরা জলোচ্ছ্বাস বলি না।

সমুদ্রে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস যখন আমাদের উপকূলে আঘাত হানে, তখন বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে প্লাবিত হয়ে যায়। এ প্লাবনের মাত্রা নির্ভর করে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা এবং উপকূল এলাকার উচ্চতার উপর। আমাদের উপকূল সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে স্বল্প উচ্চতায় অবস্থিত। ফলে সামান্য জলোচ্ছ্বাসেই অনেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরিশিষ্ট ১ এ বাংলাদেশে বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জড়িত সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ দেয়া হয়েছে। ১৮৭৬ সালে জলোচ্ছ্বাসের (জোয়ারসহ, পরে আলোচনা করা হয়েছে) উচ্চতা ছিল প্রায় ১২ মিটার, ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের ঘূর্ণিঝড়ে ছিল ১০ মিটার এবং ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে ছিল ৬ মিটার। এসব উদাহরণ থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ পরিমাণ উঁচু পানি বাংলাদেশের নিচু ও প্রায় সমতল উপকূল এলাকায় আঘাত হানলে পরিস্থিতি কি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির কারণ

জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির প্রধান দু'টি কারণ হচ্ছে :

চাপ-ঘাটতি

বাতাস।

এ ছাড়া বৃষ্টিও কিছু অবদান রাখে। এই তিনটি কারণে কিভাবে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়, তা নিম্নে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

চাপ-ঘাটতি

সমুদ্রে কোনো স্থানে (যেমন ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে) পারিপার্শ্বিক এলাকার তুলনায় বায়ুর চাপ কমে গেলে সেখানকার পানি সোজা উপরের দিকে ফুলে উঠে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। এরূপ ফুলে উঠাকে ইংরেজিতে বলে 'সাকিং ইফেক্ট' (sucking effect) বা 'ইনভারটেড ব্যারোমিটার ইফেক্ট' (inverted barometer effect)। অর্থাৎ ব্যারোমিটারে চাপ কমার সাথে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি ইউ-টিউবে (U-tube) পানি নিয়ে এর খোলা মুখ দুটি যদি উপরের দিকে রাখা হয় এবং উভয় মুখেই যদি সমান বায়ুচাপ প্রয়োগ করা হয়, তখন দেখা যাবে যে টিউবের দু'প্রান্তের পানি একই লেভেলে আছে। এখন একটি মুখে যদি অন্য মুখের তুলনায় বায়ুচাপ বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে অধিক চাপবিশিষ্ট মুখে পানি নিচে নেমে যাবে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাপবিশিষ্ট মুখে পানি উপরে উঠে যাবে। এই পরীক্ষা দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে বায়ুচাপের তারতম্যে পানির উচ্চতা উঠা-নামা করে। সমুদ্রেও ঠিক তাই হয়। কম চাপ এলাকার পানি তুলনামূলকভাবে বেশি চাপ এলাকার পানির চেয়ে উপরে উঠে গিয়ে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে চাপ সর্বনিম্ন বলে শুধু চাপজনিত কারণে এখানে পানির উচ্চতা বা জলোচ্ছ্বাস সর্বাধিক, কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সাথে পানির উচ্চতা কমতে থাকে ; কারণ কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে চাপ-ঘাটতির পরিমাণ ক্রমশ কমে আসে। ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রসর হওয়ার সাথে এর কেন্দ্রও স্থান পরিবর্তন করে। ফলে যেখানে এই মুহূর্তে পানির উচ্চতা সর্বোচ্চ (সেখানে কেন্দ্র থাকার জন্যে), সে জায়গায় পরের মুহূর্তে পানির উচ্চতা কমে যাবে এবং অন্যত্র বৃদ্ধি পাবে। এভাবে ঘূর্ণিঝড়ের চলার সাথে পানির উচ্চতা বা জলোচ্ছ্বাস উঠা-নামা করতে থাকবে।

চাপহ্রাসের সাথে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতার একটি সাধারণ নিয়ম রয়েছে। সাধারণত প্রতি এক মিলিবার চাপহ্রাসে পানির উচ্চতা বাড়ে প্রায় এক সেন্টিমিটার। কেন্দ্রে যদি চাপ-ঘাটতি ৫০ মিলিবার হয়, তবে সেখানে পানির উচ্চতা হবে ৫০ সেন্টিমিটার। চাপহ্রাস এবং বাতাসের মধ্যে বাতাস জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টিতে অনেক বেশি কার্যকর। চাপহ্রাসের অবদান প্রায় ১০% এবং বাতাসের অবদান প্রায় ৯০%।

বাতাস

বাতাস পানির সাথে ঘর্ষণের মাধ্যমে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। এ সৃষ্টি প্রধানত দু'প্রক্রিয়ায় হয়। যেমন : পানি প্রবাহ (water current) এবং ঢেউ (wave)। বাতাস পানিকে আপন দিকে ঠেলে পানি প্রবাহের উৎপত্তি করে, তবে পানি প্রবাহের গতি বায়ুর গতির প্রায় ৩%। কারণ পানি বায়ুর তুলনায় প্রায় ১০০০ গুণ বেশি ঘন। পানি প্রবাহে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমুদ্রতল পর্যন্ত সমস্ত পানি অংশ নাও নিতে পারে। তা নির্ভর করবে পানির গভীরতা (এ সম্পর্কে পরে

আলোচনা করা হয়েছে) এবং বাতাসের গতি ও বাতাসের দীর্ঘতার (sustainability of winds) উপর। বাতাসের গতি কম এবং স্বল্পকালীন হলে পানি প্রবাহ সমুদ্রের উপরিভাগেই বেশি সীমিত থাকে।

পানি প্রবাহ যখন উপকূলে আঘাত হানে, তখন এই প্রবাহ উপকূল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় ; ফলে পানির উচ্চতা বাড়তে থাকে এবং উপকূল এলাকা প্লাবনের সম্মুখীন হয়। তখন বলা হয় জলোচ্ছ্বাসে উপকূল ডুবে গেছে বা ডুবে যাবার আশংকা রয়েছে। তবে এখানে পরিষ্কার করা উচিত যে শুধু উপকূলেই জলোচ্ছ্বাস হয় না ; ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবাধীন সমগ্র সামুদ্রিক অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়।

পানি প্রবাহ সৃষ্টির সাথে সাথে বাতাস সমুদ্রে ঢেউয়েরও সৃষ্টি করে। পানি প্রবাহের তুলনায় ঢেউ এর গতি অধিকতর দ্রুত। ঢেউ উপকূলে আঘাত হেনে ভেঙ্গে যায় (wave breaking) এবং ইতোমধ্যে পানি প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট পানির গভীরতা/উচ্চতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পানির এ ঢেউকে অনেকটা ঝাপটা বাতাসের সাথে তুলনা করা যায়। এর স্থায়ীকাল প্রায় ১ থেকে ২০ মিনিট। পক্ষান্তরে পানি প্রবাহের জলোচ্ছ্বাস ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন স্থায়ী হয় এবং এটিই আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং উদ্বেগের প্রধান কারণ। পানি প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের সাথে ঢেউ যোগ দিলে আঘাত প্রাপ্ত এলাকার দুর্গতি অনেক বেড়ে যায়। ঢেউ বেশি উঁচু না হলে অনেক সময় গাছপালা বা দেয়ালের গায়ে পানির দাগ দেখে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা নির্ণয় করা হয়। তবে এ দাগ সাধারণ পানি প্রবাহ না ঢেউয়ের সৃষ্টি তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। ঢেউ পানি প্রবাহ বা পানির উপর দিয়ে চলে। তাই ঢেউ কর্তৃক সৃষ্ট দাগ পানি প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট দাগের উপরেই থাকবে। পানি প্রবাহের তুলনায় ঢেউ এর দ্বারা উৎপন্ন জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস দেয়া অনেক কঠিন এবং জটিল। তাই জলোচ্ছ্বাসের প্রায় সকল মডেলে ঢেউকে বাদ দেয়া হয় এবং পানি প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসেরই পূর্বাভাস দেয়া হয়। আমরা জলোচ্ছ্বাসের যতো পূর্বাভাস দেখি, তা পানি প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস।

বৃষ্টি

ঘূর্ণিঝড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। স্থানীয় বৃষ্টি বিশেষ করে স্থলভাগে বন্যার সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসে অল্প হলেও অবদান রাখতে পারে। তবে বৃষ্টি অনেক উপকারেও আসে। বৃষ্টি পানি পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে। আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বিশেষ করে মৌসুমী নিম্নচাপের দরুন। অনেক সময় দেখা গেছে যে, যে বছর বেশি ঘূর্ণিঝড় হয়নি, সে বছর দেশের সামগ্রিক পানি পরিস্থিতি তেমন ভাল ছিল না এবং শস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

উপরে বর্ণিত জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির বিভিন্ন কারণের মধ্যে পানি প্রবাহ সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির কারণ। ঢেউ পানি প্রবাহের জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। চাপহ্রাস সামান্য অবদান রাখে। তার চেয়েও কম অবদান বৃষ্টির। তাই জলোচ্ছ্বাসসম্পর্কিত সমগ্র আলোচনা মূলত পানি প্রবাহ নিয়েই।

পর্যায়

উপকূল এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আয়ুষ্কালকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় : অগ্রদূত (Forerunner), জলোচ্ছ্বাস (Surge) এবং পুনরোদয় বা দোলন (Resurgence)।

উপকূলে জলোচ্ছ্বাসের প্রাথমিক পর্যায় হলো অগ্রদূত জলোচ্ছ্বাস। এ পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস উপকূলে পৌঁছানোর আগে পানির উচ্চতা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। প্রাক-উপগ্রহকালে যখন সার্বক্ষণিক ঘূর্ণিঝড় পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ ছিল না, তখন অগ্রদূত জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়ের আগাম পূর্বাভাসে বেশ সহায়ক হতো। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের এ. জলোচ্ছ্বাস উদ্বেগের কারণ নয়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো আসল জলোচ্ছ্বাস। এ সময় পানির উচ্চতা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ঘূর্ণিঝড় উপকূলের খুবই কাছাকাছি এসে যায় বা উপকূলে আঘাত হানে। এ জলোচ্ছ্বাসই ক্ষয়-ক্ষতির মূল এবং প্রধান কারণ। তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে পানির পুনরোদয় বা দোলন। ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানার পর এর শক্তি কমতে থাকে এবং জলোচ্ছ্বাসও আস্তে আস্তে কমে যায়। সমুদ্রের বাতাস বহুলাংশে হ্রাস পায়। কিন্তু পানিতে যে দোলনের সৃষ্টি হয়, তা ততো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় না। হঠাৎ করে উপকূলের কোনো কোনো অঞ্চলে পানির উচ্চতা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। এ অবস্থাকে বলা হয় জলোচ্ছ্বাসের পুনরোদয়। এটি অনেকটা সমুদ্রে বা নদীতে জাহাজের পশ্চাতের ঢেউয়ের উপকূলে বা নদীর তীরে আঘাত করার মতো। এর একটি ল্যাবরেটরি উদাহরণও দেয়া যেতে পারে। একটি লম্বা ট্যাংকে পানি ভর্তি করে যদি একপাশ উঠানো-নামানো হয় তাহলে পানিতে দোলনের সৃষ্টি হবে। উভয় প্রান্তে পালাক্রমে পানির উচ্চতা. বাড়বে। এখন যদি পানির ট্যাংক স্থির রাখা হয়, তখন দেখা যাবে যে পানি তবু দুলছে। এ দোলনকে বলা হয় মুক্ত দোলন (free oscillation) বা মুক্ত ঢেউ (free wave)। সমুদ্রের আকার, গভীরতা, ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির উপর এ দোলন নির্ভরশীল। মাটির সাথে ঘর্ষণের ফলে পানি আস্তে আস্তে শক্তি হারায় এবং শেষ পর্যন্ত কোনো বল না থাকলে পানি শান্ত হয়ে পড়ে।

ইদানীংকালে জলোচ্ছ্বাসকে আর আগের মতো তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় না। তাই আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তিনটি পর্যায়কেই জলোচ্ছ্বাস বলে ধরে নেবো।

সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস

কোনো স্থানে জলোচ্ছ্বাসের সময়-ইতিহাস (time history) অর্থাৎ সময়ের সাথে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতার পরিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, জলোচ্ছ্বাস শূন্য মান হতে একটি উচ্চসীমায় পৌঁছে ; পরে আবার আস্তে আস্তে নামতে থাকে। প্রত্যেক স্থানের জন্য তাই জলোচ্ছ্বাসের একটি উচ্চসীমা আছে এবং তা ঘটে থাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে। উপকূলের বিভিন্ন স্থানের জলোচ্ছ্বাসের সময়-ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন ; সর্বত্র সমান নয়। আবার উচ্চসীমা সব জায়গায় একই সময় সংঘটিত হয় না। আঘাতপ্রাপ্ত সমগ্র উপকূলে সবচেয়ে

উঁচুতে পৌঁছানো জলোচ্ছ্বাসকে বলা হয় সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস (Highest surge or peak surge)। সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে। এ সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস বিভিন্ন উৎপাদকের (factors) উপর নির্ভরশীল। উৎপাদক নির্ভরশীলতা প্রধানত দু'রকমের ঘূর্ণিঝড়ভিত্তিক এবং অঘূর্ণিঝড়ভিত্তিক।

ঘূর্ণিঝড়ভিত্তিক নির্ভরশীলতা

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে জলোচ্ছ্বাসের প্রধান কারণ ঘূর্ণিঝড়ের চাপ–ঘাটতি এবং বাতাস। এদের উপর জলোচ্ছ্বসের উচ্চতা বেশি অংশে নির্ভরশীল। তবে ঘূর্ণিঝড়ের অন্যান্য প্যারামিটারের উপরও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা নির্ভর করে ; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান প্যারামিটার হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের— (১) ডানপাশ বনাম বামপাশ (২) গতিপথ ও আঘাত স্থান (৩) গতি (৪) সর্বোচ্চ–বাতাস ব্যাসার্ধ (৫) আঘাতের সময় (৬) বিস্তৃতি।

ডানপাশ বনাম বামপাশ

উত্তর গোলার্ধে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ঘূর্ণিঝড়ের ডান পাশে সবচেয়ে বেশি (ঘূর্ণিঝড় উপকূলের দিকে ধাবিত এবং দর্শক উপকূলের দিকে মুখ করে সমুদ্রে দাঁড়িয়ে)। যেহেতু এ গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (anticlockwise) ঘুরে, সেজন্য ডানদিকের বাতাস পানিকে ঠেলে উপকূলের দিকে ধাবিত করে। আবার বামপাশের বায়ু উপকূল থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত বলে পানি উপকূল এলাকা থেকে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। এতে কখনো কখনো ঋণাত্মক জলোচ্ছ্বাসের (negative storm surge) সৃষ্টি হয় ; অর্থাৎ পানির উচ্চতা গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের (mean sea level-MSL) নিচে চলে যায় (গড় সমুদ্রপৃষ্ঠকে শূন্য উচ্চতা ধরে)। ঋণাত্মক জলোচ্ছ্বাস পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত দেশের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে ঋণাত্বক জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। কারণ ঘূর্ণিঝড় যখন পূর্বাঞ্চলে (মনে করি মেঘনা মোহনায়) আঘাত করে তখন দেশের পশ্চিমাঞ্চল সমুদ্রাভিমুখী বাতাসের আওতায় পড়ে। ঋণাত্বক জলোচ্ছ্বাসের কারণে নদীতে পানির উচ্চতাও কমে যায়, কারণ নদী থেকে পানি সমুদ্রমুখী বায়ুর প্রভাবে অতি দ্রুত সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে নদীতে জলযানের চলাফেরার অসুবিধা দেখা দিতে পারে। নদীতে মাছের চলাফেরাও বিঘ্নিত হতে পারে।

গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর পানির উচ্চতাকে ধনাত্মক জলোচ্ছ্বাস (positive storm surge) বলা হয়। ধনাত্মক জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়ের ডানদিকে পরিলক্ষিত হয়। এ জলোচ্ছ্বাসই ক্ষয়–ক্ষতির মূল কারণ। আসলে সাধারণভাবে জলোচ্ছ্বাস বলতে ধনাত্মক জলোচ্ছ্বাসকেই বুঝায় এবং অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে জলোচ্ছ্বাস বলতে আমরা ধনাত্মক জলোচ্ছ্বাসই বুঝবো। ঘূর্ণিঝড়ের ডানপাশে জলোচ্ছ্বাস বেশি হবার আরেকটি প্রধান কারণ হলো এ পাশে বাতাসের গতি বাম পাশের তুলনায় বেশি। এ সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড়ের ডানপাশের তুলনায় বামপাশে জলোচ্ছ্বাস বেশি ; কারণ এ গোলার্ধে বায়ু ঘড়ির কাঁটার দিকে (clockwise) ঘুরে।

গতিপথ

জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় খুলনা এলাকায় আঘাত হানলে যতটুকু জলোচ্ছ্বাস হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি জলোচ্ছ্বাস হয় যদি একই ঘূর্ণিঝড় মেঘনা নদীর মোহনায় বা তার ঠিক পশ্চিমে আঘাত করে। এর একটি মূল কারণ হলো গতিপথ বা আঘাত স্থান এবং বাংলাদেশের পূর্ব উপকূলের (চট্টগ্রাম উপকূল) মধ্যবর্তী সমুদ্র এলাকার বিস্তৃতি। খুলনার দিকে আঘাত করলে এ বিস্তৃতি হয় তুলনামূলকভাবে বেশি। ফলে পানি ঘুরপাক খাবার বা অন্যদিকে প্রবাহের জন্য অধিক জায়গা পায় এবং সমস্ত পানি উপকূলে আঘাত করে না ; কিছু পানি ঘুরে দক্ষিণ দিকেও প্রবাহিত হতে পারে। সুতরাং জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা এবং প্রকোপ বহুলাংশে কমে যায়। পক্ষান্তরে মেঘনা এলাকায় আঘাত করলে উপরিউক্ত বিস্তৃতি কমে আসে এবং পানি ঘুরপাক খাবার সুযোগ বা জায়গা পায় না। ফলে বেশিরভাগ পানি উত্তরে উপকূলের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হয়। এরূপ ক্ষেত্রে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

সব ঘূর্ণিঝড়ই যে উপকূলে আঘাত হানবে, তেমন কোনো কথা নয়। যেমন উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে ঘূর্ণিঝড় কখনো কখনো উপকূলে আঘাত না হেনে উপকূলের প্রায় সমান্তরালে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। ভারতের পূর্ব উপকূলেও এ রকম কিছু উদাহরণ দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ কম হয়। এর প্রধান দুটি কারণ হলো ডানপাশে পানির চলাচলের জন্য প্রচুর জায়গা এবং অধিকতর গভীর পানি (পানির গভীরতার উপর জলোচ্ছ্বাসের নির্ভরতা নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে)।

ঘূর্ণিঝড় আবার সমুদ্রগামীও হতে পারে। যেমন মধ্য–আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের ঘূর্ণিঝড়। এখানকার অনেক ঘূর্ণিঝড় আটলান্টিক মহাসাগর হতে মধ্য–আমেরিকার স্থলভাগ পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। বঙ্গোপসাগরেও কিছু উদাহরণ রয়েছে। যেমন মিয়ানমার পার হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ন্ত ঘূর্ণিঝড়। স্থলভাগ থেকে জলভাগে পড়ন্ত ঘূর্ণিঝড়ের ডানপাশে (দর্শক স্থলভাগে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে) বাতাস হয় সমুদ্রমুখী। এখানে ঋণাত্মক জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। আর বামদিকে থাকে ধনাত্মক জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির আশংকা। সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে আগত ঘূর্ণিঝড় স্থল থেকে সমুদ্রের দিকে অগ্রসরগামী ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় অনেক বেশি জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে।

গতি

ঘূর্ণিঝড়ের চলার গতি বাড়লে সাধারণত জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাও বাড়ে। উপকূলের দিকে ধাবমান ঘূর্ণিঝড়ের গতি বাড়লে জলোচ্ছ্বাস বিশেষ করে সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ একটি ঘূর্ণিঝড় একটি নির্দিষ্ট গতিতে উপকূলের দিকে অগ্রসর হলে যে সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস হবে, একই ঘূর্ণিঝড় আরো দ্রুতগতিতে চললে সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গতির একটি সীমা আছে, যার পরে সর্বোচ্চ গতি কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

গতির সাথে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধির ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যেতে পারে : ডানপাশে ঘূর্ণিঝড়ের দ্রুততর গতি বাতাসের গতির সাথে যোগ হয়ে পানিকে আরো দ্রুত এবং বেশি পরিমাণে উপকূলের দিকে ঠেলে দেয়।

স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ের বেলায় সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস গতি বৃদ্ধির সাথে কমতে থাকে। আর উপকূলের সাথে সমান্তরাল বা প্রায় সমান্তরাল গতিপথ জলোচ্ছ্বাসের উপর তেমন প্রভাব ফেলে না।

সর্বোচ্চ-বাতাস ব্যাসার্ধ

সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের স্থান সাধারণত সর্বোচ্চ–বাতাস ব্যাসার্ধের উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ–বাতাস ব্যাসার্ধ পরিমাণ দূরত্বে বা আশেপাশে সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। কারণ সহজেই অনুমেয়। সর্বোচ্চ–বাতাস ব্যাসার্ধে বাতাস হয় সর্বোচ্চ এবং যেখানে বাতাস সর্বোচ্চ সেখানে জলোচ্ছ্বাসও সর্বোচ্চ। কাজেই ঘূর্ণিঝড়ের এ ব্যাসার্ধ জানতে পারলে উপকূলের কোন স্থানে সবচেয়ে বেশি জলোচ্ছ্বাস হবে, তা প্রাথমিকভাবে বলা যেতে পারে। তবে অন্যান্য কারণে এ স্থানের পরিবর্তন হতে পারে।

আঘাতের সময়

সাধারণত সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের কাছাকাছি সময়ে (ঐ সময় বা কিছু আগে–পরে) হয়ে থাকে।

বিস্তৃতি

ঘূর্ণিঝড়ের বিস্তৃতির (size) উপর সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস তেমন নির্ভর করে না ; তবে বিস্তৃতি বেশি হলে স্বভাবতই আঘাত প্রাপ্ত উপকূলের দৈর্ঘ্য বাড়বে এবং বেশি এলাকা জুড়ে জলোচ্ছ্বাস দেখা দিবে।

অঘূর্ণিঝড়ভিত্তিক নির্ভরশীলতা

এতক্ষণ ঘূর্ণিঝড়ের প্রধান প্রধান প্যারামিটারের উপর জলোচ্ছ্বাসের নির্ভরতা নিয়ে আলোচনা করা হলো। এখন অঘূর্ণিঝড় অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় ব্যতিরেকে অন্যান্য প্যারামিটারের উপর জলোচ্ছ্বাসের নির্ভরতা নিয়ে আলোকপাত করা হবে। আসলে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে আর অঘূর্ণিঝড়জনিত কারণ জলোচ্ছ্বাসের পরিবর্তন আনয়ন করে।

অঘূর্ণিঝড় প্যারামিটারের তালিকা বেশ লম্বা। তবে প্রধান প্রধান প্যারামিটার হচ্ছে :

(১) সমুদ্রের গভীরতা
(২) সমুদ্রের আকার (বংগোপসাগরের সরুতা, চট্টগ্রাম উপকূলের প্রভাব এবং গতিপথ ও চট্টগ্রাম উপকূল)
(৩) জোয়ারভাটা

(৪) নদ-নদীর অবস্থান
(৫) দ্বীপের উপস্থিতি
(৬) পানির পিছুন প্রভাব।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এসব কারণ নিয়েই এখন আলোচনা করা হবে।

সমুদ্রের গভীরতা

জলোচ্ছ্বাস সমুদ্রের গভীরতার সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। পানির গভীরতা কম হলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বেশি হবে আর বেশি হলে উচ্চতা কম হবে। ঘূর্ণিঝড় যখন গভীর সমুদ্রে এবং উপকূল থেকে অনেক দূরে, তখন সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা অতি সামান্য। কারণ তখনো ঘূর্ণিঝড় পুরোপুরি শক্তিশালী হয়ে উঠেনি ; শক্তি আহরণ করছে। ফলে এর স্বল্প বাতাস সমুদ্রের গভীর পানিতে তেমন সাড়া জাগাতে পারে না। ঘূর্ণিঝড় যদি তখন শক্তিশালী হয়ে উঠেও, তথাপি এর দ্বারা গভীর সমুদ্রে তেমন প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। তাই এমতাবস্থায় জলোচ্ছ্বাস হয় মোটামুটি নগণ্য। বিকাশমান ঘূর্ণিঝড় যখন উপকূলের দিকে ধাবিত হয়, তখন তার শক্তি সঞ্চয় অব্যাহত থাকে। গভীর সমুদ্র থেকে স্বল্প গভীর উপকূল এলাকার দিকে অগ্রসরমান ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতি (এখন) বেশি হওয়ায় বাতাস প্রায় সমস্ত, কলামের (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমুদ্রতল পর্যন্ত) পানিকে নাড়া (stir) দিতে সক্ষম। ফলে পানি প্রবাহ এবং জলোচ্ছ্বাসে অংশগ্রহণকারী পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ পানি উপকূলে আঘাত হানলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বেড়ে যায়। এ ছাড়া সমুদ্রের গভীর অংশের জলোচ্ছ্বাস যখন স্বল্প গভীর উপকূলবর্তী এলাকায় পৌঁছে, তখন সাধরণ জ্ঞান থেকে বলা যায় যে, পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চল বিশেষ করে মেঘনা মোহনা এবং তার দক্ষিণাঞ্চলে পানি গভীরতা খুবই কম (কোথাও কোথাও ৫ মিটারেরও নিচে)। সেজন্য এ এলাকায় সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়।

বঙ্গোপসাগরের সরুতা

জলোচ্ছ্বাস সমুদ্রের সরুতার (convergence) সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। সরুতা বাড়লে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বাড়ে। বঙ্গোপসাগর উত্তর দিকে ক্রমশ সরু এবং এরই মাথায় বাংলাদেশ অবস্থিত। কোনো ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানলে জলোচ্ছ্বাসের পানি (surge water) প্রধানত দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে সমুদ্রে গভীরতার প্রভাবের মতোই সরুতার কারণে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বাড়ে।

চট্টগ্রাম উপকূলের প্রভাব

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূল বা পূর্ব উপকূল এবং মিয়ানমারের পশ্চিম উপকূল জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা পরিবর্তনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এ উপকূল অনেকটা দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম বরাবর কোনাকুণিভাবে অবস্থিত। এরূপ অবস্থান উত্তর দিকে বঙ্গোপসাগরের সরুতা

বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাঞ্চলের জলোচ্ছ্বাসের পানি এ উপকূল বেয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে বর্ধিত উচ্চতায় মেঘনা এলাকায় আঘাত হানে। এ উপকূল যদি পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থিত থাকতো, তখন কোরিওলিস বলের কারণে পানি ডানদিকে যাবার সুযোগ পেতো এবং জলোচ্ছ্বাস মেঘনা এলাকায় এতো ভয়ানক আকার ধারণ করতে পারতো না। যেমনটি দেখা যায় উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে। সেখানে ঘূর্ণিঝড় পূর্বদিক থেকে (আটলান্টিক মহাসাগর হতে) উপকূলে আঘাত হানলে পানি উত্তর দিকে প্রবাহিত হবার জন্য প্রচুর জায়গা পায়। জলোচ্ছ্বাসের গাণিতিক ও কম্পিউটার মডেল থেকে দেখা গেছে যে চট্টগ্রাম উপকূল যদি উত্তর-দক্ষিণে থাকে তাহলে এ এলাকায় শূন্য সরুতার জন্য জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা কম হতো। অথবা যদি বর্তমান চট্টগ্রাম উপকূল আরো পূর্বে থাকতো, তাহলে পূর্বদিকে বেশি জায়গা থাকার কারণে এবং কোরিওলিস বলের প্রভাবে সকল পানি উত্তর দিকে আঘাত না হেনে কিছু পরিমাণে পূর্বদিকে চলে যেতো। ফলে আমাদের এলাকায় জলোচ্ছ্বাস তেমন বৃদ্ধি পেতো না।

গতিপথ ও চট্টগ্রাম উপকূল

বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড়ই দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বাংলাদেশে আঘাত হানে। ফলে বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক সরুতা ছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এবং চট্টগ্রাম উপকূলের মধ্যবর্তী স্থানে এক প্রকারের কৃত্রিম সরুতার সৃষ্টি হয়। এ কারণেও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

জোয়ারভাটা

জোয়ারভাটা (tide) জলোচ্ছ্বাসের উপর অনেক প্রভাব ফেলে। জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বৃদ্ধিতে এর প্রভাব মারাত্মক।

জোয়ারভাটা একটি বিশদ বিষয়। এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। জলোচ্ছ্বাসের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ ধারণার জন্য যতটুকু দরকার, আলোচনা অনেকটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

পৃথিবীতে জোয়ারভাটার সৃষ্টি হয় পৃথিবীর উপর চন্দ্র-সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে। আমরা জানি প্রত্যেক বস্তু একে অন্যকে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করে। যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে এ আকর্ষণ-বল নির্ভর করে সরাসরি উভয়ের ভরের উপর এবং বিপরীতভাবে উভয়ের দূরত্বের বর্গের উপর। অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবীর উপর চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ অনেক বেশি এবং জোয়ারভাটা প্রধানত চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণেই হয়ে থাকে। আবার চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্যের আকর্ষণের প্রায় দ্বিগুণের বেশি। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের অনুপাত প্রায় ৯ : ৪।

জোয়ারভাটা সমুদ্রের পানিতে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে (গলিত পদার্থে) এবং বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হয়। তবে আমরা এখানে সামুদ্রিক জোয়ারভাটা নিয়েই আলোচনা করবো এবং বেশিরভাগ আলোচনা হবে চন্দ্রসম্পর্কিত।

জোয়ারভাটা কিভাবে হয় গণিতের সাহায্য ছাড়া তার পুরোপুরি ব্যাখ্যা দেওয়া খুবই কঠিন। তবু অতি সহজভাবে এর সৃষ্টির একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে চাঁদের আকর্ষণ সমান নয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে চাঁদের নিকটতম স্থানে এ আকর্ষণ সর্বাধিক। পানি তরল বিধায় এ নিকটতম স্থানের পানি অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশি ফুলে ওঠে এবং একটি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। একই সাথে পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে পানি এদিকে ধাবিত হয়। (স্থলের উপর আকর্ষণ থাকলেও যেহেতু স্থল কঠিন পদার্থ তাই স্থলে জোয়ারভাটা নেই)। পৃথিবী এবং চন্দ্রের নিয়ত ঘূর্ণনের ফলে 'নিকটতম' স্থানের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। একটু আগে যে স্থানটি ছিল নিকটতম, পরের মুহূর্তে তা আর 'নিকটতম' স্থান থাকছে না। ফলে সেখানে পানি আস্তে আস্তে নামতে থাকে এবং পরবর্তী 'নিকটতম' স্থানে পানির উচ্চতা বাড়তে থাকে। পানি নিচে নামতে নামতে একটা সর্বনিম্ন সীমায় পৌছায়। সমুদ্রের প্রতিটি স্থানে চন্দ্র ও পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে পানি এভাবে ওঠা-নামা (rise and fall) করে। এ ওঠা-নামাকে বলে জোয়ারভাটা। কোনো স্থানে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতাকে যথাক্রমে বলা হয় জোয়ার (high tide) এবং ভাটা (low tide)। জোয়ারভাটা ঢেউ আকারে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়ে উপকূলে আঘাত হানে।

এখানে উল্লেখ্য যে 'নিকটতম' স্থানের ঠিক বিপরীতেও একই সাথে জোয়ার দেখা দেয়। অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে দুটি বিপরীত স্থানে একই সময়ে জোয়ারভাটা দেখা দেয়। এর ব্যাখ্যা বেশ জটিল বিধায় এখানে বিষয়টি পরিহার করা হলো।

জোয়ারভাটার সৃষ্টি হয় প্রধানত গভীর সমুদ্রে যেখানে স্থলভাগের জন্য পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বা ঢেউয়ের চলার পথে তেমন কোনো বাধা থাকে না এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চাঁদের আকর্ষণ অনুভূত হয়। তবে গভীর সমুদ্রে জোয়ারভাটা তেমন বুঝা যায় না। কারণ সেখানে উচ্চতা থাকে অল্প। সমুদ্র তীরে বা নদীতে এটি স্পষ্ট দেখা যায়। উপকূলের নিম্নাঞ্চল আস্তে আস্তে পানিতে ভরে যায় এবং পরে আবার ধীরে ধীরে ভেসে উঠে। সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত নদীতে সমুদ্রের ফুলে ওঠা পানি ঢুকতে থাকে এবং নদী পানিতে প্রায় ভরে যায়। অনেক সময় নদীর তীর পানিতে উপচিয়ে যায়। এ অবস্থায় আমরা বলি নদীতে জোয়ার এসেছে যার জন্য ইংরেজি বিশেষ শব্দ Flood tide ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রে পানির উচ্চতা নামতে থাকলে নদীর পানিও ধীরে ধীরে বের হতে থাকে। তখন বলা হয় নদীতে ভাটা এসেছে, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Ebb tide। এভাবে সমুদ্রে জোয়ারভাটার সাথে নদীতে পানি প্রবেশ করে একটি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে, তারপর বের হতে হতে একটি সর্বনিম্ন উচ্চতায় দাঁড়ায়। এ ওঠা-নামা বা প্রবেশ-নির্গমন নিয়মিত চলতে থাকে।

কোনো কোনো নদীতে কখনো কখনো জোয়ারের পানি অনেকটা প্রাচীর বা দেয়ালের (wall) মতো ঢুকে। একে বলে 'বান' যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'বোর' (Tidal bore)। অবশ্য আমাদের দেশে আজকাল বোর শব্দও বেশ প্রচলিত। বাংলাদেশে মেঘনা নদী, ভারতের হুগলী ও নারমাদা নদী এবং পাকিস্তানের সিন্ধু নদীতে বান দেখা যায়। এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন নদীতেও বান পরিলক্ষিত হয়।

জোয়ারভাটার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতার বিয়োগফলকে এর বিন্যাস বা টাইডাল রেঞ্জ (tidal range) বলা হয়। অর্থাৎ সর্বোচ্চ উচ্চতা হতে সর্বনিম্ন উচ্চতাকে বিয়োগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা হলো জোয়ারভাটার বিন্যাস। স্থান ও সময় ভেদে বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ কোনো দুটি স্থানের বিন্যাস সাধারণত সমান নয়। আবার একই জায়গায় আজকের বিন্যাস কালকের বিন্যাসের সমান নাও হতে পারে। বিন্যাসের অর্ধেককে বলে বিস্তৃতি (amplitude)। কোনো স্থানে জোয়ারভাটার কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাস নেই। গড় বিন্যাসকেই ঐ স্থানের বিন্যাস হিসেবে ধরা হয়। পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্যের কেন্দ্র প্রায় একই রেখায় অবস্থিত হলে বিন্যাস হয় সর্বাধিক। তখন চন্দ্র এবং সূর্য একই সাথে একই দিকে আকর্ষণ করে। উভয়ের মিলিত আকর্ষণ হয় যোগমূলক (additive)। এ জোয়ারকে (সর্বোচ্চ জোয়ার) বলে ভরা কটাল (Spring tide)। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার সময় ভরা কটাল হয়। আবার চন্দ্র ও সূর্যের কেন্দ্র যখন পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রায় ৯০° কোণ উৎপন্ন করে, তখন উভয়ের আকর্ষণ হয় বিপরীতমুখী এবং বিন্যাস হয় সর্বনিম্ন। এ জোয়ারকে বলে মরা কটাল (Neap tide)। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যবর্তী সময়ে মরা কটাল দেখা যায়।

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের কয়েকটি স্থানের গড় ভরা কটাল এবং মরা কটালের বিন্যাস ৯.১ সারণিতে দেয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ বিন্যাস মেঘনা নদীর মোহনায় সন্দ্বীপের কাছাকাছি দেখা যায়। এখানকার বিন্যাস ৫ মিটারেরও অধিক।

সারণি ৯.১ : বাংলাদেশের উপকূলে ভরা কটাল ও মরা কটালের বিন্যাস।

স্টেশন	বিন্যাস মিটার (ফুট)	
	ভরা কটাল	মরা কটাল
হিরন পয়েন্ট	২.৪১ (৭.৯১)	১.০১ (৩.৩১)
জেফোর্টস পয়েন্ট	২.৪১ (৭.৯১)	০.৯৮ (৩.২১)
সুন্দরী কোটা	২.৩৮ (৭.৮১)	১.১০ (৩.৬১)
জেমস রীচ	২.৩৫ (৭.৭১)	১.১০ (৩.৬১)
চালনা রীচ	২.৩২ (৭.৬১)	০.৯৮ (৩.২১)
টাইগার পয়েন্ট	২.৪১ (৭.৯১)	০.৮৮ (২.৮৯)
পাতু (রাবনাবাদ চ্যানেল)	২.১০ (৬.৮৯)	২.০৪ (৬.৬৯)
ইলসাঘাট	২.০৫ (৬.৭২)	০.৯০ (২.৯৫)
সন্দ্বীপ	৫.১১ (১৬.৭৬)	২.৩১ (৭.৫৮)
সদরঘাট (চট্টগ্রাম)	৩.৫১ (১১.৫১)	২.০৭ (৬.৭৯)
নরম্যান পয়েন্ট	৩.৭৮ (১২.৪০)	১.৬৫ (৫.৪১)
কুতুবদিয়া	৩.২৯ (১০.৭৯)	১.২৮ (৪.২০)
কক্সবাজার	৩.০৫ (১০.০০)	১.২২ (৪.০০)
সেন্ট মার্টিন	২.৬৮ (৮.৭৯)	০.৯৮ (৩.২১)

জোয়ারভাটার আবার একটি নির্দিষ্ট দোলনকাল (period) আছে। সাধারণত এক জোয়ারের বা ভাটার সময় হতে অন্য জোয়ারের বা ভাটার সময় পর্যন্ত কালকে জোয়ারভাটার দোলনকাল (tidal period) বলা হয়। চন্দ্র ও পৃথিবী, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব, এদের ঘূর্ণনকাল, পৃথিবীর কক্ষপথের নতি (inclination), অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব ইত্যাদির উপর দোলনকাল নির্ভর করে। সে হিসেবে জোয়ারভাটার অনেকগুলো দোলনকাল আছে। কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক বছর। সংখ্যায় প্রায় কয়েকশত। দোলনকাল অনুযায়ী জোয়ারভাটার নামকরণ করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের আবার নির্দিষ্ট বিস্তৃতি আছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি জোয়ারভাটার একটি নির্দিষ্ট বিস্তৃতি ও একটি নির্দিষ্ট দোলনকাল আছে। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে এদের বেশিরভাগই গুরুত্বহীন (insignificant বা unimportant)। বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাতটি জোয়ারভাটা ব্যবহার করা হয়। এদের সংকেত এবং ইংরেজি নামকরণ ৯.২ সারণিতে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে চারটি দোলনকাল প্রায় অর্ধদিবস এবং তিনটির প্রায় একদিন। উদাহরণস্বরূপ, এম-টু (M_2) জোয়ারভাটার দোলনকাল ১২.৪২ ঘন্টা। অর্থাৎ ১২.৪২ ঘন্টা পরে কোনো স্থানে জোয়ার আসবে এম-টুর কারণে। এম-টুর উৎস হচ্ছে চন্দ্র। এস-টুর উৎস হচ্ছে সূর্য। কে-ওয়ানের কারণ চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি। অর্ধ-দিবসবিশিষ্ট জোয়ার দিনে দুবার আসে এবং একদিন বিশিষ্ট জোয়ার দিনে একবার। তবে প্রত্যেকটি জোয়ারভাটা পৃথকভাবে ঘটার কথা থাকলেও বাস্তবে কোনো স্থানে সবকটির মিলিত ফল (resultant) আমরা দেখতে পাই। জোয়ারভাটা মাপার যন্ত্র টাইড-গেজ (Tide gauge) দ্বারা সবকটির মিলিত উচ্চতা এবং সময় মাপা যায়।

সারণি ৯.২ : প্রধান সাতটি জোয়ারভাটা।

সংকেত	নাম	দোলনকাল (ঘন্টা)
M_2	Principal lunar	১২.৪২
S_2	Principal solar	১২.০০
N_2	Larger lunar elliptic	১২.৬৬
K_2	Luni-solar semi-diurnal	১১.৯৭
K_1	Luni-solar diurnal	২৩.৯৩
O_1	Principal lunar diurnal	২৫.৮২
P_1	Principal solar diurnal	২৪.০৭

বাংলাদেশে জোয়ারভাটা প্রধানত অর্ধদিবস কালের। এখানে এম-টু এবং এস-টুর প্রাধান্যই বেশি। বাংলাদেশ ও এর আশেপাশের উপকূলের কয়েকটি স্থানের এম-টু এবং এস-টু জোয়ারভাটার বিস্তৃতি ৯.৩ সারণিতে দেয়া হয়েছে। ৯.১ এবং ৯.৩ সারণিতে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে জোয়ারভাটার উচ্চতা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বাড়তে থাকে এবং সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে মেঘনা মোহনায়। তারপর আবার চট্টগ্রাম উপকূল ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে কমতে থাকে।

সারণি ৯.৩ : বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় এম–টু এবং এস–টু জোয়ারভাটার বিস্তার।

স্টেশন	অক্ষাংশ (উত্তর)/ দ্রাঘিমাংশ (পূ.)	এম–টু (মিটার)	এস–টু (মিটার)
প্যারাদীপ	২০.১৬/৮৬.৪১	০.৬২০	০.২৮০
খিদেরপুর	২২.৩৩/৮৮.১৮	০.৮০০	০.৩৮০
হিরন পয়েন্ট	২১.৪৩/৮৯.২৮	০.৭৯৮	০.৩৫২
টাইগার পয়েন্ট	২১.৫১/৮৯.৫০	০.৮২০	০.৩৭০
রাবনাদাব চ্যানেল	২২.০৪/৯০.২২	০.৭২০	০.৩০০
ইলসাঘাট	২২.৮৪/৯০.৩৯	০.৭৩৫	০.২৮৭
হাতিয়া	২২.২৯/৯০.৫৭	১.২৯০	০.৪৮০
সন্দ্বীপ	২২.২৯/৯১.২৫	১.৮৫৬	০.৬৯৮
নরম্যান পয়েন্ট	২২.১১/৯১.৪৯	১.৩৬০	০.৫৪০
সদরঘাট (চট্টগ্রাম)	২২.২০/৯১.৫০	১.৩৫৫	০.৪৭৯
কুতুবদিয়া	২১.৫২/৯১.৫০	১.২৬০	০.৫৬০
কক্সবাজার	২১.২৬/৯১.৫৯	১.০৬০	০.৪৬০
সেন্ট মার্টিন	২০.৩৭/৯২.১৯	০.৯০০	০.৪২০
আকিয়াব	২০.০৮/৯২.৫৪	০.৭৭৯	০.৩৪৫

জোয়ারভাটার সঠিক পূর্বাভাস দেয়া আজকাল বেশ সহজ ব্যাপার। কোনো স্থানের কয়েক বছরের জোয়ারভাটার রেকর্ড বিশ্লেষণ করে সে বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে পূর্বাভাস দেয়া হয়। পূর্বাভাস জোয়ারভাটা টেবিল বা টাইড টেবিলরূপে (tide table) প্রকাশ করা হয়। টাইড টেবিলে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের জন্য প্রায় এক বছরের এবং প্রতিদিনের পূর্বাভাস লিপিবদ্ধ থাকে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নিয়মিত টাইড টেবিল প্রকাশিত হয়।

জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারভাটা সম্পর্কে এতক্ষণকাল আলোচনা হতে এটি সহজেই অনুমান করা যায় যে উভয়ের মিলিত প্রভাব উপকূল এলাকা বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য খুবই ভয়ানক। উভয়ে অবশ্য একে অন্যের উপর অত্যন্ত জটিলভাবে কাজ করে গাণিতিক ভাষায় এ প্রক্রিয়াকে বলে "ননলিনিয়ার ইন্টারেকশন" (nonlinear interaction) যাকে আমরা 'অরৈখিক মিতষ্ক্রিয়া' বলতে পারি। গণিতশাস্ত্রে এটি একটি জটিল সমস্যা। জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারভাটার মিথষ্ক্রিয়া যোগমূলক হয় না। যেমন জোয়ারের উচ্চতা যদি ৫ মিটার হয় এবং জলোচ্ছ্বাস যদি ৫ মিটার হয়, তবে উভয়ের মিলিত উচ্চতা ঠিক ১০ মিটার হবে না। ১০ মিটারের কম–বেশি হবে। স্বল্প গভীর সমুদ্রে (যেমন : মেঘনা মোহনায়) এ মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাব বেশি। তবে এতো সূক্ষ্মতার মধ্যে না গিয়ে মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া হয় যে উভয়ের মিলিত ফল যোগমূলক। এতে তেমন উল্লেখযোগ্য ভুল হবে না। সে হিসেবে সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস যদি সর্বোচ্চ জোয়ারের সময় হয়, তাহলে এর ফলাফল হবে খুবই মারাত্মক। এ পানি উপকূলে আঘাত হানলে ক্ষয়–ক্ষতির পরিমাণ হবে ভয়াবহ। আমাদের দেশে এ ভয়াবহতা বেশি প্রকট আকার ধারণ করে, বিশেষ করে মেঘনা মোহনায় যেখানে

জোয়ারের সর্বোচ্চ উচ্চতা পরিলক্ষিত হয় এবং জলোচ্ছ্বাসও হয় সবচেয়ে বেশি। ১৯৭০ এবং ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আবার যদি জলোচ্ছ্বাস ভাটা বা সর্বনিম্ন জোয়ারের সময় সংঘটিত হয়, তাহলে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ অনেক কমে যায়; কারণ তখন উভয়ের ফল হয় বিয়োগমূলক।

নদ-নদীর অবস্থান

পৃথিবীর বৃহত্তম নদীমালা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এছাড়া এদেশে রয়েছে অনেক নদী-নালা। নদী উপকূলবর্তী এলাকায় জলোচ্ছ্বাসে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রথমত, নদী জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা কমাতে সাহায্য করে। উপকূল এলাকায় নদী না থাকলে পানি ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ না পেয়ে সমুদ্রতীরে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতো। জলোচ্ছ্বাসের একটি গাণিতিক মডেল হতে দেখা গেছে মেঘনা নদীর অনুপস্থিতিতে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা প্রায় ৩৪% বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, নদী দিয়ে জলোচ্ছ্বাসের পানি ঢুকে অভ্যন্তরীণ বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে নদীতে এবং আশেপাশের কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট এলাকা জলোচ্ছ্বসে প্লাবিত হয়। এ এলাকায় জলোচ্ছ্বাস সমুদ্রতীর থেকে ৬০ কিলোমিটারেরও অধিক ভেতরে প্রবেশ করার রেকর্ড রয়েছে। চাঁদপুরের নিকট জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের সময় মেঘনা মুখে জলোচ্ছ্বাসের প্রায় সমান উচ্চতায় পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়ত, নদীর পানি জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারভাটার সাথে ত্রিপক্ষীয় মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমুদ্রের পানির মোট উচ্চতাকে বৃদ্ধি করে। এ প্রভাব প্রধানত স্থানীয়। উপকূলের খুব কাছাকাছিই তা সীমাবদ্ধ। তবে নদীর পানি জলোচ্ছ্বাসের উপর তেমন প্রভাব ফেলার সুযোগ পায় না। কারণ বর্ষাকালে নদী যখন পানিতে টইটম্বুর, তখন ঘূর্ণিঝড় কদাচিৎ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে, ফলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা হয় অল্প। আবার বর্ষা-পূর্ব (এপ্রিল-মে) ও বর্ষোত্তর (অক্টোবর-নভেম্বর) কালে ঘূর্ণিঝড় যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন নদীতে পানি থাকে কম। যদি বর্ষাকালে বর্ষা-পূর্ব ও বর্ষোত্তরকালের মতো প্রবল ঘূর্ণিঝড় হতো, তাহলে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বর্তমানের চেয়ে আরো বৃদ্ধি পেতো। এরূপ না হওয়াটাই প্রকৃতির একটি আশীর্বাদ। চতুর্থত, সমুদ্রের 'ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট' (Back water effect) বা 'পানির পিছন প্রভাব' আমাদের দেশে নদীতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম একটি কারণ। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বীপের উপস্থিতি

বাংলাদেশে ছোট বড় অনেক দ্বীপ রয়েছে। এদের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তেমন বেশি নয়। জলোচ্ছ্বাসে সহজেই তলিয়ে যায় বা যেতে পারে। ১৯৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উরির চর পানিতে পুরোপুরি ডুবে যায়। ১৯৭০ এবং ১৯৮৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় চর জব্বারের উপর জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল যথাক্রমে প্রায় ৬ মিটার এবং ৩ মিটার। এ রকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

জলোচ্ছ্বাসের উপর দ্বীপের প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তেমন কিছু বলা যায় না। গাণিতিক মডেলের সাহায্যে এ নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। তবে সমুদ্রবিদ্যার সাধারণ জ্ঞান থেকে কিছু কিছু ধারণা করা যেতে পারে। যেমন :

(ক) দ্বীপগুলোর মধ্যে চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় দ্বীপের কারণে চ্যানেলে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে।

(খ) দ্বীপে আঘাতকৃত জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পারে যেভাবে সমুদ্রতীরে এসে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।

(গ) দ্বীপ অতিক্রম করে চলে আসা জলোচ্ছ্বাস যখন ঘূর্ণিঝড় শেষে আবার সমুদ্রে ফিরে যেতে থাকে, তখন দ্বীপ জলোচ্ছ্বাসের বহির্গমনে বাধা সৃষ্টি করে জলোচ্ছ্বাসের দীর্ঘতা বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রাথমিকভাবে মডেল থেকে দেখা গেছে যে মেঘনা মোহনায় অবস্থিত দ্বীপগুলো জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যদি দ্বীপ না থাকতো, তাহলে জলোচ্ছ্বাস মেঘনা নদী দিয়ে সোজা ভেতরে চলে যেতো। এতে অবশ্য অভ্যন্তরীণ বন্যার সম্ভাবনা ও প্রকোপ বৃদ্ধি পেতো।

পানির পিছন প্রভাব

নদীমুখে কোনো কারণে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে নদীতে পানি প্রবাহ মন্থর হয়ে পড়ে। উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে পানি প্রবাহের উপর এ প্রভাবকে আমরা বলি 'পানির পিছন প্রভাব' বা 'ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট' (Back water effect)। নদীমুখ দু'রকম হতে পারে : কোনো নদীতে পড়ন্ত অন্য নদীর মুখ (নদীতে পড়ন্ত নদী) এবং নদী-মোহনা (সমুদ্রে পড়ন্ত নদী)। তবে পানির পিছন প্রবাহ প্রধানত নদী-মোহনার দৃশ্য। আমাদের দেশে মেঘনা মোহনায় বর্ষাকালে কখনো কখনো এর প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করে। মেঘনা মোহনায় পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বন্যার পানি নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে ক্রমশ পানি জমা হতে থাকে, বন্যা দীর্ঘায়িত হয়, বন্যার পানি গভীরতা বৃদ্ধি পায়, নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়, অধিক পলি জমে এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে। মেঘনা মোহনায় পানির পিছন প্রভাব দেশের ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত অনুভূত হয়। আমাদের উপকূলে বিশেষ করে মেঘনা মোহনায় পানির পিছন প্রভাবের প্রধান কারণ চারটি। যেমন :

(ক) জোয়ারভাটা

(খ) জলোচ্ছ্বাস

(গ) মৌসুমী বায়ু

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি।

জোয়ারভাটা ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে মেঘনা মোহনায় পানির উচ্চতা বৃদ্ধি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। জোয়ারভাটা বিশেষ করে ভরা কটাল বন্যা পানি নিষ্কাশনে অনেক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালে প্রলয়ংকারী বন্যার

সময় পানির পিছন প্রভাব বন্যার পানি নিষ্কাশন বেশ দীর্ঘায়িত করেছিল। পানি প্রবাহেই শুধু বাধা দেয় না ; অনেক সময় পানি প্রবাহকে বিপরীতমুখী করে দেয় ; অর্থাৎ পানি হুড়মুড় করে সমুদ্র হতে নদীতে প্রবেশ করতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহের সময় সাগরের পানিকে তাড়া করে চট্টগ্রাম উপকূল ও মেঘনা মোহনার দিকে ঠেলে সেখানে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে। চতুর্থ কারণ অনেক বিলম্বিত প্রভাব ফেলতে পারে। গ্রীনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর প্রভাব আপাতত আমাদের জন্য তেমন উদ্বেগের কারণ নয়।

জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস

জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ংকারী ছোবল থেকে বাঁচার জন্য এর সঠিক পূর্বাভাস একান্ত আবশ্যক। জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাসের সাথে জোয়ারভাটারও পূর্বাভাস দেয়া প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আগে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। জোয়ারভাটার পূর্বাভাস মোটামুটিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তবে দুর্যোগ উপকূলের যে কোনো স্থানে আসতে পারে। সে হিসেবে প্রতি স্থানের জন্য জোয়ারভাটার পূর্বাভাস থাকা প্রয়োজন। এ রকম ক্ষেত্রে এক বা একাধিক টাইডেল স্টেশনের পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে পার্শ্ববর্তী স্থানের জন্য পূর্বাভাস দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এটি তেমন নির্ভরযোগ্য পন্থা নয়। এমতাবস্থায় গাণিতিক মডেলের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস খুবই কঠিন এবং জটিল। জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি এবং এর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্পর্কিত উপরের আলোচনা হতে এ বিষয়ে আঁচ করা যায়। পূর্বাভাসের সামান্য ভুলের জন্য অনেক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস তেমন উদ্বেগের কারণ নাও হতে পারে ; কিন্তু শেষ কয়েক সেন্টিমিটার বা ২/১ ফুট সবচেয়ে মারাত্মক। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অতিরিক্ত উচ্চতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্বাভাস অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাসে মূলত দুটি পন্থা ব্যবহার করা হয় : ইমপিরিক্যাল (Empirical) মডেল এবং গাণিতিক (Mathematical)/কম্পিউটার মডেল।

ইমপিরিক্যাল মডেল : এটি একটি অতি সহজ মডেল। এক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা ও অতীত উপাত্তের উপর নির্ভর করা হয়। এ পন্থায় প্রধানত কোনো স্থানে জলোচ্ছ্বাসের বহুদিনের উচ্চতা এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি প্যারামিটারের (যেমন : সর্বোচ্চ বাতাস, কেন্দ্রে চাপ-ঘাটতি, ঘূর্ণিঝড়ের গতি) মধ্যে একটি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা (empirical model) করা হয়। কখনো কখনো অঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত প্যারামিটারও ব্যবহার করা হয়। মডেলভেদে প্যারামিটার বিভিন্ন হতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাসের সময় এ সমস্ত প্যারামিটার মডেলে ‘ইনপুট’ (input) হিসেবে কাজ করে এবং ‘আউটপুট’ (output) হিসেবে বেরিয়ে আসে পূর্বাভাসকৃত জলোচ্ছ্বাস। বাংলাদেশের কয়েক বছরের জলোচ্ছ্বাস ও সর্বোচ্চ বাতাস নিয়ে সৃষ্ট একটি ইমপিরিক্যাল মডেল থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ৩.২ সারণিতে দেখা যেতে

পারে। ঘূর্ণিঝড়ের সর্বোচ্চ বাতাস জানা থাকলে সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ এ সারণি থেকে বলা যাবে।

ইমপিরিক্যাল মডেলকে উপাত্তভিত্তিক মডেলও বলা যেতে পারে। এ জাতীয় মডেল খুবই সহজ এবং অতি সহজভাবেই এগুলো ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এদের বেশ অসুবিধা এবং অপরিপক্কতা (shortcomings) রয়েছে। এ সকল মডেল ঘূর্ণিঝড় বা এবং সমুদ্রের অল্প কটি প্যারামিটার ব্যবহার করে। জলোচ্ছ্বাস বিভিন্ন কারণের উপর কিভাবে এবং কতটুকু নির্ভরশীল, এসব মডেলে তা অন্তর্ভুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। কখন, কোথায়, কি পরিমাণ জলোচ্ছ্বাস হবে, তা বলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। জলোচ্ছ্বাসের সময়-ইতিহাস (কোনো স্থানে সময়ের সাথে জলোচ্ছ্বাসের পরিবর্তন) এ জাতীয় মডেল হতে আশা করা যায় না। জোয়ারভাটার সাথে জলোচ্ছ্বাস কখন, কিভাবে, কোথায় এবং কতটুকু মিথষ্ক্রিয়া করবে উপাত্তভিত্তিক মডেল তা বলতে পারে না। উপকূলের প্রতিটি স্থানের জন্য একই মডেল ব্যবহার করা ঠিক নয় (যেমন, আমাদের দেশে প্রায়ই করা হয়)। যেমন একটি মডেল যদি চট্টগ্রামের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, সে মডেল চট্টগ্রামের জন্যই প্রযোজ্য ; অন্য এলাকার জন্য নয়। প্রত্যেক স্থানের জন্য আলাদা আলাদা মডেল থাকা উচিত। কিন্তু সঠিক উপাত্তের অভাবে তা সম্ভব হয় না। উপরে বর্ণিত এবং অন্যান্য কারণে উপাত্তভিত্তিক মডেল তেমন কার্যকর নয়। কিছুই না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভাল—উপাত্তভিত্তিক মডেল এ পর্যায়ের।

গাণিতিক মডেল : দ্বিতীয় এবং জটিল কিন্তু অনেকাংশে নির্ভরশীল উপায় হচ্ছে বায়ু ও তরল পদার্থের জন্য প্রযোজ্য গাণিতিক সমীকরণের সাহায্য নেয়া। ইংরেজিতে এ সমীকরণেগুলোকে বলা হয় 'হাইড্রোডাইনামিক সমীকরণ' (Hydrodynamic equations)। অনেক সময় হাইড্রোডাইনামিক মডেলও বলা হয়। নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র (Newton's second law of motion) এবং বস্তু-অক্ষয় (Conservation of mass) এ সকল সমীকরণের মূল। গণিতের প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়মে (Analytical solution) এদের বিস্তারিত এবং পুরোপুরি সমাধান সম্ভব নয়। কম্পিউটার এ অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে তুলেছে। সমীকরণের সমাধানের জন্য কম্পিউটারের সাহায্য নেয়ার জন্য এরূপ মডেলকে কম্পিউটার মডেলও বলা হয়। কম্পিউটার হতে ফলাফল (results or output) সংখ্যায় বা নিউমারিকস্-এ (numerics) বেরিয়ে আসে বলে কম্পিউটার মডেলকে অনেক সময় আবার নিউমারিক্যাল মডেলও (numerical model) বলা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশের জন্যও কয়েকটি নিউমারিক্যাল মডেল তৈরি করা হয়েছে।

জলোচ্ছ্বাসের বিভ্রান্তিকর নাম : জলোচ্ছ্বাসকে অনেক সময় জোয়ার বলে ভুল করা হয়। অনেকে 'টাইডাল বোর'ও বলেন। কখনো কখনো আবার বলা হয় 'টাইডাল সারজ'। উপরের আলোচনা হতে এটি এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার যে জলোচ্ছ্বাসের কারণ ঘূর্ণিঝড় (আবহাওয়াগত) এবং জোয়ারভাটার কারণ মাধ্যাকর্ষণ বল।

দশম অধ্যায়

পরিসংখ্যান

ঘূর্ণিঝড় পরিসংখ্যান এ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথম বিশ্ব পরিসংখ্যান বা বিশ্ব পরিস্থিতি (Global view), পরে স্থানীয় পরিসংখ্যান (Regional view) এবং পরিশেষে বঙ্গোপসাগর এবং এর পারিপার্শ্বিক দেশসমূহ বিশেষ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করা হবে। এসব পরিসংখ্যান নিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো এখানে যথাসম্ভব পরিহার করা হবে।

বিশ্ব পরিসংখ্যান

আগেই বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় ক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়। ক্রান্তীয় অঞ্চল প্রায় ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ হতে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে পৃথিবীর সব ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় জন্মায় না। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশ প্রায় ঘূর্ণিঝড় শূন্য। এটি একটি ব্যতিক্রম।

প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে প্রায় ৮০টি 'স্টরম' (Storm বা Cyclonic storm, সর্বোচ্চ বায়ু ৩৪ নট বা তদূর্ধ্ব, ১.২ সারণি ৫ম শ্রেণী বা তার উপর) পর্যায়ে পৌঁছায়। এদের আবার দুই তৃতীয়াংশ (প্রায় ৫৩টি) হারিকেন গতিসম্পন্ন হয়।

উত্তর গোলার্ধ বনাম দক্ষিণ গোলার্ধ (অক্ষাংশ নির্ভরশীল) : পৃথিবীর প্রায় ২২% ঘূর্ণিঝড় জন্ম নেয় বিষুবরেখা থেকে ১০° অক্ষাংশে মধ্যে, অর্থাৎ ১০° উত্তর এবং ১০° দক্ষিণ অক্ষাংশ–এ বেল্টের ভেতরে। প্রায় ৬৫% জন্মে উত্তর গোলার্ধে ১০–২০° অক্ষাংশের মধ্যে। বাকি ১৩% উভয় গোলার্ধের ২০° অক্ষাংশের পরে। কোরিওলিস বলের অনুপস্থিতির জন্য বিষুবরেখায় কোনো ঘূর্ণিঝড় জন্মায় না যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা এবং অক্ষাংশের সাথে তাদের বিস্তৃতি দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় উত্তর গোলার্ধে বেশি। পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ঘূর্ণিঝড় উত্তর গোলার্ধে সৃষ্টি হয়। উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সর্বশেষ সীমা প্রায় ৩৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পর অক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের জন্মস্থান। পক্ষান্তরে দক্ষিণ গোলার্ধে এ বিস্তৃতি প্রায় ১৭° অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর প্রধান কারণ হিসেবে উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে স্বল্প স্থলভাগের পরিমাণকে মনে করা হয়।

পূর্ব বনাম পশ্চিম গোলার্ধ : পূর্ব গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা পশ্চিম গোলার্ধের ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। এর প্রধান কারণ হচ্ছে দক্ষিণ আটলান্টিক এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশে ঘূর্ণিঝড়ের অনুপস্থিতি।

আঞ্চলিক পরিসংখ্যান

পৃথিবীর যে সব স্থানে ঘূর্ণিঝড় জন্মায়, তাদের প্রধান প্রধান স্থান ১০.১ চিত্রে দেখানো হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক একটি শতকরা পরিসংখ্যান অর্থাৎ কোথায় শতকরা কয়টি জন্মে তা ১০.১ সারণিতে দেয়া হলো এবং প্রধান প্রধান স্থানের পরিসংখ্যান নিয়ে নিচে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। উল্লেখ্য যে আঞ্চলিক এ পরিসংখ্যান স্টরম ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত।

সারণি ১০.১ : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ঘূর্ণিঝড়ের (স্টরমের) বিশ্ব শতকরা হিসাব।

স্থানের নাম	বিশ্বের শতকরা হিসাব
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর	১১.৬
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পূর্বাংশ	১৯.৮
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ	৩০.৭
ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ–পশ্চিমাংশ (১০০° পূ: দ্রাঘিমার পশ্চিমে)	১২.৪
অস্ট্রেলিয়া/ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ–পূর্বাংশ (১০০–১৪২° দ্রাঘিমা)	৮.২
অস্ট্রেলিয়া/দক্ষিণ–পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর (১৪২° পূ: দ্রাঘিমার পূর্বে)	১০.৮
বঙ্গোপসাগর	৫.৫
আরব সাগর	১.০
মোট	১০০

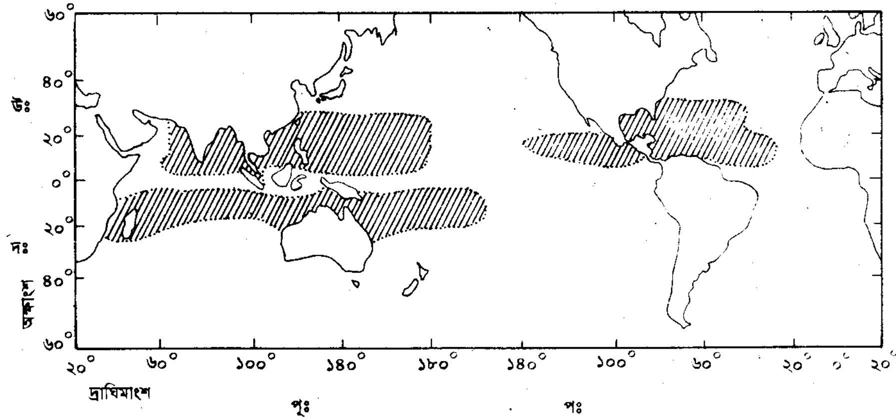

চিত্র ১০.১ : পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঘূর্ণিঝড় অঞ্চল (হেচ্‌ড়—Heatched)

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর

এখানকার ঘূর্ণিঝড় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য এলাকার চেয়ে আবহাওয়াবিদদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করেছে বলা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি, বিকাশ, গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ ও তথ্য উদঘাটন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ এলাকাতে করা হয়েছে। আরেকটি প্রায় সমগুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত ও তথ্যবহুল এলাকা হচ্ছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ, বিশেষ করে জাপান ও হাওয়াই এলাকা।

উত্তর আটলান্টিকের পূর্বাংশ (আফ্রিকা ও ইউরোপের পশ্চিম উপকূল) ঘূর্ণিঝড় শূন্য (এখানে অবশ্য অক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় প্রচুর জন্মায়)। ঘূর্ণিঝড় এলাকা হচ্ছে এ মহাসাগরের পশ্চিমাংশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ–পশ্চিম এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চল। এখানে বার্ষিক গড় প্রায় ১০। তবে বার্ষিক সংখ্যা খুবই উঠানামা করে ; বছরে ১ থেকে ২১। আগেই বলা হয়েছে, এ অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় হারিকেন নামে পরিচিত।

উত্তর আটলান্টিকে মে মাসের দিকে ঘূর্ণিঝড়–ঋতু (cyclone season) শুরু হয়। সংখ্যায় সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে সেপ্টেম্বরে এবং ঘূর্ণিঝড়কাল শেষ হয় ডিসেম্বরের দিকে। সময়ের সাথে এদের জন্মস্থানের পরিবর্তন ঘটে।

এ এলাকায় অর্ধেকের বেশি ঘূর্ণিঝড় আফ্রিকা হতে আগত পুবাল তরংগ থেকে জন্ম নেয়। কিছু সংখ্যক আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয়ে (ITCZ) জন্মায়। আফ্রিকার সাহেল (Sahel) অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের উঠানামার সাথে এখানকার ঘূর্ণিঝড় সংখ্যার বেশ সম্পর্ক রয়েছে।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পূর্বাংশ

উপগ্রহ যুগের আগে এ অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ের বার্ষিক গড় সংখ্যা ছিল প্রায় ৮.৬। উপগ্রহ যুগে এ সংখ্যা উন্নীত হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬.৫–এ, পৃথিবীর শতকরা প্রায় ২০ অংশ ; পৃথিবীতে এলাকাভিত্তিক দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর। এ অংশে বিশেষ করে ১৮০° দ্রাঘিমাংশের পূর্বে সমুদ্রগামী জাহাজের চলাচল অন্যান্য এলাকার তুলনায় কম বিধায় উপগ্রহ যুগের আগে অনেক ঘূর্ণিঝড় ধরা পড়েনি ; সেজন্য তখন সংখ্যা কম ছিল। কোনো ঘূর্ণিঝড় আজকাল উপগ্রহকে এড়াতে পারে না। তাই আগের তুলনায় বর্তমানে অধিকতর সঠিক উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে, যা পৃথিবীর সকল এলাকার জন্য অবশ্য প্রযোজ্য।

এখানে মাসিক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা আটলান্টিকের তুলনায় তেমন দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। মে মাসের দিকে ঘূর্ণিঝড়–ঋতু শুরু হয়ে নভেম্বরে শেষ হয় এবং সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌছায় আগস্টের শেষের দিকে। এ সময় সমুদ্রের বেশি তাপমাত্রা–এলাকা এবং আন্তঃক্রান্তীয় বলয় উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। আগেই বলা হয়েছে, এখানকার বেশ কিছু ঘূর্ণিঝড় আটলান্টিক মহাসাগর হতে মধ্য আমেরিকা অতিক্রান্ত পুবাল তরঙ্গ থেকে জন্ম নেয়।

এ এলাকার বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড় মধ্য আমেরিকার ঠিক পশ্চিমে জন্ম নেয়। এ ছোট্ট এলাকায় পানির তাপমাত্রা প্রায়ই ২৯° সেলসিয়াসের উপরে থাকে। প্রতি একক জায়গায় ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা এখানে সর্বোচ্চ। তাছাড়া এল নিনিওর প্রভাব এ অঞ্চলে বেশ পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ

এ অঞ্চলে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় জন্মায়। বার্ষিক গড় প্রায় ২৬, পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৩৮ অংশ। এটি একমাত্র এলাকা যেখানে সারা বছর ঘূর্ণিঝড় জন্মায়, যদিও ঋতুর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে সেপ্টেম্বর মাসে। শতকরা ৯১ ভাগ ৫–২২° অক্ষাংশের মধ্যে জন্ম নেয়। ১৪০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের আশেপাশে জন্মের হার সর্বাধিক।

প্রশান্ত মহাসাগরের এ অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহদাকার এবং প্রচণ্ডতম। তার কারণ এখানকার বিস্তৃত জলরাশি ও উচ্চ সমুদ্র তাপমাত্রা। জুলাই–অক্টোবরে কোনো কোনো স্থানে তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াসের উপরে থাকে। এখানকার ঘূর্ণিঝড়ের প্রায় ৮০% আন্তঃক্রান্তীয় বলয় এবং ১০% পুবাল তরঙ্গে জন্ম নেয়।

স্থানীয়ভাবে এ স্থানের ঘূর্ণিঝড়কে টাইফুন বলা হয়। এগুলো জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে প্রচুর ক্ষয়–ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাঝে মধ্যে এদের অল্প কয়েকটি চলতে চলতে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগর

দক্ষিণ–পশ্চিম ভারত মহাসাগর এলাকায় (১০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের পশ্চিমে) পর্যাপ্ত উপাত্তের অভাবে ঘূর্ণিঝড়ের জন্মবৃত্তান্তের রেকর্ড ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে। তবে রেকর্ডের উন্নতি হচ্ছে। এখানে বার্ষিক গড় প্রায় ১২.৪। ঘূর্ণিঝড় ঋতু সাধারণত অক্টোবরে শুরু হয়ে মে মাসে গিয়ে শেষ হয়। উল্লেখ্য, এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। সর্বোচ্চ সংখ্যা জানুয়ারির মাঝামাঝি দেখা যায় ; আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট্ট শিখর আসে মধ্য ফেব্রুয়ারিতে। ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে প্রায় ৮৫% ঘূর্ণিঝড় জন্মায়। তবে একেবারে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি (মূল ভূখণ্ড এবং ৫০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে)ঘূর্ণিঝড় নভেম্বরের আগে শুরু হয় না। এগুলো বেশিরভাগ মাদাগাস্কার এবং মূল ভূখণ্ডের মধ্যে মোজাম্বিক প্রণালীতে সীমাবদ্ধ থাকে। এ অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয়ের উত্তর–দক্ষিণে বিচরণের সাথে বেশ সম্পর্কিত।

অস্ট্রেলিয়া এলাকা

এ এলাকাকে ১০.১ সারণিতে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে : অস্ট্রেলিয়া/দক্ষিণ–পূর্ব ভারত মহাসাগর (১০০–১৪২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) এবং অস্ট্রেলিয়া/দক্ষিণ–পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর (১৪২° পূর্ব দ্রাঘিমার পূর্বে)। প্রধানত এলাকাটি অস্ট্রেলিয়ার উত্তর–পশ্চিম, উত্তর এবং উত্তর–পূর্বের জলরাশি নিয়ে ব্যাপৃত। এখানে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির প্রাথমিক স্থানসমূহ হচ্ছে টিমুর সাগর (Timor sea) এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তর–পশ্চিম উপকূলে দক্ষিণ–পূর্ব ভারত মহাসাগর, কার্পেনটারিয়া উপসাগর (Gulf of Carpentarin), কোরাল সাগর (Coral sea) এবং ফিজি এলাকা। প্রায় ৫০% ঘূর্ণিঝড় অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড হতে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে জন্মে।

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশে এ এলাকার সর্বাধিক ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম হয়, তবে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা উত্তর–পশ্চিম এলাকায় বেশি। শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জন্মায় ৫–১৯° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে।

অস্ট্রেলিয়া এলাকায় বেশিরভাগ ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয়ের 'দুর্যোগ' (disturbance) হতে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর–পশ্চিম উপকূলের অদূরে প্রায় ৫০% ঘূর্ণিঝড় এ মহাদেশের স্থলভাগে সৃষ্টি 'পূর্ব–ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগ' (Pre-cyclone disturbances) হতে জন্ম নেয়।

ঘূর্ণিঝড়–ঋতু অক্টোবরে শুরু হয়ে মে মাসের দিকে শেষ হয়। সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছায় ফেব্রুয়ারি–মার্চের মাঝামাঝি, তবে উত্তর–পশ্চিমাংশে জানুয়ারি মাসেও আরেকটি শিখর দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া এলাকার পূর্বাংশে (১৪২° দ্রাঘিমার পূর্বে) ঘূর্ণিঝড়ের বার্ষিক গড় সংখ্যা ৯.০ এবং পশ্চিমাংশে (১৪২° দ্রাঘিমার পশ্চিমে) ৬.৯।

অস্ট্রেলিয়ার উত্তর–পূর্বাংশ (অর্থাৎ দক্ষিণ–পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর) দ্বৈত ঘূর্ণিঝড়ের (Twin cyclones or cyclone pairs) জন্য বিখ্যাত। একই সাথে দুটি ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। তাদের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ প্রায় সমান ; তবে পার্থক্য হলো এরা বিষুবরেখার দুইপাশে অবস্থান করে, যার ফলে বিষুবরেখা অঞ্চলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবল পশ্চিমা বায়ুর (westerly wind) সৃষ্টি হয়। প্রতি বছর ২–৩টি দ্বৈত ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং প্রতি ২–৩ বছরে এদের উভয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। অনেকে মনে করেন এ পশ্চিমা বায়ু দখিনা দোলন ট্রিগার (Trigger) করতে সাহায্য করে।

বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উত্তর ভারত মহাসাগর অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর এলাকার ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অতিরিক্ত কিছু পরিসংখ্যান এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা করা হবে।

এ অঞ্চলে কবে থেকে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে, তার কোনো তথ্য জানা নেই। তবে সম্রাট আকবরের সময়কার আইন–ই–আকবরীতে (Ain-e-Akbari) ১৫৮৪ সালের একটি ঘূর্ণিঝড়ের উল্লেখ আছে যা বাংলাদেশের বরিশালে আঘাত করে। সম্ভবত এটি এ অঞ্চলের প্রথম রেকর্ডকৃত ঘূর্ণিঝড়। এতে প্রায় ২০০,০০০ লোক প্রাণ হারায়। তখনকার লোকসংখ্যা বিবেচনা করলে বর্তমান অনুপাতে মৃতের সংখ্যা অকল্পনীয়।

বাংলাদেশ–ভারত–পাকিস্তান উপমহাদেশে (এর পর থেকে শুধু উপমহাদেশ ব্যবহার করা হবে) ঘূর্ণিঝড়ের উপাত্ত সংগ্রহ এবং গবেষণা ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাপকভাবে শুরু হয় বলা চলে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতা মেরিন কোর্টের প্রেসিডেন্ট হেনরী পিডিংটন (Henry Piddington, President of Marine Courts, Calcutta) ঘূর্ণিঝড় নিয়ে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ও নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা শুরু করেন। এ পিডিংটনই 'সাইক্লোন' শব্দের প্রবর্তক যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর ভারত মহাসাগরে তখনকার দিনে সমুদ্রগামী বিভিন্ন জাহাজের আবহাওয়া লগ (weather logs) বা আবহাওয়া রেকর্ড ব্যবহার করে পিডিংটন

Library Dhaka

বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের বর্ণনা দেন। এ সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত বই 'The Sailor's Horn-Book for the Laws of Storms' প্রকাশ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত তৎকালীন জ্ঞানের এবং তথ্যের বিস্তারিত এ বইয়ে স্থান পায়। এ বইয়ে ১৮০০–১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের ৩৮টি এবং ১৮১১–১৮৪৭ পর্যন্ত আরব সাগরের ৭টি ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ দেয়া আছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তখনকার দিনে আবহাওয়া উপগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও বঙ্গোপসাগরে চলাচলরত বিভিন্ন জাহাজ হতে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বেশ বিস্তারিত উপাত্ত ও তথ্য পাওয়া যেতো। তখনো এ এলাকায় বেশ জাহাজ চলাচল করতো। ইলিওট (Eliot) তাঁর বই 'Hand-book of Cyclonic Storms in the Bay of Bengal' এ ১৮৭৬ সালের মহা বাখেরগঞ্জ ঘূর্ণিঝড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে সময় বঙ্গোপসাগরে চলমানরত ১৫টিরও অধিক সমুদ্র জাহাজের নাম উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর আবহাওয়া রেকর্ড তাঁর ঘূর্ণিঝড়টি বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তখন বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট কোনো ঘূর্ণিঝড়ের চোখের আড়ালে থাকার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে ; যা পৃথিবীর অন্যান্য সকল এলাকার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য নয় (উদাহরণ, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশ)।

১৮৭৭ সালে এইচ. এফ. ব্লানফোর্ড (H. F. Blanford, যিনি তখনকার বৃটিশ–ভারত সরকারের আবহাওয়া রিপোর্টার ছিলেন) বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির সাময়িকীতে (Journal of the Asiatic Society of Bengal) ১৭৩৭–১৮৭৬ সাল পর্যন্ত সময়কার রেকর্ডকৃত বঙ্গোপসাগরের ১১২টি ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন স্থানের জন্য ঋতুভিত্তিক পরিসংখ্যান বের করা, যা পরে ১৮৮৩ সালে 'Indian Meteorologist's Vade-Mecum' এ প্রকাশিত হয়। ব্লানফোর্ডের মতো এফ. চেম্বারস্ (F. Chambers) ১৬৪৮–১৮৮১ সাল পর্যন্ত আরব সাগরে সৃষ্ট ৭০টি ঘূর্ণিঝড়ের একটি তালিকা প্রকাশ করেন 'Indian Meteorological Memoirs'–এর দ্বিতীয় খণ্ডে।

১৮৭৬ সালে মহা বাখেরগঞ্জ ঘূর্ণিঝড়ের পর বৃটিশ–ভারত আবহাওয়া বিভাগকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং ১৮৭৭ সালের আগস্ট মাস থেকে সারা উপমহাদেশের জন্য দৈনিক আবহাওয়া তালিকা প্রস্তুত করা শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে ১৮৭৬ সালের এ ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে প্রায় ২০০,০০০ লোক মারা যায়, যার মধ্যে প্রায় ১০০,০০০ মৃত্যুবরণ করে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী রোগে বিশেষ করে কলেরায়। জলোচ্ছাসের উচ্চতা হয়েছিল প্রায় ৩ থেকে ১৩ মিটার (১০–৪০ ফুট)। দৈনিক আবহাওয়া তালিকা ব্যবহার করে জে. ইলিওট (J. Eliot) বঙ্গোপসাগরের জন্য ১৮৭৭–১৮৮১ সাল পর্যন্ত ৪৬টি এবং ১৮৮২–১৮৮৬ পর্যন্ত ৫৫টি ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এবং অন্যান্য তথ্যাদি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭৯ সালে ভারত আবহাওয়া বিভাগ ১৮৭৭–১৯৭০ সালের জন্য বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ, অন্যান্য উপাত্ত ও বিশ্লেষণলব্ধ ফলাফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করে যার নাম হচ্ছে 'Tracks of Storms and Depressions in the Bay of Bengal and the Arabian Sea 1877-1970'। উক্ত পুস্তকের উপাত্ত এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

উপমহাদেশের প্রতিটি দেশ স্ব-স্ব উপাত্ত প্রকাশ করেছে এবং করছে। তবে এক দেশ কর্তৃক প্রকাশিত উপাত্ত/গতিপথ অন্য দেশ কর্তৃক প্রকাশিত উপাত্ত/গতিপথের সাথে ঠিক মিলে না। বেশ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। তাই সঙ্গতি রক্ষার্থে ১৯৭০ সালের পরের উপাত্তও এখানে একই উৎস (ভারত আবহাওয়া বিভাগ) হতে নেয়া হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় ১৮৭৭-১৯৯৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পরিসংখ্যান স্থান পেয়েছে।

সাধারণত আলোচনার সুবিধার্থে ও অন্যান্য কারণে ঘূর্ণিঝড়ের পরিসংখ্যান বর্ণনায় ঘূর্ণিঝড়কে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন প্রকাশনায় বিশেষ করে যে উৎস থেকে এখানে উপাত্ত নেয়া হয়েছে, সেখানে এ তিনটি শ্রেণী ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রেণী তিনটি হচ্ছে :

(ক) নিম্নচাপ (Depression)

(খ) ঘূর্ণিঝড় বা স্টরম (Cyclonic storm)

(গ) প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (Severe cyclonic storm)।

প্রথমটি অর্থাৎ নিম্নচাপ দ্বারা প্রথম অধ্যায়ের ১.২ সারণির প্রথম চারটি শ্রেণী (লঘুচাপ, স্পষ্ট লঘুচাপ, নিম্নচাপ এবং গভীর নিম্নচাপ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটারের (১৭ মিটার/সেকেন্ড) নিচে। ঘূর্ণিঝড় দ্বারা আগের মত ১.২ সারণির পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত ঘূর্ণিঝড় বুঝাবে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের সাধারণ সংজ্ঞার সাথে এ শ্রেণীর কোনো রকম সন্দেহ উদ্রেকের সম্ভাবনা এড়াতে এখানে স্টরম ব্যবহার করা হবে। এ ক্ষেত্রে বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৬২ হতে ৮৭ কিলোমিটারের (১৭-২৪ মিটার/সেকেন্ড) মধ্যে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় দ্বারা একই সারণির ৬ এবং ৭ নং শ্রেণী দুটি (প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এবং হারিকেন গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়) বুঝানো হয়েছে। সর্বোচ্চ বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৮৮ কিলোমিটারের (২৪ মিটার/সেকেণ্ড) বেশি। এখানে পুনরায় উল্লেখ্য যে উপরে বর্ণিত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ের বর্ণনায় শেষোক্ত দুটি শ্রেণী অর্থাৎ স্টরম এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় স্থান পেয়েছে।

প্রবণতা

বঙ্গোপসাগরের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের দশ বছরভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান ১০.২ সারণিতে দেয়া হলো। নিম্নচাপ, স্টরম ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা এবং সবজাতের মিলিত সর্বমোট সংখ্যা এ সারণিতে দেয়া হয়েছে। এদের সুস্পষ্ট গতিপথ রয়েছে। কিছু কিছু ঘূর্ণিঝড়ের (নিম্নচাপের) কোনো গতিপথ নেই, কিন্তু বিভিন্ন তালিকায় তাদের উল্লেখ আছে, সেগুলোকে এখানে ধরা হয়নি। এগুলোর কিছু ছিল স্থির (কোনো গতিপথ ছাড়া), কিছু ছিল স্বল্প-স্থায়ী (একদিনের কম জীবনকাল), আবার কোনোটির কোনো সুস্পষ্ট গতিপথ ছিল না। এদের সবগুলো ছিল নিম্নচাপ পর্যায়ের এবং উপকূলে আঘাত না হেনে এরা সমুদ্রেই মারা পড়ে। গতিপথবিহীন এ জাতীয় ঘূর্ণিঝড়ের (নিম্নচাপের) সংখ্যা প্রায় ২৫০। এগুলোর জন্মকাল ১৮৯১-১৯৭০ সাল। ১৮৭৭-১৮৯০ এবং ১৯৭০-১৯৯৫ সালের জন্য এ রকম কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি ১০.২ : বঙ্গোপসাগরীয় ঘূর্ণিঝড় (১৮৭৭–১৯৯৫)।

সময়কাল (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
১৮৭৭–১৮৮০	৩৪	0	৩	৩	৩৭
১৮৮১–১৮৯০	৫৬	৩৯	১০	৪৯	১০৫
১৮৯১–১৯০০	৪৩	৩২	১৭	৪৯	৯২
১৯০১–১৯১০	৩৮	৩১	১২	৪৩	৮১
১৯১১–১৯২০	৪৪	২৮	১৪	৪২	৮৬
১৯২১–১৯৩০	৬৮	৪১	১৫	৫৬	১২৪
১৯৩১–১৯৪০	৭৫	৩০	২০	৫০	১২৫
১৯৪১–১৯৫০	৯৩	৩০	১২	৪২	১৩৫
১৯৫১–১৯৬০	৭৭	২১	১১	৩২	১০৯
১৯৬১–১৯৭০	৭৭	১৮	৩২	৫০	১২৭
১৯৭১–১৯৮০	৪৬	১৮	২৭	৪৫	৯১
১৯৮১–১৯৯০	৪৪	১৭	১৮	৩৫	৭৯
১৯৯১–১৯৯৫	২০	৫	৭	১২	৩২
সর্বমোট	৭১৫	৩১০	১৯৮	৫০৮	১২২৩

অন্যথা না বলে শুধু গতিপথওয়ালা ঘূর্ণিঝড় নিয়েই আলোচনা করা হবে।

সারণি ১০.২ হতে দেখা যাবে যে ১৮৭৭ হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে প্রায় ১২২৩টি ঘূর্ণিঝড় (গতিপথওয়ালা, উপর বর্ণিত গতিপথহীন ২৫০টি ঘূর্ণিঝড় বাদ দিয়ে) জন্মায়। সবজাতের ঘূর্ণিঝড়ের এ মিলিত সংখ্যায় (৬ নং কলাম) সময়ের সাথে পরিবর্তনের কোনো প্রবণতা (trend) পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সর্বোচ্চ সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় জন্ম নেয় ১৯৪১–১৯৫০ সালে(১৩৫টি) এবং সর্বনিম্ন ১৯৮১–১৯৯০ সালে (৭৯টি)। বর্তমান দশকের সংখ্যা আরো নিম্নগামী। ১৯৬১–১৯৭০ দশকের পর থেকে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা কমে আসছে। গতিপথহীন ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বিবেচনায় নিলেও তেমন কোনো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না।

পক্ষান্তরে স্টরম এবং তার বেশি শক্তিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যায় (১০.২ সারণি ৫ম কলামে) প্রায় ৪০ বছরের একটি দোলনকাল (period) রয়েছে বলে মনে হয়। ১৮৮১–১৮৯০ সময়কালকে একটি শিখর (৪৯টি) ধরলে তা কমে নেমে আসে ৪২টিতে ১৯১১–১৯২০ দশকে। তারপর বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬ তে (আরেকটি শিখরে) ১৯২১–১৯৩০ এর দশকে। প্রায় ৪০ বছর পরে। সেখান থেকে ৩২ এ নেমে আসে ১৯৫১–১৯৬০ দশকে এবং পরবর্তী শিখরে (সংখ্যায় ৫০টি) পৌঁছে ১৯৬০–১৯৭০–এর দশকে। এবারও শিখর থেকে শিখরে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ৪০ বছর। ১৯৬০–৭০–এর দশকের পর থেকে আবার নিম্নগামী প্রবণতা। নিম্নতম সংখ্যায় প্রায় একই রকম প্রবণতা মনে হয়। ১৯১১–১৯২০ দশকে

প্রথম নিম্নসংখ্যা ৪২ হতে পরবর্তী নিম্নসংখ্যা ৩২ এ পৌঁছায় প্রায় ৪০ বছর পর ১৯৫১–১৯৬০–এর দশকে। সে হিসেবে বর্তমান দশকে (১৯৯১–২০০০) সর্বনিম্ন হবার কথা এবং বাস্তবে তাই দেখাও যাচ্ছে। এ যাবৎ (১৯৯১–১৯৯৫) জন্ম নিয়েছে প্রায় ১২টি। প্রবণতা হতে মনে হচ্ছে পরবর্তী দশক (২০০০–২০১০) হতে আবার ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়া শুরু হবে। তবে এটি শুধু আন্দাজ মাত্র। উপরিউক্ত প্রবণতার সঠিক ব্যাখ্যা কি, তা বলা কঠিন। তবে এটি সৌর–কর্মের (solar activity) ৩৩ বছরকালীন সময় কালের সাথে সম্পর্কিত কিনা তা নিয়ে গবেষণা করে দেখা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে দশ বছরভিত্তিক মোট সংখ্যা ছাড়াও চলমান গড় (moving average) হতেও একই প্রবণতা দেখা যায়।

বঙ্গোপসাগরের ন্যায় আরব সাগরের জন্য দশবছরভিত্তিক একটি সারণি ১০.৩–এ দেখা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শুধু গতিপথওয়ালা ঘূর্ণিঝড়ের পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। গতিপথহীন ঘূর্ণিঝড়ের (যদি থাকে) কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। দেখা যাচ্ছে যে আরব সাগরে সবজাতের ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যায় (দশ–বছর ভিত্তিক, ৬ নং কলাম, সারণি ১০.৩) খুবই দুর্বল একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে। সর্বোচ্চ সংখ্যায় (৪০) পৌঁছায় ১৯৭১–১৯৮০–এর দশকে, বঙ্গোপসাগরের দশকের ঠিক অব্যবহিত পরেই। তারপর থেকে আবার বঙ্গোপসাগরের মতো নিম্নমুখী যাত্রা। স্টরম ও তদূর্ধ্ব বেগসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ে বঙ্গোপসাগরের ন্যায় তেমন কোনো দোলনকাল পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

সারণি ১০.৩ : আরব সাগরীয় ঘূর্ণিঝড় (১৮৭৭–১৯৯৫)।

সময়কাল (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
১৮৭৭–১৮৮০	০	০	১	১	১
১৮৮১–১৮৯০	৩	১	১০	১১	১৪
১৮৯১–১৯০০	২	৪	৬	১০	১২
১৯০১–১৯১০	৪	৬	৯	১৫	১৯
১৯১১–১৯২০	১	৫	৮	১৩	১৪
১৯২১–১৯৩০	৬	৬	৬	১২	১৮
১৯৩১–১৯৪০	১৪	৬	৫	১১	২৫
১৯৪১–১৯৫০	১৫	৪	৬	১০	২৫
১৯৫১–১৯৬০	১৫	২	৮	১০	২৫
১৯৬১–১৯৭০	১৭	৫	৭	১২	২৯
১৯৭১–১৯৮০	২১	৬	১৩	১৯	৪০
১৯৮১–১৯৯০	১৫	৩	০	৩	১৮
১৯৯১–১৯৯৫	৪	২	৩	৫	৯
সর্বমোট	১১৭	৫০	৮২	১৩২	২৪৯

আরব সাগরের সব ঘূর্ণিঝড় কিন্তু সেখানে জন্মায় না। এদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বঙ্গোপসাগর হতে আগত ; ১৮৭৭-১৯৯০ সাল পর্যন্ত আরব সাগরের প্রায় ২৪৯টি ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে প্রায় ৫৯টি বঙ্গোপসাগর হতে আগত। এগুলোর অধিকাংশই ভারতের স্থলভূমি অতিক্রম করে আরব সাগরে পতিত হয়। কোনোটি বঙ্গোপসাগরে স্টরম বা অধিক বেগসম্পন্ন হলেও আরব সাগরে গিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়। কখনো হয় ঠিক উল্টো। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ আরব সাগরে স্টরম বা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে রূপ লাভ করে।

উপমহাদেশে স্থলভাগেও কিছু কিছু ঘূর্ণিঝড় জন্মায়। ১৮৯১ হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত স্থলভাগে প্রায় ১২০টি ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। এগুলোর জন্মকাল জুন-সেপ্টেম্বর, যখন আন্তঃক্রান্তীয় মিলন বলয় উপমহাদেশের উপর অবস্থান করে। যেহেতু এ মিলন বলয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ, সে হিসেবে স্থলভাগেও ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হতে পারে। ঐ সময় মৌসুমীকাল হওয়াতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন স্থলভাগেও জলাশয়ের সৃষ্টি হয় যা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য জলীয়বাষ্পের একটি উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে বেশ কয়েকটি ঘূর্ণিঝড় স্থলভাগে (যেমন : চট্টগ্রাম এবং মিয়ানমার) সৃষ্টি হয়ে বঙ্গোপসাগরেও পতিত হয়েছে এবং পরে উপকূলে আঘাত করেছে। বঙ্গোপসাগরে পতিত স্থলভাগের ঘূর্ণিঝড়কে বঙ্গোপসাগরীয় ঘূর্ণিঝড় হিসেবে এখানে গণনা করা হয়েছে। এদের কোনোটি আবার পূর্ব থেকে (যেমন, প্রশান্ত মহাসাগর) আগত। এগুলো মিয়ানমার ও অন্যান্য স্থলভাগ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ে।

বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ে নিম্নচাপ/মৌসুমী নিম্নচাপের প্রাধান্য সর্বাধিক। এখানে নিম্নচাপের সংখ্যা প্রায় ৫৯%, স্টরমের সংখ্যা প্রায় ২৫% এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রায় ১৬%। শেষোক্ত দুটির মোট সংখ্যা প্রায় ৪১%। পক্ষান্তরে আরব সাগরে নিম্নচাপ বনাম স্টরম এবং তদূর্ধ্ব গতির ঘূর্ণিঝড়ের অনুপাত প্রায় ৪৭ : ৫৩। সেখানে নিম্নচাপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

মাসিক পরিবর্তন

মাস-ভিত্তিক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বঙ্গোপসাগরের ক্ষেত্রে ১০.৪ সারণিতে প্রদত্ত হয়েছে। সকল প্রকার ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যা সর্বোচ্চ হয় আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে (কলাম ৬)। সর্বনিম্ন ফেব্রুয়ারিতে। নিম্নচাপে সর্বাধিক সংখ্যা দেখা যায় আগস্ট/সেপ্টেম্বরে। সকল ঘূর্ণিঝড়ের মোট সংখ্যা নিম্নচাপ দ্বারা প্রভাবান্বিত। এ সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহকালে মৌসুমী নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সে কারণে মৌসুমীকালে সবজাতের ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যা বেশি। পক্ষান্তরে স্টরম এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের দুটি শিখর রয়েছে (কলাম ৫)—একটি মে মাসে এবং অন্যটি নভেম্বর মাসে (বা অক্টোবর/নভেম্বরে)। এই দু'সময়কালকে যথাক্রমে

মৌসুম-পূর্ব (pre-monsoon) এবং মৌসুম-উত্তর (post-monsoon) কাল বলা হয়, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মে-এর তুলনায় নভেম্বরে সংখ্যা বেশি এবং দু'সময়ের ঘূর্ণিঝড় হয় খুবই শক্তিশালী এবং প্রলয়ংকর।

সারণি ১০.৪ : বঙ্গোপসাগরীয় ঘূর্ণিঝড়ের মাসিক পরিসংখ্যান (১৮৭৭–১৯৯৫)।

মাস (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
জানুয়ারি	৮	৪	২	৬	১৪
ফেব্রুয়ারি	৩	০	১	১	৪
মার্চ	২	২	২	৪	৬
এপ্রিল	৮	১১	১২	২৩	৩১
মে	২৭	২০	৩৮	৫৮	৮৫
জুন	৭২	৩৯	৪	৪৩	১১৫
জুলাই	১২০	৪১	৮	৪৯	১৬৯
আগস্ট	১৫৭	২৯	৪	৩৩	১৯০
সেপ্টেম্বর	১৩৯	৩০	১৬	৪৬	১৮৫
অক্টোবর	৯২	৫৭	৩৩	৯০	১৮২
নভেম্বর	৫৩	৫০	৫৭	১০৭	১৬০
ডিসেম্বর	৩৪	২৭	২১	৪৮	৮২
সর্বমোট	৭১৫	৩১০	১৯৮	৫০৮	১২২৩

উপরিউক্ত দুটি শিখর পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় একটি ব্যতিক্রম। আমরা আগেই বলেছি, অন্যান্য স্থানে মূলত একটি শিখর দেখা যায়। এ দুটি শিখরের সাথে বঙ্গোপসাগরে তাপমাত্রার দুটি শিখরের যোগসূত্র রয়েছে। কারণ এ দু'সময়কালে বঙ্গোপসাগরে তাপমাত্রা বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি থাকে এবং এ সময় স্টরম বা তার অধিক গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ের প্রাধান্যও বেশি।

তাপমাত্রার শিখর দুটির একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হতে পারে : যদি সূর্যরশ্মিকে তাপের একমাত্র উৎস হিসেবে ধরা হয়, তবে বছরে একটি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (গ্রীষ্মকালে) এবং একটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (শীতকালে) হওয়া উচিত। কিন্তু জুন-সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবল মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় এবং তখন বৃষ্টিপাতও হয় প্রচুর। ফলে উভয় কারণে পানির তাপমাত্রা কম হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ তাপমাত্রার মাসিক

লেখচিত্র ঐ সময় 'দেবে' (depressed) গিয়ে উভয় পাশে এপ্রিল/মে এবং অক্টোবর/নভেম্বরে তাপমাত্রার শিখরের সৃষ্টি করে।

আবার সাগরেও বঙ্গোপসাগরের ন্যায় ঘূর্ণিঝড় সংখ্যায় দুটি শিখর দেখা যায় (সারণি ১০.৫)। তবে এ শিখর দুটি সবজাতের ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যায়ও দৃষ্ট হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা নগণ্য। আরব সাগরের ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় নিম্নচাপ প্রভাবান্বিত নয়।

সারণি ১০.৫ : আরব সাগরীয় ঘূর্ণিঝড়ের মাসিক পরিসংখ্যান (১৮৭৭–১৯৯৫)।

মাস (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
জানুয়ারি	১	১	০	১	২
ফেব্রুয়ারি	০	০	০	০	০
মার্চ	০	০	০	০	০
এপ্রিল	৩	২	৪	৬	৯
মে	৮	৬	২০	২৬	৩৪
জুন	২১	৭	১৭	২৪	৪৫
জুলাই	১৩	১	০	১	১৪
আগস্ট	৫	২	০	২	৭
সেপ্টেম্বর	১০	৪	৩	৭	১৭
অক্টোবর	১৯	১৫	১১	২৬	৪৫
নভেম্বর	২৪	৮	২৫	৩৩	৫৭
ডিসেম্বর	১৩	৪	২	৬	১৯
সর্বমোট	১১৭	৫০	৮২	১৩২	২৪৯

বঙ্গোপসাগর এলাকায় দেশভিত্তিক বিভাজন

বঙ্গোপসাগরীয় ঘূর্ণিঝড়ের কোন শ্রেণীর কতটি ঘূর্ণিঝড় কোন দেশকে আঘাত করেছে, তার একটি বিভাজন ১০.৬ সারণিতে দেখা যেতে পারে। প্রতিটি দেশের জন্য নিম্নচাপ, স্টরম, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়, স্টরম ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এবং সকল শ্রেণীর ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীর মোট সংখ্যার দেশভিত্তিক শতকরা হিসাব বন্ধনীর মধ্যে দেয়া হয়েছে।

দেশভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় নির্ণয়ে কোনো ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ যে দেশকে আঘাত করেছে, সেই ঘূর্ণিঝড়কে ঐ দেশের হিসেবে ধরা হয়েছে। ফলে বাস্তবে প্রতিটি দেশের ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা

সারণিতে প্রদত্ত সংখ্যা হতে বেশি হবে। যেমন কোনো ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ যদি মিয়ানমার বা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আঘাত হানে এবং ঐ ঘূর্ণিঝড়কে যদি ঐ দেশের (মিয়ানমার বা ভারত) খাতায় ধরা হয়, তার মানে এই নয় যে ঐ ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হয়নি বা বাংলাদেশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। কারণ ঘূর্ণিঝড় তো আর কোনো বিন্দু নয়। একইভাবে যে গতিপথ বাংলাদেশকে আঘাত করেছে বলে দেখানো হয়েছে, সে ঘূর্ণিঝড় পার্শ্ববর্তী অন্য দেশকেও (মিয়ানমার বা ভারত) আঘাত করে থাকবে। একই ঘূর্ণিঝড়ের একাধিক গণনা পরিহার করার জন্য যে গতিপথ যে দেশকে আঘাত করেছে, সে ঘূর্ণিঝড়কে শুধু ঐ দেশের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঘূর্ণিঝড়ের অঙ্কিত গতিপথ রেখা সবসময় পুরোপুরি ঠিক নাও হতে পারে। সঠিক কেন্দ্র নির্ণয়ে প্রায়ই কিছুটা ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কেন্দ্র নির্ণয়ে সামান্য ভুলের জন্য দু'দেশের সীমানায় একদেশে আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড়কে পার্শ্ববর্তী দেশে আঘাত করেছে বলে দেখানো হয়ে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তেমন কিছু করার নেই। তাছাড়া বিভিন্ন দেশ কর্তৃক অঙ্কিত একই ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ এক নাও হতে পারে। এমনকি একই দেশে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অঙ্কিত একই ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথে তারতম্য দেখা দেয়। এসব সমস্যা এড়াতে সকল গতিপথ একই উৎস হতে নেয়া হয়েছে। ১০.৬ সারণিতে প্রদত্ত প্রতিটি দেশের মোট ঘূর্ণিঝড় সংখ্যার মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণি ১০.৭ (১০.৭ ক হতে ১০.৭ ঙ) দেয়া হয়েছে। ভারত (১০.৭ ক), মিয়ানমার (১০.৭ খ), শ্রীলংকা : (১০.৭ গ), মৃত (১০.৭ ঘ), এবং বাংলাদেশ (১০.৭ ঙ)।

সারণি ১০.৬ : বঙ্গোপসাগরীয় ঘূর্ণিঝড়ের দেশভিত্তিক বিভাজন (১৮৭৭–১৯৯৫)।

ঘূর্ণিঝড়ের ধরন	বাংলাদেশ	ভারত	মিয়াননার	শ্রীলংকা	মৃত	মোট
নিম্নচাপ	৬৮ (১০)	৫৩৯ (৭৫)	২৪ (৩)	১৫ (২)	৬৯ (১০)	৭১৫ (১০০)
স্টরম	৪৩ (১৪)	১৯৭ (৬৪)	২৩ (৭)	১২ (৪)	৩৫ (১১)	৩১০ (১০০)
প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়	৪৩ (২২)	১১২ (৫৬)	২৪ (১২)	৮ (৪)	১১ (৬)	১৯৮ (১০০)
স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়	৮৬ (১৭)	৩০৯ (৬১)	৪৭ (৯)	২০ (৪)	৪৬ (৯)	৫০৮ (১০০)
মোট	১৫৪ (১৩)	৮৪৮ (৬৯)	৭১ (৬)	৩৫ (৩)	১১৫ (৯)	১২২৩ (১০০)
স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের শতকরা বিশ্ব সংখ্যা	০.৯৩	৩.৩৪	০.৫১	০.২২	০.৫০	৫.৫

উপরিউক্ত সারণিসমূহের (১০.৬ এবং ১০.৭) সাহায্যে দেশভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ভারত

প্রতিটি শ্রেণীর সর্বোচ্চ সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় ভারতে আঘাত করে। ভারতের দীর্ঘ উপকূল বিবেচনায় এটি বোধগম্য। তাছাড়া অধিকাংশ মৌসুমী নিম্নচাপ ভারতের দিকে যায়। গত ১১৯ বছরে (১৮৭৭–১৯৯৫) প্রায় ৮৪৮টি ঘূর্ণিঝড় ভারতে (বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৬৯%) আঘাত করে। তার মধ্যে ৫৩৯টি নিম্নচাপ (বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের প্রায় ৭৫%) এবং ৩০৯টি স্টরম ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় পর্যায়ের (বঙ্গোপসাগরের স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রায় ৬১%)। সর্বোচ্চ সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে জুলাই/আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে, অনেকটা বঙ্গোপসাগরের মতো। এ সময় নিম্নচাপও হয় সর্বাধিক। ভারতে ঘূর্ণিঝড় সংখ্যা নিম্নচাপ প্রভাবান্বিত। সর্বোচ্চ সংখ্যক নিম্নচাপ আঘাত করে আগস্ট মাসে প্রায় ভরা মৌসুমে। স্টরম ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যায় দুটি শিখর দেখা যায় ; একটি অক্টোবরে এবং অন্যটি জুলাই মাসে। কিন্তু প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের শিখর মে এবং নভেম্বর মাসে। জানুয়ারি–এপ্রিল প্রায় ঘূর্ণিঝড় শূন্য।

মিয়ানমার

মিয়ানমারের কোটায় প্রায় ৭১টি ঘূর্ণিঝড় পড়েছে। তন্মধ্যে নিম্নচাপ ২৪টি (বঙ্গোপসাগরীয় নিম্নচাপের প্রায় ৩%)। সকল শ্রেণীর ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যায় দুটি শিখর রয়েছে। সর্বোচ্চ শিখর মে মাসে এবং দ্বিতীয় শিখর নভেম্বরে, অনেকটা বঙ্গোপসাগরের মতো। ফেব্রুয়ারি–মার্চ এবং জুলাই–আগস্ট ঘূর্ণিঝড় শূন্য। ঘূর্ণিঝড় সংখ্যা নিম্নচাপ প্রভাবান্বিত নয়।

শ্রীলংকা

বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের প্রায় ৩৫টি (৩%) শ্রীলংকায় আঘাত হেনেছে। তন্মধ্যে প্রায় ১৫টি নিম্নচাপ (বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের প্রায় ২%) এবং বাকি স্টরম ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় পর্যায়ের (বঙ্গোপসাগরীয় একই পর্যায়ের প্রায় ৪%)। এখানে উল্লেখ্য যে কিছু কিছু ঘূর্ণিঝড় শ্রীলংকায় আঘাত হানার পর ভারতে আঘাত হানে। দেখা গেছে শ্রীলংকায় আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড়ের প্রায় ৪০% পরে ভারতে আঘাত করে। শ্রীলংকায় বছরে একটি শিখরই দেখা যায়, তা ডিসেম্বর মাসে। কারণ তখন ঘূর্ণিঝড় উপসাগরের সর্বদক্ষিণে জন্মায় বলে এদের শ্রীলংকায় হানা দেবার সম্ভাবনা বেশি। মে হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রীলংকা ঘূর্ণিঝড় শূন্য থাকে ; কারণ তখন ঘূর্ণিঝড়ের জন্মস্থান উত্তরে সরে যায়।

সারণি ১০.৭ : (ক) ভারতে আঘাতকৃত ঘূর্ণঝড়ের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান (১৮৭৭–১৯৯৫)।

মাস (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
জানুয়ারি	০	২	০	২	২
ফেব্রুয়ারি	০	০	১	১	১
মার্চ	০	০	০	০	০
এপ্রিল	১	১	১	২	৩
মে	৯	৮	১৭	২৫	৩৪
জুন	৫৮	২৮	৩	৩১	৮৯
জুলাই	১১৩	৩৬	৮	৪৪	১৫৭
আগস্ট	১৩৯	২৭	৪	৩১	১৭০
সেপ্টেম্বর	১২৬	২৯	১২	৪১	১৬৭
অক্টোবর	৫৯	৩৯	২২	৬১	১২০
নভেম্বর	২৭	২০	৩৮	৫৮	৮৫
ডিসেম্বর	৭	৭	৬	১৩	২০
সর্বমোট	৫৩৯	১৯৭	১১২	৩০৯	৮৪৮

সারণি ১০.৭ : (খ) মিয়ানমারে আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড়ের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান (১৮৭৭-১৯৯৫)।

মাস (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
জানুয়ারি	১	০	০	০	১
ফেব্রুয়ারি	০	০	০	০	০
মার্চ	০	০	০	০	০
এপ্রিল	৫	৬	৬	১২	১৭
মে	৯	৭	১০	১৭	২৬
জুন	০	০	১	১	১
জুলাই	০	০	০	০	০
আগস্ট	০	০	০	০	০
সেপ্টেম্বর	২	০	১	১	৩
অক্টোবর	৪	৩	১	৪	৮
নভেম্বর	২	৫	৪	৯	১১
ডিসেম্বর	১	২	১	৩	৪
সর্বমোট	২৪	২৩	২৪	৪৭	৭১

সারণি ১০.৭ : (গ) শ্রীলংকায় আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড়ের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান (১৮৭৭–১৯৯৫)।

মাস (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
জানুয়ারি	৩	১	১	২	৫
ফেব্রুয়ারি	১	০	০	০	১
মার্চ	০	০	২	২	২
এপ্রিল	১	১	০	১	২
মে	০	০	০	০	০
জুন	০	০	০	০	০
জুলাই	০	০	০	০	০
আগস্ট	০	০	০	০	০
সেপ্টেম্বর	০	০	০	০	০
অক্টোবর	০	১	০	১	১
নভেম্বর	৩	৩	২	৫	৮
ডিসেম্বর	৭	৬	৩	৯	১৬
সর্বমোট	১৫	১২	৮	২০	৩৫

সারণি ১০.৭ : (ঘ) বঙ্গোপসাগরে মৃত ঘূর্ণিঝড়ের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান (১৮৭৭–১৯৯৫)।

মাস (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
জানুয়ারি	৪	১	১	২	৬
ফেব্রুয়ারি	২	০	০	০	২
মার্চ	২	২	০	২	৪
এপ্রিল	১	৩	১	৪	৫
মে	৬	০	০	০	৬
জুন	২	২	০	২	৪
জুলাই	১	০	০	০	১
আগস্ট	১	০	০	০	১
সেপ্টেম্বর	২	০	০	০	২
অক্টোবর	১১	২	১	৩	১৪
নভেম্বর	১৯	১৫	৩	১৮	৩৭
ডিসেম্বর	১৮	১০	৫	১৫	৩৩
সর্বমোট	৬৯	৩৫	১১	৪৬	১১৫

সারণি ১০.৭ : (ঙ) বাংলাদেশে আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড়ের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান (১৮৭৭-১৯৯৫)।

মাস (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
জানুয়ারি	০	০	০	০	০
ফেব্রুয়ারি	০	০	০	০	০
মার্চ	০	০	০	০	০
এপ্রিল	০	০	৪	৪	৪
মে	৩	৫	১১	১৬	১৯
জুন	১০	৯	০	৯	১৯
জুলাই	৮	৫	০	৫	১৩
আগস্ট	১৭	২	০	২	১৯
সেপ্টেম্বর	৯	১	৩	৪	১৩
অক্টোবর	১৮	১২	৯	২১	৩৯
নভেম্বর	২	৭	১০	১৭	১৯
ডিসেম্বর	১	২	৬	৮	৯
সর্বমোট	৬৮	৪৩	৪৩	৮৬	১৫৪

মৃত ঘূর্ণিঝড়

১০.৬ সারণিতে দেখা যাবে যে প্রায় ১১৫টি ঘূর্ণিঝড় কোনো দেশকে আঘাত না করে পানিতেই মারা যায়। এদের সুস্পষ্ট গতিপথ রয়েছে। মৃতের শতকরা হার প্রায় ৯ যা মিয়ানমার এবং শ্রীলংকার মিলিত শতকরা হিসাবের প্রায় সমান এবং বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ৪% কম। বেশি সংখ্যায় মারা যায় নিম্নচাপ পর্যায়ে। স্টরম এবং তদূর্ধ্ব বেগের ঘূর্ণিঝড়ের মৃতের সংখ্যাও কম নয় ; প্রায় ৯% যা মিয়ানমারের সমান এবং শ্রীলংকার প্রায় দ্বিগুণ। বেশি অংশে মারা যায় অক্টোবর হতে ডিসেম্বর মাসে, নভেম্বরে সর্বাধিক। এর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে নিম্নরূপ : মৃত ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম ক্ষেত্র প্রধানত দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর। এ ঘূর্ণিঝড় যখন উত্তর দিকে অগ্রসর হয়, তখন উত্তর বঙ্গোপসাগরে তাপমাত্রা কখনো কখনো ঘূর্ণিঝড়ের বিকাশের বা বেঁচে থাকার সহায়ক নাও হতে পারে। ফলে ঘূর্ণিঝড় তেমন আর অগ্রসর না হতে পেরে সমুদ্রেই মৃত্যুবরণ করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আরো প্রায় ২৫০টি ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরে মারা গিয়েছিল যেগুলোর কোনো গতিপথ ছিল না। সে হিসেবে মৃত ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩৬৫ (২৫০+১১৫) যদি গ্রীনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির ফলে (যেমন, আগে উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়) পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তবে এ মৃত ঘূর্ণিঝড়ের পানিতে মৃত্যুর সম্ভাবনা কমে যেতে পারে এবং এগুলোও প্রবল ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

আরব সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের বেশ মৃত্যু হয়। মাসভিত্তিক বিভাজন ১০.৮ সারণিতে দেয়া হয়েছে। আরব সাগরের ২৪৯টি (সারণি ১০.৩) ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে প্রায় ১৩৩টি (সারণি ১০.৮) মারা যায়, শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ।

সারণি ১০.৮ : আরব সাগরীয় মৃত ঘূর্ণিঝড় (১৮৭৭–১৯৯৫)।

মাস (১)	নিম্নচাপ (২)	স্টরম (৩)	প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৪)	স্টরম + প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (৫) (৩+৪)	মোট (৬) (২+৩+৪)
জানুয়ারি	১	০	০	০	১
ফেব্রুয়ারি	০	০	০	০	০
মার্চ	১	০	০	০	১
এপ্রিল	৪	১	১	২	৬
মে	৭	১	৪	৫	১২
জুন	১১	৬	২	৮	১৯
জুলাই	৫	০	০	০	৫
আগস্ট	৩	১	০	১	৪
সেপ্টেম্বর	৪	৩	১	৪	৮
অক্টোবর	১২	৮	৫	১৩	২৫
নভেম্বর	২১	৪	১২	১৬	৩৭
ডিসেম্বর	১০	৪	১	৫	১৫
সর্বমোট	৭৯	২৮	২৬	৫৪	১৩৩

বাংলাদেশ

১৮৭৭–১৯৯৫ পর্যন্ত প্রায় ১৫৪টি ঘূর্ণিঝড় (বঙ্গোপসাগরের প্রায় ১৩%) বাংলাদেশে আঘাত হানে। তন্মধ্যে ৬৮টি নিম্নচাপ (বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের প্রায় ১০%), ৪৩টি স্টরম এবং ৪৩টি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। স্টরম এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যা ৮৬টি যা বঙ্গোপসাগরের এ উভয় শ্রেণীর মিলিত সংখ্যার প্রায় ১৭%।

১০.৬ সারণিতে প্রদত্ত প্রতিটি দেশের (মৃত ঘূর্ণিঝড়সহ) স্টরম ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যা (বাংলাদেশের ৮৬, ভারতের ৩০৯, মিয়ানমারের ৪৭, শ্রীলংকার ২০ এবং মৃত ৪৬) ব্যবহার করে বিশ্বপ্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরের ৫.৫% (সারণি ১০.১) এর একটি বিভাজন ১০.৬ সারণির সর্বনিম্ন লাইনে দেশভিত্তিতে দেখানো হলো। দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ব পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের অংশ প্রায় ০.৯৩% এবং ভারতের অংশ প্রায় ৩.৩৪%। অর্থাৎ প্রতি

সারণি ১০.৯ : পৃথিবীর যে সকল ঘূর্ণিঝড়ে সর্বনিম্ন মৃতের সংখ্যা ছিল ৫০০০ তাদের একটি তালিকা।

বছর	স্থান	মৃতের সংখ্যা
১৯৭০	বাংলাদেশ	৫০০,০০০
১৭৩৭	ভারত	৩০০,০০০
১৮৮১	চীন	৩০০,০০০
১৯২৩	জাপান	২৫০,০০০
১৫৮৪	বাংলাদেশ	২০০,০০০
১৮৯৭	বাংলাদেশ	১৭৫,০০০
১৯৯১	বাংলাদেশ	১৩৮,০০০
১৮৭৬	বাংলাদেশ	১০০,০০০
১৮৬৪	ভারত	৫০,০০০
১৮৩৩	ভারত	৫০,০০০
১৮৫৪	ভারত	৫০,০০০
১৮২২	বাংলাদেশ	৪০,০০০
১৯৪২	ভারত	৪০,০০০
১৯১৯	বাংলাদেশ	৪০,০০০
১৯১২	বাংলাদেশ	৪০,০০০
১৭৮০	এন্টিলস্	২০,০০০
১৮৩৯	ভারত	২০,০০০
১৭৭৯	ভারত	২০,০০০
১৯৮৯	ভারত	২০,০০০
১৯৬৫(১১ মে)	বাংলাদেশ	১৯,২৭৯
১৯৬৫(৩১ মে)	বাংলাদেশ	১২,০০০
১৯৬৩	বাংলাদেশ	১১,৫২০
১৯৬১	বাংলাদেশ	১১,৪৬৮
১৯৮৫	বাংলাদেশ	১১,০৬৯
১৯৩৭	হংকং	১১,০০০
১৯০৬	হংকং	১০,০০০
১৯৭৭	ভারত	১০,০০০
১৯৭১	ভারত	১০,০০০
১৯৪১	বাংলাদেশ	৭,৫০০
১৯৬৩	কিউবা–হাইতি	৭,১৯৬
১৯০০	টেক্সাস	৬,০০০
১৯৮৮	বাংলাদেশ	৫,৭০৮
১৯৬০	বাংলাদেশ	৫,১৪৯
১৯৬০	জাপান	৫,০০০
১৮৯৫	ভারত	৫,০০০

বছর বিশ্বে সৃষ্ট স্টরম এবং এর উপরের পর্যায়ের ঘূর্ণিঝড়ের শতকরা প্রায় ১টি বাংলাদেশকে এবং শতকরা প্রায় ৩.৩৪টি ভারতকে আঘাত করে। এর ঠিক বিপরীতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুর একটি বিভাজন ১০.৯ সারণিতে দেখা যেতে পারে। যে সব ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সর্বনিম্ন মৃতের সংখ্যা ছিল ৫০০০, কেবল সে সকল ঘূর্ণিঝড়ের হিসাব ১০.৯ সারণিতে দেয়া হয়েছে। দেখা যাবে যে এরকম ৩৫টি ঘূর্ণিঝড়ের ১১টি বাংলাদেশে এবং ১১টি ভারতে আঘাত হানে। মৃতের ৫৩% শুধু বাংলাদেশে, ২৩% ভারতে এবং ৭৬% বাংলাদেশ ও ভারতে। যেখানে বিশ্ব-ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের অংশ (share) প্রায় ১% সেখানে আমাদের মৃতের অংশ প্রায় ৫৩% কি নির্মম চিত্র !

বাংলাদেশে সবধরনের ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত সংখ্যার দুটি শিখর পরিলক্ষিত হয়, যা বঙ্গোপসাগরের বেলায় নেই। প্রথম শিখর অক্টোবরে (বঙ্গোপসাগরে আগস্টে একমাত্র শিখরের তুলনায়) এবং দ্বিতীয় ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন শিখর মে/জুনে। নিম্নচাপ বাদ দিলে বাকি ঘূর্ণিঝড়ের বেলায়ও প্রায় একই প্যাটার্ন দেখা যায় ; অক্টোবরে প্রথম শিখর এবং মে'-তে দ্বিতীয় শিখর, যা বঙ্গোপসাগরের ন্যায়। বাংলাদেশে নিম্নচাপ বনাম স্টরম ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের অনুপাত প্রায় ৪৪ : ৫৬, অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা পরের দুটি শ্রেণী দ্বারা প্রভাবান্বিত। জানুয়ারি হতে মার্চ মাস পর্যন্ত কোনো ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানেনি। এপ্রিলে খুবই নগণ্য, সমস্ত ঘূর্ণিঝড়ের প্রায় ২.৬%।

বাংলাদেশে যে ১৫৪টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে, তার একটি মাসভিত্তিক তালিকা পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া হলো। পরিশিষ্ট ২ এ বছরভিত্তিক তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এ তালিকায় ১৮৭৭ সালের পূর্বেকার কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়েরও উল্লেখ রয়েছে।

একাদশ অধ্যায়
এল নিনিও

ভূমিকা

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে বিশেষ করে ইকুয়েডর ও পেরুতে স্থল ও জলভাগে দুটি বিপরীতমুখী পরিবেশ বিরাজমান। স্থলভাগ মরুময় ও অনুর্বর। কোথাও বা উচ্চভূমি। পক্ষান্তরে জলভাগ পৃথিবীর একটি অন্যতম সেরা মৎস্যচারণ ক্ষেত্র। এখানে স্বাভাবিক অবস্থায় পানিতে একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ বা আপওয়েলিং (upwelling) বিদ্যমান, যে কারণে সমুদ্রের নিচ থেকে শীতল পানির সাথে উপরে উঠে আসে নানারকম জৈব পুষ্টি (nutrients)। এদের সাথে সূর্য কিরণের বিক্রিয়ায় জন্মায় প্রচুর প্লাংকটন (plankton) যা মাছের একটি আকর্ষণীয় খাদ্য। তাই সেখানে প্রচুর মাছ জন্মে বা জড়ো হয়। মাছের লোভে আসে অসংখ্য পাখি। উপকূলে, পাহাড়ের ঢালে পাখি বিষ্ঠা বর্জন করে। এ বিষ্ঠাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় গুয়ানো (Guano)। এটি একটি স্পেনিশ শব্দ। এ গুয়ানো এবং মাছ হতে প্রস্তুত হয় প্রাকৃতিক সার। সেজন্য সেখানকার গুয়ানো শিল্প বেশ প্রসিদ্ধ। সারের প্রতুলতার ফলে এখানে প্রচুর কফি, কলা ও কোকো উৎপন্ন হয়। তাই মাছ ও কৃষি উৎপাদন সে অঞ্চলের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কিন্তু এ সুন্দর পরিবেশে বা ইকোসিস্টেমে (Ecosystem) মাঝে মধ্যে বাধ সাধে প্রকৃতি। পানির ঊর্ধ্বমুখী শীতল প্রবাহ এবং জৈব পুষ্টির সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সে এলাকায় বয়ে আসে উষ্ণ পানি ; যার তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে প্রায় ৮/১০ ডিগ্রি ফারেনহিট বেশি। জৈব পুষ্টির অভাবে মৎস্য সম্পদ হয় বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মাছ না থাকায় পাখিও আসে না। যা থাকে খাদ্যাভাবে তাও মারা যায়। ১৯৫৭–৫৮ সালে এ রকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পেরু উপকূলের অদূরে প্রায় ১.৮০ কোটি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি মারা যায়। পাখি না থাকাতে গুয়ানোও জড়ো হয় না। তাই কৃষিও হয় বিপন্ন। মাছ ও কৃষি রপ্তানি থেকে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বেজে উঠে বিপদের ঘনঘটা।

আগত উষ্ণ পানি থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে আকাশে ভেসে আসে প্রচুর জলীয়বাষ্প। ফলে বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর। দেখা দেয় ঝড়–ঝঞ্ঝা আর বন্যা। উপকূলীয় বন্যা ও ভাঙ্গনে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হয় বিপদগ্রস্ত। বৃষ্টির কারণে কীট–পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়, যার ফলে ফসলও হয় আক্রান্ত। বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। এসব কিছুর প্রভাব গিয়ে পড়ে বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতিতে।

গরম পানির এ আবির্ভাবকে স্থানীয়ভাবে নাম দেয়া হয়েছে এল নিনিও (El Nino)। যদিও বর্তমানে এল নিনিওর সংজ্ঞা বিশ্বজনীন।

নামকরণ

এল নিনিও স্পেনিশ ভাষার একটি শব্দ। উপরিউক্ত এলাকা বহুদিন ধরে স্পেনের অধিকারে ছিল, তাই স্পেনিশ নাম। সে এলাকার ধর্মপ্রাণ অধিবাসীরা (বিশেষ করে জেলেরা) এ নাম দিয়েছে। শব্দের অর্থ শিশুটি (The child)। শিশু দ্বারা শিশু যীশু খৃষ্টকে (Jesus Christ–হযরত ঈসা (আ:)) বুঝানো হয়েছে, যার শিশু বয়সকে ক্রাইস্ট চাইল্ড (Christ Child)ও বলা হয়। খৃষ্টের জন্ম ডিসেম্বর মাসে বড়দিনে (Christmas day)। আর এল নিনিও আসে প্রায় ঐ সময়ে। তাই এ রকম নামকরণ। তবে নামটা কি যথার্থ হয়েছে ? হযরত ঈসা (আ:) এসেছিলেন মানবজাতির কল্যাণে। পক্ষান্তরে এল নিনিও স্থানীয়ভাবে আসে অনেকটা অভিশাপরূপে। তবে পরে আমরা দেখতে পাবো কোনো কোনো স্থানের জন্য এটি আশীর্বাদও।

যখন এল নিনিও হয় না সে সময়কে বলা হয় লা নিনা (La nina)–এর নিনিও নয় অবস্থা বা স্বাভাবিক (Normal) অবস্থা। ইংরেজিতে নন–এল নিনিও (Non-El Nino) শব্দের প্রচলন বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা এখানে 'স্বাভাবিক অবস্থা' এবং লা নিনা উভয় শব্দই ব্যবহার করবো।

মূলত এল নিনিও একটি বার্ষিক ঘটনা (event)। প্রতি বছর দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে এল নিনিও দেখা দিত বা দেয়। যার ফলে পার্শ্ববর্তী সেকুরা (Sechura) মরুভূমি এবং এন্ডিয়ান (Andean) উচ্চভূমিতে কখনো কখনো হালকা বৃষ্টিপাত হয়। এ বৃষ্টির পানি শস্যক্ষেত্রে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়। আপওয়েলিং তেমন প্রবল না হলেও উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পানির সাথে অন্য প্রজাতির মাছ আসে, যার ফলে মাছ–শিল্পে (fishing art) পরিবর্তন আসে। যদিও স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায় না। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, যখন নামকরণ করা হয়, তখন এল নিনিওকে একটি বার্ষিক ঘটনা হিসেবেই নাম দেয়া হয়েছিল এবং সে হিসেবে বাস্তবে প্রতি বছর তা দেখা দিত বা দেয় (বার্ষিক এল নিনিও সম্পর্কে পরে আরো আলোচনা করা হবে এর থিওরি প্রসঙ্গে)। কিন্তু আজকাল এল নিনিও আর বার্ষিক ঘটনা হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে এর ব্যবহার এবং ব্যাপ্তি অনেক। যখন বেশি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, বিরাট এলাকা জুড়ে গরম পানির বিস্তৃতি লাভ করে, আর্থসামাজিক ক্ষয়–ক্ষতি হয় প্রচুর, সে সব বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্য এল নিনিও শব্দটি আজকাল ব্যবহার করা হয়। অনেকটা আমাদের দেশে বর্ষাকালীন অবস্থার মতো। প্রতি বছরই আমাদের দেশে বৃষ্টি হয়। কিছু কিছু জায়গা ডুবে (inundate) যায়। তাতে তেমন ক্ষয়–ক্ষতি হয় না। এটি বর্ষাকালীন একটি স্বাভাবিক অবস্থা। একে আমরা বন্যা বলি না, কিন্তু যখন বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায়, ক্ষয়–ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়,

তখন আমরা বলি বন্যা এসেছে। এল নিনিও শব্দের বর্তমান ব্যবহার অনেকটা আমাদের দেশে বন্যা শব্দের ব্যবহারের মতোই। আমরাও এখানে এল নিনিও শব্দের বর্তমান ব্যবহার গ্রহণ করেছি।

এল নিনিওর প্রকারভেদ

এল নিনিওর আবার প্রকারভেদও আছে। যেমন, দুর্বল (weak), মাঝারি (moderate), শক্তিশালী (strong) এবং খুবই শক্তিশালী (very strong)। এল নিনিওর ব্যাপ্তি, স্থায়িত্বকাল এবং আর্থ সামাজিক প্রভাবের উপর এ শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে। দেখা গেছে সবজাতের এল নিনিও ৩–৪ বছর অন্তর অন্তর দেখা দেয়। শক্তিশালী এল নিনিও ৬–৭ বছরের আগে আসে না। পক্ষান্তরে খুব শক্তিশালী এল নিনিও প্রায় ২০ বছর পর পর আসে। তবে এর কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ব্যতিক্রম খুবই স্বাভাবিক। যেমনটি হয় আমাদের দেশে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে। কয় বছর অন্তর অন্তর কত শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমাদেরকে আঘাত হানবে, পরিসংখ্যান থেকে তা বলা খুবই কঠিন। আবার কম শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় অধিকতর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের তুলনায় বেশি ক্ষতিও সাধন করতে পারে। কাজেই প্রকারভেদের সংজ্ঞাও অনেকটা আপেক্ষিক।

রেকর্ড

ঠিক কবে থেকে এল নিনিও আবির্ভূত হচ্ছে, তার সঠিক কোনো রেকর্ড বা তথ্য নেই। ভূতাত্ত্বিকভাবে মনে করা হয় টারশিয়ারি (tertiary) সময়কাল (বর্তমান থেকে ৬৫০ লাখ–২০ লাখ পূর্বকাল) থেকে এল নিনিও ঘটছে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল এলাকা স্পেনের দখলে যাবার পর থেকে এল নিনিওর রেকর্ড শুরু করা হয়। প্রথম রেকর্ডকৃত এল নিনিও দেখা যায় ১৫২৫–১৫২৬ সালে, যদিও তখন এ নামে আখ্যায়িত করা হতো না। তার মানে এল নিনিও নামকরণ শুরু হয় এ অঞ্চল স্পেনের দখলে যাবার পর। আর্থ–সামাজিক প্রভাবের সাথেই এল নিনিওর ঐতিহাসিক তাৎপর্য জড়িত।

বিশ্বজনীন প্রভাব

বহুকাল ধরে এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এল নিনিওকে একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় অবস্থা মনে করা হতো। কিন্তু এখন আর তা নেই। এর প্রভাব বিশ্বজনীন এবং বিশ্ব আবহাওয়া–জলবায়ুরই এটি একটি বিশেষ অঙ্গ বা শাখা। বহু বছরের অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা–নিরীক্ষা বিশেষ করে ১৯৭২–৭৩ সালের এল নিনিও সময়কার বিশ্ব পরিস্থিতি ও প্রভাব থেকে আজ তা মোটামুটিভাবে প্রমাণিত। সে বছরের এল নিনিও বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

এর পরে ১৯৮২–৮৩ সালে আসে এ যাবতকালের সবচেয়ে বড় এল নিনিও। সে বছর মেক্সিকোতে দেখা দেয় ভীষণ খরা। ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ও বন্যা, যার ফলে সেখানে প্রায় ১০ হাজার ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়। মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে অনাবৃষ্টির কারণে

প্রায় ৬০ কোটি ডলারের ফসল নষ্ট হয়। ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে কৃষিখাতে ক্ষতি হয় যথাক্রমে ৫০ এবং ৪৫ কোটি ডলার পরিমাণের। দক্ষিণ–পূর্ব আফ্রিকায় ঘটে অভূতপূর্ব অনাবৃষ্টি। সমস্ত এলাকা জুড়ে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, ফসল হয় বিনষ্ট, লাখ লাখ গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায় খাদ্যাভাবে। দক্ষিণ–পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় আঘাত হানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। মেলবোর্ন শহরে স্তূপীকৃত হয় ঝড়ে বয়ে আনা হাজার হাজার টন ধুলামাটি। খরার কারণে কোথাও কোথাও দেখা দেয় দাবানল। কোস্টারিকা, পানামা, কলম্বিয়া ও গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন সাগরে ৫০–৭০% কোরাল (Coral) মারা যায়। পেরুর সমুদ্রে প্রায় ৮৫% সামুদ্রিক পাখি মৃত্যুবরণ করে এবং/বা জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

একই দশা ঘটে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ক্রীসমাস দ্বীপের প্রায় ১.৭০ কোটি পাখির বেলায়। পেরুর দক্ষিণাঞ্চলে লোমশ সীলের ৯০% বাচ্চা মারা যায় ওদের মায়েদের শরীরে ওদের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ তৈরি না হওয়াতে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ৫০% এলিফ্যান্ট সীলের বাচ্চা প্রাণ হারায়। মানবদেহে সংক্রামকবাহী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে যায়। কলম্বিয়া, পেরু, ভারত এবং শ্রীলংকায় মশার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ফলে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় মহামারী আকারে।

১৯৯৭–৯৮ সালও ছিল একটি এল নিনিও বছর। মেক্সিকো, কোস্টারিকা ও পানামার উপকূলে প্রচুর কোরাল মারা যায়। আটলান্টিকে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা হ্রাস পায়। প্রশান্ত মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। চিলির আটাকামা মরু অঞ্চলে কদাচিৎ বৃষ্টিপাত হয়। সেখানে বন্যার সৃষ্টি হয়। ইন্দোনেশিয়ায় দেখা দেয় ব্যাপক খরা ও দাবানল। দাবানলের ধোঁয়ায় সে দেশের আকাশ হয় ধূয়ায়িত। আর তার কারণে দৃষ্টিপট (visibility) নষ্ট হওয়াতে সেখানে ঘটে বিমান ও জাহাজ দুর্ঘটনা।

টেলিসংযোগ

উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে যদিও এল নিনিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় একটি স্থানীয় ঘটনা ; কিন্তু এর প্রভাব বিশ্বব্যাপী। অর্থাৎ একস্থানের ঘটনা দূরে বহু দূরে অন্যস্থানে প্রভাব বিস্তার করছে। মনে হচ্ছে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দূর–যোগাযোগ রয়েছে যাকে আবহাওয়ার ভাষায় নাম দেয়া হয়েছে টেলিকানেকশন (Teleconnection) বা টেলিসংযোগ। এ রকম টেলিসংযোগের দু'একটি অবস্থা বা কারণ হচ্ছে দখিনা দোলন (Southern oscillation-SO) এবং ওয়াকার সংবহন (Walker circulation)।

দখিনা দোলন

১৯২৪ সালে দখিনা দোলনের ইংরেজি নামকরণ করেন বৃটিশ আমলে ভারত আবহাওয়া বিভাগের তৎকালীন ডাইরেক্টর জেনারেল স্যার গিলবার্ট ওয়াকার (Gilbert Walker)। ভারতে বৃষ্টিপাত, খরা এবং কৃষিতে এদের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি পৃথিবীর

বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া উপাত্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে দক্ষিণ–পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে (দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের কাছে) সমুদ্রপৃষ্ঠে যখন বায়ুমণ্ডলীয় উচ্চচাপ থাকে, তখন পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর, অস্ট্রেলিয়া, এমনকি ভারত মহাসাগরে ইন্দোনেশিয়ার কাছে থাকে নিম্নচাপ। সময়ের সাথে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইন্দোনেশিয়া এলাকায় উচ্চচাপ এবং দক্ষিণ–পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সময়ের সাথে বায়ুমণ্ডলে এ রকম পরিবর্তন (উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ, নিম্নচাপ থেকে উচ্চচাপ আবার নিম্নচাপ) চলতে থাকে। বলা হয় বায়ুমণ্ডল দুলছে বা বায়ুমণ্ডলে দোলন (Oscillation) ঘটছে। যেহেতু এ দোলন প্রধানত দক্ষিণ গোলার্ধেরই (Southern hemisphere) একটি অবস্থা, তাই একে বলে দখিনা দোলন (Southern oscillation)।

দখিনা দোলন মাপার জন্যে একটি সূচক ব্যবহার করা হয়, যার নাম দেয়া হয়েছে Southern Oscillation Index (SOI) বা দখিনা দোলন সূচক। এটি মাপার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় দুটি স্থানের চাপের তারতম্যের (difference in pressure anomaly) বিয়োগফলকে ধরা হয়। স্থান দুটি হচ্ছে মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে তাহিতী (Tahiti, ১৭°৩৭′ দক্ষিণ এবং ১৪৯° ২৭′পশ্চিম) এবং অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন (Darwin, ১২° ২৮′ দক্ষিণ এবং ১৩০° ৫০′ পূর্ব)।

তাই বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এস. ও. আই-র সংজ্ঞা হচ্ছে :

এস. ও. আই=তাহিতীর বায়ুর চাপের তারতম্য—ডারউইনের বায়ুর চাপের তারতম্য

অর্থাৎ এস. ও. আই যোগবোধক (positive) হবে যদি তাহিতীতে চাপের তারতম্য ডারউইনের চাপের তারতম্যের চেয়ে বেশি হয় ; বিয়োগবোধক (negative) যদি উল্টোটা হয়, অর্থাৎ তাহিতীর চাপের তারতম্য ডারউইনের চাপের তারতম্যে তুলনায় কম হয়।

সূচনা মাপার জন্য অন্যান্য স্থান এবং আবহাওয়ার অন্যান্য প্যারামিটারও ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহার করা যায়। যেমন কখনো কখনো ডারউইনের স্থলে জাকার্তা এবং তাহিতীর স্থলে আপিয়া (Apia) এবং ইস্টার দ্বীপ (Easter island) ব্যবহৃত হয়। চাপের বদলে তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়। কখনো বা শুধু দুটি স্থানের মধ্যে তুলনা না করে কয়েকটি স্থানের মধ্যে তুলনা করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাহিতী ও ডারউইনের চাপের তারতম্য দ্বারা সূচকের মান নির্ণয় করা হয়।

ওয়াকার সংবহন

ওয়াকার সংবহন বা ওয়াকার সার্কুলেশন (Walker circulation) দখিনা দোলনের একটি প্রয়োজনীয় চালক (driving force) এবং ফলাফল (consequence) । বিখ্যাত বিজ্ঞানী জার্কনেস (Bjerknes, J.) ১৯৬৯ সালে ওয়াকারের (Gilbert Walker) নামানুসারে এ নাম দেন। ওয়াকার সংবহনের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১১.১ চিত্রের সাহায্যে দেয়া হলো।

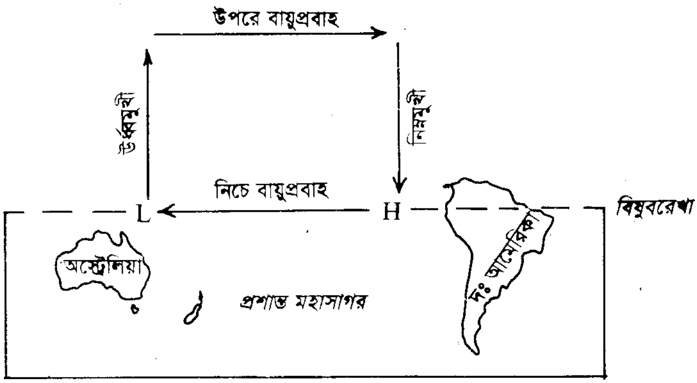

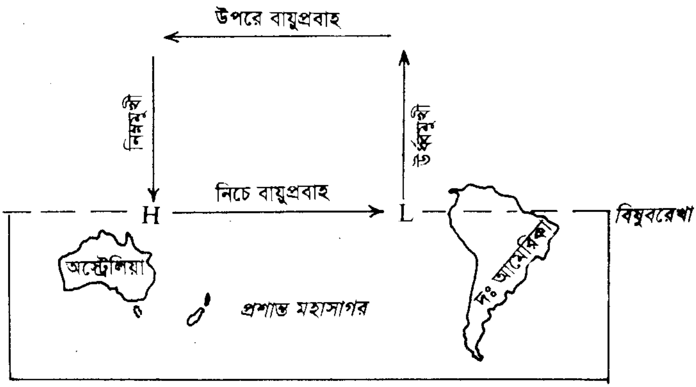

চিত্র ১১.১ : স্বাভাবিক এবং এল নিনিও অবস্থায় ওয়াকার সংবহন।

চিত্রে স্বাভাবিক এবং এল নিনিও অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরের বায়ুমণ্ডলের দুটি সংবহন দেখানো হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় (যোগবোধক দখিনা দোলন সূচক) প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলের (দক্ষিণ আমেরিকার কাছে) বায়ুমণ্ডলে উচ্চচাপ এবং পশ্চিমাংশে (অস্ট্রেলিয়ার কাছে) নিম্নচাপ বিরাজমান থাকে। ফলে বায়ু বায়ুমণ্ডলের নিম্নভাগে উচ্চচাপ এলাকা থেকে নিম্নচাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হয় (যেমনটি হয় পানির বেলায়। যেখানে পানি উঁচু থাকবে সেখান থেকে পানি নিচু বা ঢালুর দিকে প্রবাহিত হবে)। নিম্নচাপ এলাকায় বায়ু হয়

উর্ধ্বমুখী ; কারণ এখানে বায়ু হালকা বলে উপরে উঠে। পক্ষান্তরে উচ্চচাপ এলাকার বায়ু ভারি বলে হয় নিম্নমুখী। সমতা রক্ষার্থে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে বায়ু পশ্চিম থেকে পুবদিকে প্রবাহিত হয়।

এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সংবহন সেল (circulation cell)। পক্ষান্তরে এল নিনিও সময়ে ঘটে ঠিক উল্টোটা। নিম্নচাপ এলাকা পরিণত হয় উচ্চচাপ এলাকায় এবং উচ্চচাপ এলাকা হয়ে যায় নিম্নচাপ এলাকা। বায়ুমণ্ডলের নিম্নাংশে থাকে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এবং উপরিভাগে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বায়ুপ্রবাহ। এভাবে এল নিনিও বা দখিনা দোলনের সাথে ওয়াকার সংবহনের পরিবর্তন ঘটে।

ওয়াকার সংবহন এখন শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের জন্যই ব্যবহৃত হয় না। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী নিরক্ষীয় অঞ্চলে পূর্ব–পশ্চিমে বায়ুমণ্ডলীয় সংবহনের জন্য এ শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীতে একাধিক ওয়াকার সেল রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বায়ুর নিম্নগতি (descent) দেখতে পাই (প্রায় একই সময়ে) প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশে, দক্ষিণ আটলান্টিকের পূর্বাংশে এবং ভারত মহাসাগরে মধ্যাংশে। আর উর্ধ্বগতি (ascent) দেখি ব্রাজিল, মধ্য আফ্রিকা এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে। তবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সেলই সবচেয়ে বেশি বড় এবং বিখ্যাত।

এনসো

উপরের আলোচনা হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এল নিনিও একটি সামুদ্রিক অবস্থা (Oceanographic event) এবং দখিনা দোলন (বা ওয়াকার সংবহন) একটি বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা (Atmospheric বা Meteorological event)। কিন্তু উভয়ে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। তাই মিলিত নাম দেয়া হয়েছে এনসো (ENSO-El Nino/Southern Oscillation)। মনে করা হয় একে অন্যের ফিডব্যাক (Feedback)। কিন্তু কে কার কারণ, সেটা বলা মুশকিল। অনেকটা ডিম ও মুরগির মতো ; ডিম আগে না মুরগি আগে। তবে উভয়ের মূল কারণ সূর্য।

দখিনা দোলন সূচক ও এল নিনিও

দখিনা দোলন সূচকের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থা, এল নিনিও অবস্থা, এদের আগমন ও নির্গমন সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। সূচক যদি বিয়োগবোধক হয় ; তাহলে তাহিতীতে হবে কম চাপ এবং ডারউইনে হবে বেশি চাপ। উপরের বর্ণনা হতে আমরা বলতে পারি এটি একটি এল নিনিও অবস্থা। সূচক যোগবোধক হলে স্বাভাবিক বা লা নিনা অবস্থা। আবার বিয়োগবোধক সূচকের পরম মানের (absolute value) (যেমন : ১ এর মান ৪ এর পরম মানের চেয়ে কম) উপর নির্ভর করবে এল নিনিওর শক্তি। যদি পরম মান কম হয়, তখন এল নিনিও হবে দুর্বল এবং বেশি হলে হবে শক্তিশালী।

সময়ের সাথে সূচকের পরিবর্তন লক্ষ্য করে এল নিনিওর আগমন বা প্রস্থান সম্পর্কে কিছুটা পূর্বাভাস দেয়াও সম্ভব। যেমন যদি দেখা যায় সূচক যোগবোধক থেকে আস্তে আস্তে বিয়োগবোধকের দিকে যাচ্ছে তখন আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি এল নিনিও আসছে। বিপরীত প্রবণতায় বলতে পারি এল নিনিও প্রস্থান করছে।

তত্ত্ব (Theory)

এল নিনিও কেন হয় সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এবিষয়ে গবেষণা চলছে। উপাত্ত–সংগ্রহ এবং এর বিশ্লেষণ ও গাণিতিক তথা কম্পিউটার মডেলের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এল নিনিও এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অবস্থা ও বিষয়াদি সম্পর্কে অধিকতর পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। আমরা এখানে দুই একটি অতীত ও বর্তমান মতবাদ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

বাণিজ্য বায়ু তত্ত্ব

দক্ষিণ–পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর (বাণিজ্য বায়ু সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) যে অংশ দক্ষিণ আমেরিকার (দক্ষিণ গোলার্ধে) পশ্চিম উপকূল (দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূল) বিশেষ করে ইকুয়েডর ও পেরুর উপর দিয়ে প্রবাহিত তার শক্তির উঠানামার সাথে এল নিনিও সম্পর্কিত বলে প্রথমে ধারণা করা হতো। এ এলাকায় দক্ষিণ–পূর্ব বাণিজ্য বায়ু স্থল থেকে জলের দিকে প্রবাহিত বলে উপকূল এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগের পানিকে উত্তর–পশ্চিম বা পশ্চিম দিকে (সমুদ্রের দিকে) ঠেলে দেয়। সরে যাওয়া পানির স্থান দখল করতে সমুদ্রের নিম্নভাগের অধিকতর শীতল পানি উপরে আসে। একে বলে পানির ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ বা 'আপওয়েলিং'। আপওয়েলিং বর্ষাকালে আমাদের বঙ্গোপসাগরেও দেখা যায়। দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতের পূর্ব উপকূল অতিক্রম করার সময় পানিকে উত্তর–পূর্ব বা পূর্বদিকে ঠেলে দেয়। ফলে ভারতের পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি আপওয়েলিং এর সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আপওয়েলিং এর কারণে নিচ থেকে উপরে ভেসে আসে নানারকম জৈব পুষ্টি যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বহুদিন ধরে ধারণা করা হতো বা এখনো কখনো কখনো ধারণা করা হয় যে, যদি কোনো কারণে দক্ষিণ–পূর্ব এ বাণিজ্য বায়ুর শক্তি কমে যায় (হয়ত বা বন্ধ হয়ে যায়), তাহলে আপওয়েলিং বাধাপ্রাপ্ত হবে, হয়ত বা বন্ধ হয়ে যাবে এবং পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে অধিকতর গরম পানি উপকূলের দিকে ধাবিত হয়ে এল নিনিও অবস্থার সৃষ্টি করবে।

আমরা দেখেছি ('নামকরণ' দ্রষ্টব্য) প্রথম দিকে এল নিনিওকে একটি বার্ষিক ঘটনা মনে করা হতো। প্রতি বছরের এ ঘটনার একটি ব্যাখ্যা বাণিজ্য বায়ুর শক্তির বার্ষিক উঠানামা দ্বারা এভাবে দেয়া যেতে পারে :

দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে (উত্তর গোলার্ধে আমাদের শীতকালে) সূর্য সেখানে বেশি তাপ দেয়। ডিসেম্বরে সূর্য তার দক্ষিণ সীমানায় অর্থাৎ মকর ক্রান্তিতে (২৩.৫ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ) লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে বিষুবরেখা ও মকরক্রান্তি অঞ্চলের মধ্যে তাপের তারতম্য অন্যান্য সময়ের তুলনায় কমে যায়। তাপের তারতম্য কম হওয়াতে চাপের তারমতম্যও (pressure difference) কম হয়। যেহেতু চাপের তারতম্যের উপর চাপবল নির্ভরশীল, সেহেতু দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর শক্তিও কমে যায়। এটি একটি বার্ষিক ঘটনা। বাণিজ্য বায়ুর শক্তি কমে যাওয়াতে আপওয়েলিংও কমে যাবে। ফলে এল নিনিও প্রতি বছর দেখা দিবে বা দিত বা দেয়। বর্তমানে কিন্তু আর এল নিনিওর বার্ষিক সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয় ; যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

এল নিনিওর ব্যাখ্যা প্রথম দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর শক্তির তারতম্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হতো : দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু শক্তিশালী হলে এল নিনিও হবে দুর্বল এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু দুর্বল হলে এল নিনিও হবে শক্তিশালী। কিন্তু ইদানিং দেখা গেছে যে, এল নিনিও বছরেও দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর শক্তি বেশ প্রবল, আপওয়েলিংও হচ্ছে প্রায় একই পরিমাণে, কিন্তু নিচ থেকে আর শীতল পানি আসছে না ; আসছে গরম পানি। কাজেই দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য বায়ু এল নিনিওর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে না।

পেরু স্রোত তত্ত্ব (Theory)

আমরা জানি সমুদ্রে বিভিন্ন নামের স্রোত আছে। বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র স্রোতের প্রধান কারণ। এ রকম একটি স্রোত হচ্ছে পেরু (বা চিলি বা পেরু-চিলি) স্রোত। একে হামবোল্ট স্রোতও বলা হয়। ১৮০২ সালে জার্মান বিজ্ঞানি হামবোল্ট (Alexander von Humboldt) এই স্রোতের উপর অনেক উপাত্ত গ্রহণ করেন এবং তারই নামানুসারে এ নাম দেয়া হয়। এই স্রোত চিলি, পেরু, ইকুয়েডরের উপকূল ঘেঁষে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত। এর উৎস হচ্ছে আন্টার্কটিকার শীতল অঞ্চল। তাই এই স্রোতের পানি ঠাণ্ডা। অধিকন্তু দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু একে আরো শীতল করে তুলে আপওয়েলিং এর মাধ্যমে।

এক তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হয় পেরু স্রোত এল নিনিওর একটি কারণ। কোনো কারণে এই স্রোত শিথিল বা দুর্বল হয়ে পড়লে উত্তর দিক থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের গরম পানি উপকূল এলাকার দিকে ধাবিত হয়ে এল নিনিও অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু কথা হচ্ছে পেরু স্রোত কি পৃথিবীব্যাপী জলে, স্থলে ও আকাশে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম, যা আমরা এল নিনিও কালে দেখতে পাই? এ পর্যন্ত তেমন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে মনে হচ্ছে। তাই এই তত্ত্ব গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি।

তরঙ্গ তত্ত্ব

দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু ও পেরু স্রোত দ্বারা এল নিনিওর ব্যাখ্যা দেয়ার প্রবণতা বহুদিন ছিল। এখনো অবশ্য এ দুটি তত্ত্ব একেবারে বিদায় নেয়নি। আরো কিছু মতবাদ বা তত্ত্ব দেয়া হয়েছে ; সেগুলোও তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই আমরা এখানে তা নিয়ে আলোচনা করবো না। মোটামুটিভাবে বর্তমানে তরঙ্গ তত্ত্ব বেশ স্বীকৃতি লাভ করেছে। উপাত্ত ও মডেল এ তত্ত্বের পক্ষে যাচ্ছে। তত্ত্বটি বেশ জটিল ও কঠিন। অঙ্কের ও আবহাওয়া বিজ্ঞানের টেকনিক্যাল ভাষা ছাড়া এ মডেলের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেয়া প্রায় অসম্ভব। তথাপি আমরা জটিলতা পরিহার করে অতি সংক্ষেপে এবং অতি সহজভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

এল নিনিও এবং দখিনা দোলনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে বলে আবহাওয়াবিদরা প্রথমে জানতেন না। ১৯৫৭ সালে বিজ্ঞানি বারলেজ (Berlage) প্রথম আবিষ্কার করেন যে এ দুটির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং এ সূত্র ধরে ১৯৬৬ সালে এল নিনিওর প্রথম ব্যাখ্যা প্রদান করেন বার্কনেস (Bjerknes)। পরবর্তীতে রিটকি (Wyrtki) ১৯৭৫ সালে এর সাথে তরঙ্গ (wave) বা ঢেউ ধারণা যোগ করেন এবং গাণিতিক মডেল দ্বারা তা প্রমাণিতও হয়। তখন থেকেই এল নিনিওর তরঙ্গ তত্ত্বের (wave theory) জন্ম। মোটামুটিভাবে তরঙ্গ তত্ত্বটি নিম্নরূপ :

সমুদ্রের পানিকে গভীরতার সাথে তাপের তারতম্য অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হয় : উপরিভাগ, মধ্যভাগ এবং নিম্নভাগ। উপরিভাগের পানি সবচেয়ে গরম, তাই ঘনত্বও কম। এর গভীরতা খুবই অল্প। বাতাসে পানি বেশ ওলট-পালট খায়। তাই গভীরতার সাথে এখানে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। নিম্নভাগে তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট গভীরতার পর তাপমাত্রার তেমন পরিবর্তন ঘটে না। মধ্যভাগে তাপমাত্রা গভীরতার সাথে অতি দ্রুত কমতে থাকে। ইংরেজিতে এ অংশকে বলে 'থার্মোক্লাইন' (Thermocline)। থার্মোক্লাইনের গভীরতা এল নিনিওর উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

স্বাভাবিক বা লা নিনা অবস্থায় উভয় বাণিজ্য বায়ুর (উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব) প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে নিরক্ষীয় অঞ্চলে পানির একটি পশ্চিমমুখী স্রোতের সৃষ্টি হয়। ফলে উপরিভাগের গরম পানি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে জমা হতে থাকে এবং সাথে সাথে সেখানে পানির উচ্চতাও বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে পূর্বাঞ্চলে পানির উচ্চতা কমতে থাকে এবং পানি অধিকতর শীতল হয়ে পড়ে। পশ্চিমাঞ্চলে থার্মোক্লাইনের গভীরতা প্রায় ১৫০-২০০ মিটারে পৌঁছায় যা পূর্বাঞ্চলে হয় মাত্র ৩০-৫০ মিটার।

এখন কোনো কারণে বাণিজ্য বায়ুর শক্তি কমে গেলে বা অন্য কোনো কারণে পশ্চিমদিকে পানি প্রবাহ শিথিল হলে পানি পূবদিকে ঢেউ এর আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। পশ্চিম প্রান্তে স্তূপীকৃত গরম পানি পূর্ব প্রান্তে এসে এল নিনিও অবস্থার সৃষ্টি করে। ঢেউ আকারে প্রবাহিত হয় বলে এটিকে বলা হয় এল নিনিওর তরঙ্গ তত্ত্ব (Wave Theory of El

Nino)। পশ্চিমে থার্মোক্লাইনের গভীরতা কমতে থাকে এবং পূর্বে বাড়তে থাকে। পূর্বাঞ্চলে থার্মোক্লাইনের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়াতে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে শীতল পানি অনেক নিচে চলে যায় এবং গরম পানির স্তর হয় আরো গভীর। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর শক্তি এখানে শিথিল না হলেও শীতল পানি উপরে আসতে পারে না। কারণ বায়ু শক্তির একটি সীমা আছে। গভীরতার একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এর প্রভাব পৌঁছাতে পারে এবং যতটুকুই পৌঁছে, তাতে থাকে গরম পানি ; অর্থাৎ গরম পানিরই আপওয়েলিং হয় ; স্বাভাবিক সময়কার শীতল পানির নয়। সে কারণেই দেখা যায় যে, এল নিনিওকালেও বাণিজ্য বায়ুর শক্তি স্বাভাবিক সময়কার মতো হওয়া সত্ত্বেও শীতল পানির পরিবর্তে গরম পানি পরিলক্ষিত হয়।

তরঙ্গ তত্ত্বে পশ্চিমদিকে পানি প্রবাহকে বাধা দিয়ে এল নিনিও অবস্থার শুরু বা ট্রিগারের (trigger) কারণ হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনে করা হয় আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International date line-১৮০° পূর্ব বা পশ্চিম) বরাবর বাণিজ্য বায়ুর শিথিল হওয়া বা কোনো কারণে দিক পরিবর্তন করে সেখানে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হওয়া। আবার যখন পূর্বাঞ্চলের গরম পানি পশ্চিমদিকে যাওয়া শুরু করে তখন সমগ্র পরিবেশ স্বাভাবিক অবস্থার দিকে ফিরে আসে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু যদিও স্থানীয়ভাবে (দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে) এল নিনিও অবস্থা সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিতে পারে না, তথাপি এল নিনিও সৃষ্টিতে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর ব্যাপী এর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এল নিনিও এবং এর বিপরীত অবস্থা ট্রিগার করতে কি কি শক্তি কাজ করে, বিজ্ঞানীরা সে বিষয়ে এখনো গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এল নিনিও এবং এর সাথে জড়িত অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় ও সামুদ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণা এবং জ্ঞান আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের উপর প্রভাব

বাংলাদেশের উপর এল নিনিওর কি রকম প্রভাব পড়েছে বা পড়তে পারে, সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা বেশ মুশকিল। প্রধান কারণ উপাত্ত ও তথ্যের অভাব। যেখানে এল নিনিও সম্পর্কেই আমাদের জ্ঞান সীমিত এবং যেখানে এল নিনিওর প্রভাব বিশ্বজনীন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে এ পর্যায়ে কিছু বলা বেশ অপরিপক্ক (immature) বলেই মনে হবে। তথাপি কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

প্রথমে ধরা যাক বৃষ্টি ও বন্যার কথা। দেখা গেছে যে এল-নিনিও বছরে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত কমে যায় যেমন, ১৯৯৭ সাল ছিল একটি এল নিনিও বছর এবং তখন আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। শক্তিশালী এল নিনিও বছরে বাংলাদেশে প্রচণ্ড কোনো বন্যা সাধারণত হয় না। ১৭৭০ সালের মহাবেঙ্গল দুর্ভিক্ষ হয়ে ছিল এল নিনিও বছরে। ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল দুর্ভিক্ষের ঠিক আগেই (১৯৪০-৪১) ছিল এল নিনিও। বাংলাদেশে ১৯৭৪

সালের দুর্ভিক্ষের সাথে হয়ত বা জড়িত ছিল ১৯৭২-৭৩ সালের শক্তিশালী এল নিনিও। ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে প্রলয়ংকারী বন্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে ১৯৫৪, ১৯৫৫ এবং ১৯৮৮ সালে ছিল যোগবোধক এস. ও. আই (লা নিনা)। ১৯৭৪ এবং ১৯৮৭ সালে দুর্বল এস. ও. আই ছিল। পক্ষান্তরে ১৯৫১, ১৯৫৭, ১৯৭২, ১৯৭৬, ১৯৮২ এবং ১৯৮৬ ছিল শক্তিশালী এল নিনিও বছর। এ বছরগুলোতে বাংলাদেশে কোনো ভয়াবহ বন্যা হয়নি। ১৯৬৩, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৯ সালে মাঝারি এল নিনিও ছিল এবং তখন বাংলাদেশে বন্যাও ছিল মাঝারি। কাজেই দেখা যাচ্ছে শক্তিশালী এল নিনিও বছরে বাংলাদেশে কোনো প্রলয়ংকারী বন্যা হয় না। মাঝারি এল নিনিও বছরে মাঝারি বন্যা হয়। ১৯৯৮ সালের জুলাই থেকে লা নিনা অবস্থা শুরু হয় এবং এরই সাথে বাংলাদেশে শুরু হয় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা। চীন এবং ভারতেও দেখা দেয় প্রবল বন্যা।

এল নিনিও বছরে শুধু ভয়ানক বন্যা যে হয় না, তা নয়। তখন বৃষ্টিপাতও হয় কম। যেমন ১৯৯৭ সাল। প্রসঙ্গত ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৮৭৭, ১৮৯৯, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯৭২ শক্তিশালী এল নিনিও বছরে ভারতে প্রবল খরা ছিল। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য রয়েছে।

এল নিনিও তাই আমাদের এলাকায় কৃষিতেও বেশ প্রভাব ফেলতে পারে।

বন্যার মতো এল নিনিও বছরে বাংলাদেশে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ও হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এল নিনিও বছরে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাংশে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগর এবং অস্ট্রেলিয়ার নিকট কমে যায়। উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে (Western North Pacific) এল নিনিও বছরে ঘূর্ণিঝড় তাদের স্বাভাবিক জন্মস্থানের আরো পূর্বে জন্ম নেয়। ১৯৮২-৮৩ সালে এল নিনিও সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে (Western North Pacific) রেকর্ড পরিমাণ ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।

পরিশিষ্ট ১

বাংলাদেশে আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড়

(১৮৭৭-১৯৯৫)

মাসভিত্তিক তালিকা ও উপাত্ত

নিচে ১৮৭৭ সাল হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড়সমূহের মাসভিত্তিক তালিকা ও উপাত্ত প্রদত্ত হলো। যে সকল ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র বা গতিপথ বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হেনেছিল, কেবল সেগুলোরই তালিকা এখানে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়কে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। একটি তারকা চিহ্ন দ্বারা স্টরম পর্যায়ের ঘূর্ণিঝড় (বাতাসের সর্বোচ্চ গতি ১৭–২৪ মিটার/ সেকেন্ড) এবং দুটি তারকা চিহ্ন দ্বারা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় (বাতাসের সর্বোচ্চ গতি ২৪ মিটার/ সেকেন্ডের ঊর্ধ্বে) বুঝানো হয়েছে। তারকা চিহ্নবিহীন ঘূর্ণিঝড় নিম্নচাপ পর্যায়ের (বাতাসের সর্বোচ্চ গতি ১৭ মিটার/ সেকেন্ডের নিচে)। জানুয়ারি হতে মার্চ, এ তিন মাস কোনো ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত করেনি।

এপ্রিল

১. ১৫–১৮ এপ্রিল, ১৯১১**
টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে।

২. ১৯–২৪ এপ্রিল, ১৯২২**
টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে।

৩. ২৪–৩০ এপ্রিল, ১৯৯১**

২৯ এপ্রিল রাতে উপকূলে আঘাত হানে। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার, (১৪০ মাইল) ; জলোচ্ছ্বাস : ৪–৮ মিটার। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরগুনা, কুতুবদিয়া ইত্যাদি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মানুষের মৃত্যু	:	১৩৮,০০০ জন
মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত	:	১০.৮০ মিলিয়ন
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যু	:	১.০৬ মিলিয়ন
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত	:	৯,৬৬৬টি
ঘর ক্ষতিগ্রস্ত	:	১.৭০ মিলিয়ন
জেলা আঘাতপ্রাপ্ত	:	১৯টি

উপজেলা আঘাতপ্রাপ্ত	:	১০২টি
রাস্তা বিনষ্ট	:	১২৩০ কিলোমিটার
পুল ও কালভার্ট বিনষ্ট	:	৪৯৬টি
বাঁধ বিনষ্ট	:	১১৩০ কিলোমিটার
সর্বমোট ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ	:	৪,২০০ কোটি টাকা। (১,৩৮৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

৪. ২৯ এপ্রিল–২ মে, ১৯৯৪**

কক্সবাজার-বান্দরবন এলাকায় আঘাত হানে। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার (১৫৫ মাইল)।

মানুষের মৃত্যু	:	১৯৩ জন
মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত	:	৩,৫৫৯ জন
মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত	:	১.৪ মিলিয়ন
বাড়িঘর পুরোপুরি বিনষ্ট	:	৫২,০৯৭টি
বাড়িঘর আংশিক বিনষ্ট	:	১৭,৪৭৬টি
শস্য বিনষ্ট	:	৫৯০ মিলিয়ন টাকা
বনসম্পদ বিনষ্ট	:	২০০০ মিলিয়ন টাকা।

মে

১. ২৬–২৮ মে, ১৮৮১

সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে (উল্লেখ্য, এ ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে প্রকাশিত তালিকায় নেই)।

২. ৫–৮ মে, ১৮৯৮**

টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে।

৩. ২৪–২৫ মে, ১৯১৮*

টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে (উল্লেখ্য, এটিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনায় দেখা যায় না ; বাংলাদেশের তালিকায় দেখানো উচিত)।

৪. ২–৬ মে, ১৯২৩**

টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে।

৫. ২৫–২৬ মে, ১৯৩৮

সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে (এ ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের প্রকাশনায় দেখা যায় না, দেখানো উচিত)।

৬. ২২–২৬ মে, ১৯৪১**

আন্দামানের পূর্বে জন্ম নিয়ে মেঘনার পশ্চিমে আঘাত করে ২৬ মে এবং পরে পূর্বদিকে বেঁকে গিয়ে পুরো মেঘনা এলাকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জলোচ্ছ্বাস : ৪ মিটার, মৃত ৭,৫০০ জন।

৭. ১৬–১৯ মে, ১৯৫৮*

উত্তর বঙ্গোপসাগরের নিম্নাংশে জন্ম নিয়ে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর মাঝামাঝি আঘাত হানে। অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

৮. ৫–৯ মে, ১৯৬১**

মেঘনার পশ্চিমাংশে আঘাত হানে। নোয়াখালী ও হরিনারায়ণপুরের মধ্যকার রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চর আলেকজান্ডারে অনেক লোক মারা যায়। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ১৪৫–১৪৮ কিলোমিটার (৯০–৯২ মাইল) ; জলোচ্ছ্বাস : ২.৪৪–৩.০৫ মিটার (৮–১০ ফুট), মৃতের সংখ্যা : ১১,৪৬৮ জন। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

পাথরঘাটা	:	৪.২৯ মিটার (১৪.০৮ ফুট)
খেপুপাড়া	:	৫.৬৫ মিটার (১৮.৫৫ ফুট)
পটুয়াখালী	:	৪.৪২ মিটার (১৪.৫১ ফুট)
গলাচিপা	:	৬.৬২ মিটার (২১.৭৩ ফুট)
বরিশাল	:	৩.৬৬ মিটার (১২.০১ ফুট)
রামগতি	:	২.৬৯ মিটার (০৮.৮৩ ফুট)
হাতিয়া	:	২.৬৯ মিটার (০৮.৮৩ ফুট)
চর আলেকজান্ডার	:	২.৬৯ মিটার (০৮.৮৩ ফুট)

৯. ২৭–৩০ মে, ১৯৬১**

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী উপকূল এবং দূরবর্তী দ্বীপসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্তারিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ পাওয়া যায়নি। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ৯৫ কিলোমিটার (৫৯ মাইল) চট্টগ্রামে। মৃতের সংখ্যা : ১০,৪৬৬ জন। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

সন্দ্বীপ	:	৮.৯৬ মিটার (২৯.৩৯ ফুট)
চট্টগ্রাম	:	৬.৮৫ মিটার (২২.৫১ ফুট)

১০. ২৫–২৯ মে, ১৯৬৩**

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজার এবং উপকূলীয় দ্বীপসমূহ (off-shore islands) বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোচ্চ বাতাস : চট্টগ্রামে ঘণ্টায় ২০১ কিলোমিটার (১২৫ মাইল) এবং কক্সবাজারে ঘণ্টায় ১৬৪ কিলোমিটার (১০২ মাইল) ; জলোচ্ছ্বাস : ২.৪৩–৩.৬৬ মিটার (৮–১২ ফুট) ; মৃতের সংখ্যা : ১১,৫২০ জন।

১১. ১০–১২ মে, ১৯৬৫**

বরিশালে আঘাত হানে। বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এলাকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ১৬১ কিলোমিটার (১০০ মাইল) ; জলোচ্ছ্বাস : ৪ মিটার (১২ ফুট)। মৃতের সংখ্যা : ১৯,২৭০ জন, তন্মধ্যে

শুধু বরিশালে ১৪,১৯৩ জন লোক প্রাণ হারায়। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

বরিশাল	:	২.৮৪ মিটার (০৯.৩১ ফুট)
নোয়াখালী	:	৫.৯৫ মিটার (১৯.৫১ ফুট)
সন্দ্বীপ	:	২.৯১ মিটার (০৯.৫৩ ফুট)
চাঁদপুর	:	২.৫৩ মিটার (০৮.৩১ ফুট)
পাথরঘাটা	:	২.৩৫ মিটার (০৭.৭১ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	২.২১ মিটার (০৭.২৫ ফুট)

১২. ২৬ মে—১ জুন, ১৯৬৫**

মেঘনার পশ্চিমে আঘাত হানে ; মৃতের সংখ্যা : ১২,০০০ জন। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

খুলনা	:	২.২৫ মিটার (০২.৩৮ ফুট)
সন্দ্বীপ	:	৩.৭৩ মিটার (১২.২৩ ফুট)
নোয়াখালী	:	৫.৯৫ মিটার (১৯.৫১ ফুট)
চাঁদপুর	:	৩.৮০ মিটার (১২.৪৬ ফুট)
বরিশাল	:	২.৪৪ মিটার (০৮.০১ ফুট)
পটুয়াখালী	:	১.৬৮ মিটার (০৫.৫১ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৭.১৩ মিটার (২৩.৪০ ফুট)

১৩. ২–৬ মে, ১৯৭০**

কক্সবাজারের দক্ষিণে আঘাত হানে। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

কক্সবাজার	:	৩.৭৫ মিটার (১২.৩১ ফুট)
চট্টগ্রাম	:	৩.৩৩ মিটার (১০.৯১ ফুট)
হাতিয়া	:	৪.৩২ মিটার (১৪.১৬ ফুট)
নোয়াখালী	:	৪.৮৭ মিটার (১৫.৯৮ ফুট)
চাঁদপুর	:	৩.৩৮ মিটার (১১.০৯ ফুট)

১৪. ২৩–২৪ মে, ১৯৭০

কক্সবাজারের দক্ষিণে আঘাত হানে।

১৫. ৩–৮ মে, ১৯৯১*

মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল)। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

কোম্পানীগঞ্জ	:	৪.২১ মিটার (১৩.৮২ ফুট)
হাতিয়া	:	৪.৭৯ মিটার (১৫.৭১ ফুট)
নোয়াখালী	:	৪.৮৩ মিটার (১৫.৮৬ ফুট)

চাঁদপুর	:	৩.৪০ মিটার (১১.১৬ ফুট)
সন্দ্বীপ	:	৩.১৭ মিটার (১০.৪২ ফুট)
কক্সবাজার	:	৩.০২ মিটার (০৯.৯১ ফুট)
পাথরঘাটা	:	২.৬৬ মিটার (০৮.৭১ ফুট)
গলাচিপা	:	২.৬৬ মিটার (০৮.৭১ ফুট)

১৬. ২৯ মে–১ জুন ১৯৭৪*
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

১৭. ৯–১৩ মে, ১৯৭৭**
মেঘনার পশ্চিমে আঘাত হানে। খুলনা, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং উপকূলীয় দ্বীপসমূহে ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। সর্বোচ্চ বাতাস : ১১৩ কিলোমিটার/ঘন্টা (৭০ মাইল/ঘন্টা)। জলোচ্ছ্বাস : ০.৬ মিটার।

১৮. ২২–২৫ মে, ১৯৮৫**
মেঘনা মোহনায় (পূর্বাংশে) আঘাত হানে। কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, নোয়াখালী এবং উরিরচর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোচ্চ বাতাস ঘন্টায় : ১৫৪ কিলোমিটার ; জলোচ্ছ্বাস : ৪.৩ মিটার (১৪ ফুট)।

মৃতের সংখ্যা	:	১,০৬৯ জন
ঘরবাড়ি বিনষ্ট	:	৯৪,৩৭৯টি
গবাদি পশুর মৃত্যু	:	১,৩৫,০৩৩টি
রাস্তা বিনষ্ট	:	৬৪ কিলোমিটার
গাছপালা মূলোৎপাটিত	:	১,২০০টি
বাঁধ বিনষ্ট	:	৩৯০ কিলোমিটার।

১৯. ৩১ মে–২ জুন, ১৯৯১*
চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা এবং কুতুবদিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলোচ্ছ্বাস : ১.২ মিটার।

জুন

১. ১৬–২০ জুন, ১৮৮৫*
খুলনা, বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

২. ১৩–১৭ জুন, ১৮৯৪
মেঘনা মোহনায় জন্মে পশ্চিম দিকে চলে যায়।

৩. ১৬–২২ জুন, ১৯০৮*
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

৪. ৪–৬ জুন, ১৯১৬*
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

BANGDOC Library Dhaka

৫. ১৩–১৬ জুন, ১৯১৭
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

৬. ১৪–১৭ জুন, ১৯২৪*
কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে।

৭. ২–৪ জুন, ১৯২৯*
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে।

৮. ৭–১০ জুন, ১৯৩২
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

৯. ২০–২৫ জুন, ১৯৩৭*
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে।

১০. ৪–৫ জুন, ১৯৪১*
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে।

১১. ১৫–১৭ জুন, ১৯৪১
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

১২. ১৫–১৬ জুন, ১৯৪৪
মেঘনার পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানে।

১৩. ১০ জুন, ১৯৪৭
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

১৪. ১২–১৪ জুন, ১৯৬৮
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

১৫. ১৭–২০ জুন, ১৯৬৯
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে।

১৬. ৭–১১ জুন, ১৯৭০
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

১৭. ৪–৭ জুন, ১৯৭৫*

মেঘনা এলাকায় আঘাত হানে। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

নোয়াখালী	:	৪.৬৫ মিটার (১৫.২৬ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৩.১৩ মিটার (১০.২৬ ফুট)
হাতিয়া	:	৩.১৩ মিটার (১০.২৬ ফুট)
সন্দ্বীপ	:	২.৪৮ মিটার (০৮.১১ ফুট)
চট্টগ্রাম	:	৩.২০ মিটার (১০.৫১ ফুট)
কক্সবাজার	:	৩.০২ মিটার (০৯.৯১ ফুট)

১৮. ১৮ জুন–১ জুলাই, ১৯৭৯
সুন্দরবন একালায় আঘাত হানে।

১৯. ১–৫ জুন, ১৯৮৭*
মেঘনা এলাকায় আঘাত হানে।

জুলাই

১. ১২–১৫ জুলাই, ১৮৮৭
মেঘনা মোহনায় জন্ম নিয়ে পশ্চিমদিকে চলে যায়।

২. ২৩–২৭ জুলাই, ১৮৯৪*
উপকূলের খুব কাছাকাছি জন্ম নিয়ে বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

৩. ১৩–১৬ জুলাই, ১৮৯৯
উপকূলের খুব কাছাকাছি জন্ম নিয়ে বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

৪. ৫–৮ জুলাই, ১৯০৫*
উপকূলের অতি নিকটে জন্ম নিয়ে সুন্দরবন এলাকা দিয়ে স্থলে উঠে।

৫. ২৫–২৭ জুলাই, ১৯০৬*
উপকূলের কাছে জন্ম নিয়ে বরিশাল দিয়ে স্থলে উঠে।

৬. ৩০ জুলাই–৩ আগস্ট, ১৯১৭
মেঘনা মোহনায় জন্ম নিয়ে মোহনার পশ্চিম পাশ দিয়ে স্থলভাগ অতিক্রম করে।

৭. ২৮–৩১ জুলাই, ১৯২৩
মেঘনা মোহনায় জন্ম নিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যায়।

৮. ৫–৭ জুলাই, ১৯২৬*
মেঘনা মোহনার উত্তরাংশে আঘাত হানে।

৯. ২৩–২৬ জুলাই, ১৯২৯
উপকূলের খুব কাছাকাছি জন্ম নিয়ে বরিশাল এলাকা দিয়ে স্থলভাগে উঠে।

১০. ১৫–২২ জুলাই, ১৯৩০*
কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে। স্থলভাগ থেকে আবার সমুদ্রে পতিত হয়ে মেঘনার পশ্চিমাংশে আঘাত করে।

১১. ২৮–২৯ জুলাই, ১৯৪১
মেঘনা মোহনার উত্তর–পশ্চিমাংশে আঘাত করে।

১২. ১০–১৮ জুলাই, ১৯৫৯
উপকূলের কাছাকাছি জন্ম নিয়ে বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে। পরে পুরো ভারতীয় স্থলভাগ অতিক্রম করে আরব সাগরে পতিত হয়ে সেখানে স্টরম–এ রূপান্তরিত হয়। এবং আরো সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়ে আরব অঞ্চলে আঘাত করে।

১৩. ৪–৬ জুলাই, ১৯৬৩
উপকূলের খুব কাছাকাছি জন্ম নিয়ে বরিশাল এলাকা দিয়ে স্থলে উঠে।

আগস্ট

১. ৬–৮ আগস্ট, ১৮৭৭
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

২. ৮–৯ আগস্ট, ১৮৭৭
মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে।

৩. ১৮–২০ আগস্ট, ১৮৭৭
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

৪. ২১–২৩ আগস্ট, ১৮৯৮
মেঘনা মোহনার দক্ষিণে জন্মে সোজা পশ্চিম দিকে চলে যায় পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে।

৫. ৫–১০ আগস্ট, ১৯১৯
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

৬. ১১–১৩ আগস্ট, ১৯১৯
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

৭. ৫–৮ আগস্ট, ১৯২০
মেঘনা মোহনার পশ্চিমাংশে আঘাত হানে।

৮. ২১–২৬ আগস্ট, ১৯২৩।
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

৯. ১–৩ আগস্ট, ১৯২৮
বরিশাল অঞ্চলে আঘাত করে।

১০. ৭–১০ আগস্ট, ১৯২৯
খুলনা এলাকায় আঘাত হানে।

১১. ১১–১৩ আগস্ট, ১৯৩৮
বরিশাল এলাকায় আঘাত করে।

১২. ২–৫ আগস্ট, ১৯৪০*
সুন্দরবন অঞ্চলে আঘাত হানে।

১৩. ১৫–২০ আগস্ট, ১৯৪১*
কক্সবাজার এলাকায় আঘাত করে।

১৪. ২৪ আগস্ট–১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

১৫. ৩–৬ আগস্ট, ১৯৬৮
বরিশাল এলাকায় আঘাত করে।

১৬. ১১–১৪ আগস্ট, ১৯৬৮
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

১৭. ১২–২০ আগস্ট, ১৯৭২
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

১৮. ১২–১৫ আগস্ট, ১৯৭৯
মেঘনা মোহনার পূর্বাংশে আঘাত করে।

১৯. ২৬ আগস্ট, ১৯৮০
মেঘনা মোহনার পশ্চিমাংশে আঘাত করে।

সেপ্টেম্বর

১. ৩০শে সেপ্টেম্বর–২ অক্টোবর, ১৮৯৫**
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

২. ২৮–৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫
বরিশাল–খুলনা উপকূলের খুব কাছাকাছি জন্ম নিয়ে উপকূলে আঘাত করে।

৩. ১২–১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

৪. ২৩–২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯**
বরিশাল–খুলনা এলাকায় আঘাত হানে। মৃতের সংখ্যা : ৪০,০০০ জন।

৫. ১৪–১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫
মেঘনা মোহনায় জন্ম নিয়ে সেখানেই আঘাত করে।

৬. ২১–২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯
মেঘনা মোহনায় আঘাত করে।

৭. ৩০ সেপ্টেম্বর–২ অক্টোবর, ১৯৩৯
বরিশাল–খুলনা এলাকায় আঘাত করে।

৮. ৯–১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১
মেঘনা মোহনার পশ্চিমাংশে আঘাত করে।

৯. ২৩–২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

১০. ১৯–২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২*
সুন্দরবন এলাকায় আঘাত হানে।

১১. ২৭ সেপ্টেম্বর–১ অক্টোবর, ১৯৬৬**
বরিশাল এলাকায় আঘাত করে। মৃতের সংখ্যা : ৮৫০ জন। জলোচ্ছ্বাস : ৬–৭ মিটার (২০–২২ ফুট)। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চত (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

কক্সবাজার	:	৪.৪৮ মিটার (২৪.৭১ ফুট)
চট্টগ্রাম	:	৪.৯০ মিটার (১৬.০৯ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৯.৫৪ মিটার (৩১.৩১ ফুট)
নোয়াখালী	:	৫.৫৭ মিটার (১৮.২৬ ফুট)

১২. ২৩–২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
মেঘনা মোহনার পশ্চিমাংশে আঘাত করে।

১৩. ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত করে।

অক্টোবর

১. ২৬–২৭ অক্টোবর, ১৮৭৯
চট্টগ্রামের উত্তরে মেঘনার পূর্বাংশে আঘাত হানে।

২. ৩১ অক্টোবর–২ নভেম্বর, ১৮৮৪*
মেঘনার পূর্বাংশে আঘাত হানে।

৩. ১–৭ অক্টোবর, ১৮৮৮*
বরিশাল দিয়ে আঘাত হেনে মেঘনা দিয়ে চলে যায়।

৪. ২১–২৪ অক্টোবর, ১৮৯০*
সোজাসুজি বরিশাল দিয়ে আঘাত হানে।

৫. ২০–২২ অক্টোবর, ১৮৯৩**
মেঘনার পূর্বাংশে নোয়াখালী এলাকায় আঘাত হানে।

৬. ২১–২৪ অক্টোবর, ১৮৯৭*

চট্টগ্রাম, কুতুবদিয়ায় আঘাত হানে। মৃতের বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায় : Frank and Hussain (১৯৭১) এ দেয়া আছে ১৭৫,০০০ জন ; অন্যদিকে বি. বি. এস (Bangladesh Bureau of Statistics) অনুযায়ী ১৪,০০০ জন মৃত এবং পরে মহামারীতে আরো ১৮,০০০ জন লোক মারা যান।

৭. ৫–৮ অক্টোবর, ১৯০১
মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে।

৮. ২৩–২৬ অক্টোবর, ১৯০৫*
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে।

৯. ৫–৬ অক্টোবর, ১৯০৭
কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে।

১০. ২–৫ অক্টোবর, ১৯১৪
টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে।

১১. ১২–১৩ অক্টোবর, ১৯১৮
টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে।

১২. ২৪–২৬ অক্টোবর, ১৯২১
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে।

১৩. ১৮–২১ অক্টোবর, ১৯২৪
মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে।

১৪. ১৪–১৬ অক্টোবর, ১৯২৫
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে।

১৫. ২০–২২ অক্টোবর ১৯৩৫*
চট্টগ্রামের নিচে আঘাত হানে।

১৬. ১১–১৫ অক্টোবর, ১৯৩৭*
খুলনা–বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

১৭. ৩১ অক্টোবর–৪ নভেম্বর, ১৯৪২*

মেঘনার পূর্বাংশে আঘাত হানে। (মন্তব্য : বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনায় একে একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং সুন্দরবনে আঘাত করেছে বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু তারিখ উল্লেখ নেই। প্রসংগত বলা যেতে পারে যে ১৪–১৮ অক্টোবর, ১৯৪২ সালে একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হুগলী নদীর পশ্চিমে আঘাত হানে। এ থেকে সুন্দরবন এলাকাও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। এ ঘূর্ণিঝড়কে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় হিসেবে বাংলাদেশের প্রকাশনায় দেখানো হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু গতিপথ এটিকে বাংলাদেশের তালিকায় ফেলে না।)

১৮. ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৭
চট্টগ্রামের নিচে আঘাত হানে।

১৯. ২১–২৩ অক্টোবর, ১৯৪৭**
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে।

২০. ১৭–২২ অক্টোবর, ১৯৫০
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

২১. ২৫–২৬ অক্টোবর, ১৯৫৪
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

২২. ২২–২৪ অক্টোবর, ১৯৫৮*

বরিশাল, নোয়াখালী এবং মেঘনা মোহনার পশ্চিমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস ২ মিটার।

২৩. ২৭–৩০ অক্টোবর, ১৯৫৯
বরিশাল, মেঘনা মোহনা এবং নোয়াখালী এলাকায় আঘাত হানে।

২৪. ৮–১১ অক্টোবর, ১৯৬০**

মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে। চর জব্বার, চর আমিনা, চরভাটি, রামগতি, হাতিয়া এবং নোয়াখালী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃতের সংখ্যা : ৩,০০০ জন ; সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ২০১ কিলোমিটার (১২৫ মাইল) ; সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস : ৩ মিটার (১০ ফুট) (কোনো কোনো রিপোর্টে জোয়ার ১.৫ মিটার এবং জলোচ্ছ্বাস ৫.১ মিটার)।

২৫. ২৮–৩১ অক্টোবর, ১৯৬০**

চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে। হাতিয়ায় ৭০% ঘরবাড়ি বাতাসে উড়ে যায়, দুটি বড় জাহাজ ডাংগায় উঠে আসে পানির সাথে, কর্ণফুলী নদীতে ৫–৭টি জাহাজ ডুবে যায়। মৃতের সংখ্যা : ৮১৪৯ জন ; সর্বোচ্চ বাতাস ঘণ্টায় ২০৯ কিলোমিটার (১৩০ মাইল); সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস : ৬ মিটার (২০ ফুট)।

২৬. ২৪–২৫ অক্টোবর, ১৯৬১
মেঘনা মোহনার পশ্চিমাংশে আঘাত হানে।

২৭. ২৭–৩০ অক্টোবর, ১৯৬২**
চট্টগ্রামে আঘাত হানে।

২৮. ৫–৭ অক্টোবর, ১৯৬৩
মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে।

২৯. ২৬–২৭ অক্টোবর, ১৯৬৩**

বঙ্গোপসাগরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় থেকে স্টরম–এ পরিণত হয় এবং পরে নিম্নচাপ হিসেবে টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে। ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩০. ৪–৭ অক্টোবর, ১৯৬৪
বরিশাল এলাকা দিয়ে আঘাত হানে।

৩১. ৭–৮ অক্টোবর, ১৯৬৫
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে।

৩২. ৮–১১ অক্টোবর, ১৯৬৭**

ঘূর্ণিঝড়টি প্রথমে স্টরম হিসেবে ভারতে আঘাত করে, পরে বঙ্গোপসাগরে ফিরে আসে এবং প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়ে বাংলাদেশের উপকূল ঘেঁষে মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে। খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পুরো উপকূল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস : ৯.৩ মিটার। (মন্তব্য : ঘূর্ণিঝড়টিকে বাংলাদেশের প্রকাশনায় স্টরম হিসাবে দেখানো আছে। কিন্তু এটি হবে একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়)।

৩৩. ২০–২৪ অক্টোবর, ১৯৬৭**

কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে। সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস : ৭.৬ মিটার (মন্তব্য : বাংলাদেশের প্রকাশনায় স্টরম হিসেবে দেখানো আছে। কিন্তু এটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হিসেবে আঘাত হানে)।

৩৪. ৯–১১ অক্টোবর, ১৯৬৯*
খুলনা–বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে। সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস ৮ মিটার।

৩৫. ১৫–২১ অক্টোবর, ১৯৭৬*
চট্টগ্রামে আঘাত হানে। কোম্পানীগঞ্জে পানির উচ্চতা ছিল ৫.০ মিটার।

৩৬. ১–৪ অক্টোবর, ১৯৮০
মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে।

৩৭. ১৪–১৫ অক্টোবর, ১৯৮৩*
চট্টগ্রাম এলাকায় ফেনী নদীর কাছে আঘাত হানে। ৬টি মাছ ধরার নৌকা এবং একটি ট্রলার ডুবে যায়। ১০০০ জনের বেশি জেলে এবং ১০০টি মাছ ধরার নৌকা নিখোঁজ হয়। ২০% আমন ধান বিনষ্ট হয়। মৃতের সংখ্যা ৪৩ জন। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ১২২ কিলোমিটার।

৩৮. ১৮–২০ অক্টোবর, ১৯৮৮*
বরিশাল–মেঘনা এলাকায় আঘাত হানে।

৩৯. ১২–১৪ অক্টোবর, ১৯৯১
বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

নভেম্বর

১. ৩–৫ নভেম্বর, ১৮৭৭
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে।

২. ১৮–২৩ নভেম্বর, ১৮৮৫*
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে।

৩. ১৪–১৮ নভেম্বর, ১৯০১*
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে। (মন্তব্য : বাংলাদেশের প্রকাশনায় শুধু নভেম্বরের উল্লেখ আছে, তারিখ নেই এবং পশ্চিম সুন্দরবনে আঘাত করেছে বলে লিপিবদ্ধ আছে। তবে একই মাসে (২৪–২৭ নভেম্বর, ১৯০১) একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় কলকাতায় আঘাত হানে। সম্ভবত ঐ ঘূর্ণিঝড়কে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় হিসেবে ধরা হয়ে থাকতে পারে)।

৪. ২১–২৩ নভেম্বর, ১৯০৪*
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার এলাকায় আঘাত করে।

৫. ১–২ নভেম্বর, ১৯১৬
টেকনাফ অঞ্চলে আঘাত হানে।

৬. ৫–৯ নভেম্বর, ১৯৩৪*
টেকনাফ অঞ্চলে আঘাত হানে।

৭. ৬–১২ নভেম্বর, ১৯৩৮**

মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হলেও আঘাত করার সময় দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়।

৮. ১৬–১৯ নভেম্বর, ১৯৫০*

মেঘনা মোহনার পশ্চিমাংশে আঘাত করে।

৯. ৮–১২ নভেম্বর, ১৯৫২*

মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে।

১০. ৮–১৩ নভেম্বর, ১৯৭০**

খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পুরো উপকূল এলাকা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সর্বোচ্চ বাতাস ছিল ঘণ্টায় ২২২ কিলোমিটার (১৩৮ মাইল)। শস্যের প্রচুর ক্ষতি হয়।

মৃতের সংখ্যা	:	৫,০০,০০০ জন
লোক ক্ষতিগ্রস্ত	:	৪৭,০০,০০০ জন
ঘরবাড়ি বিনষ্ট/ধ্বংস	:	৪,০০,০০০টি
গবাদিপশু ও হাঁস–মুরগির মৃত্যু	:	৭,৮০,০০০টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস	:	৩,৫০০টি

জলোচ্ছ্বাস : ৩–১০ মিটার (১০–৩৩ ফুট)। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

কক্সবাজার	:	৩.৬৯ মিটার (১২.১১ ফুট)
চট্টগ্রাম	:	৩.৭৫ মিটার (১২.৩১ ফুট)
নোয়াখালী	:	৫.১৯ মিটার (১৭.০১ ফুট)
চাঁদপুর	:	৪.০৯ মিটার (১৩.৪১ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৫.৭৬ মিটার (১৮.৯১ ফুট)
চরদু'আনী	:	৫.১৪ মিটার (১৬.৮৬ ফুট)
বরিশাল	:	২.৬৭ মিটার (০৮.৭৭ ফুট)
পাথরঘাটা	:	২.৮১ মিটার (০৯.২১ ফুট)
মেঘনার দূরে (Off take of the Meghna)	:	২.৮২ মিটার (০৯.২৬ ফুট)
পিরোজপুর	:	২.৬৬ মিটার (০৮.৭১ ফুট)
চান্দখালী	:	৩.০২ মিটার (০৯.৯১ ফুট)

কোনো কোনো স্থানে বিশেষ করে খুলনা এলাকায় ঋণাত্মক জলোচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

১১. ৩–৬ নভেম্বর, ১৯৭১**

চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

সন্দ্বীপ	:	৩.৫৫ মিটার (১১.৬৬ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৫.৫৫ মিটার (১৮.২২ ফুট)
হাতিয়া	:	৫.২০ মিটার (১৭.০৬ ফুট)
নোয়াখালী	:	৫.৪৯ মিটার (১৮.০১ ফুট)
চাঁদপুর	:	৪.৬১ মিটার (১৫.১১ ফুট)
মেঘনার দূরে (Off take of the Meghna)	:	৩.০৮ মিটার (১০.১০ ফুট)
চরদু'আনী	:	২.৬৭ মিটার (০৮.৭৬ ফুট)
তাজমুদ্দিন	:	২.৮২ মিটার (০৯.২৫ ফুট)
গলাচিপা	:	২.৬২ মিটার (০৮.৬১ ফুট)

১২. ১৪–১৭ নভেম্বর, ১৯৭৩**

মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে। আঘাতের সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

নোয়াখালী	:	৩.৮১ মিটার (১২.৫১ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৩.৩১ মিটার (১০.৮৬ ফুট)
কক্সবাজার	:	২.৪০ মিটার (০৭.৮৬ ফুট)
চট্টগ্রাম	:	২.২৯ মিটার (০৭.৫১ ফুট)
সন্দ্বীপ	:	২.৫১ মিটার (০৮.২৪ ফুট)
হাতিয়া	:	২.৩৪ মিটার (০৭.৬৬ ফুট)
চাঁদপুর	:	২.৩৫ মিটার (০৭.৭১ ফুট)

১৩. ২৩–২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪**

চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে। সর্বোচ্চ বাতাস ঘণ্টায় ১৬২ কিলোমিটার (১০০ মাইল)।

মৃতের সংখ্যা	:	২০ জন
আহত	:	৫০ জন
নিখোঁজ	:	২৮০ জন
ঘরবাড়ি বিনষ্ট/ধ্বংস	:	২,৩০০টি
গবাদি পশুর মৃত্যু	:	১,০০০টি

জলোচ্ছ্বাস ২. ৭৪–৫.১৮ মিঃ (৯–১৭ ফুট)। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

নোয়াখালী	:	৪.৯৬ মিটার (১৬.২৬ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৪.৭৪ মিটার (১৫.৫৬ ফুট)
টেকনাফ	:	২.১৪ মিটার (০৭.০১ ফুট)
হাতিয়া	:	৩.০২ মিটার (০৯.৯১ ফুট)

১৪. ৭–১১ নভেম্বর, ১৯৭৫*

চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে। উপকূলে আঘাতের অনেক আগে দুর্বল হয়ে পড়ে। সর্বোচ্চ জলোচ্ছ্বাস ৩.১ মিটার। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে কয়েকটি স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

চট্টগ্রাম	:	৩.১১ মিটার (১০.২১ ফুট)
সন্দ্বীপ	:	২.৫৩ মিটার (০৮.৩১ ফুট)
হাতিয়া	:	৩.০৪ মিটার (০৯.৯৬ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৫.৫০ মিটার (১৮.০৬ ফুট)
নোয়াখালী	:	৪.৬৭ মিটার (১৫.৩১ ফুট)
কক্সবাজার	:	২.৫৯ মিটার (০৮.৫১ ফুট)

১৫. ৬–৯ নভেম্বর, ১৯৮৩**

চট্টগ্রাম–কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ১৩৬ কিলোমিটার (৮৫ মাইল)। কুতুবদিয়ার নিকটে চট্টগ্রাম–কক্সবাজার উপকূল এবং সেন্ট মার্টিন, টেকনাফ, উখিয়া, মহেশখালী এবং সোনাদিয়ার নিম্নাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলোচ্ছ্বাস ১.৫ মিটার (৫ ফুট)।

মাছ ধরার নৌকা নিখোঁজ	:	৫০টি
জেলে নিখোঁজ	:	৩০০ জন
কাঁচা–ঘর বিনষ্ট	:	২,০০০টি
প্রতিষ্ঠান ধ্বংস	:	২২টি
পান পাতা বিনষ্ট	:	৩,০০০ বরুয়াজ (Boruage)

১৬. ৭–৯ নভেম্বর, ১৯৮৬**

মাদ্রাজের উত্তর–পূর্বে জন্ম নিয়ে ভারতের পূর্ব উপকূল ঘেঁষে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা এলাকায় আঘাত করে। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার চট্টগ্রামে এবং ৯০ কিলোমিটার খুলনায়।

মৃতের সংখ্যা	:	১৪ জন
গবাদি পশুর মৃত্যু	:	৫০টি
ধানের ক্ষেত বিনষ্ট	:	২৪০,০০০ একর

বরগুনার আমতলী থানার স্কুল, মসজিদ, গুদাম–ঘর, হাসপাতাল, ঘরবাড়ির বিরাট ক্ষতি হয়।

১৭. ২৩–৩০ নভেম্বর, ১৯৮৮**

রায়মঙ্গল নদীর কাছে খুলনা উপকূলে আঘাত হানে। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার (১০০ মাইল), জলোচ্ছ্বাস মংলাবন্দরে ৪.৪২ মিটার (১৪.৫ ফুট)।

মৃত	:	৫,৭০৪ জন
নিখোঁজ	:	৬,০০০ জন

হরিণ মারা যায়	:	১৫,০০০টি
গবাদি পশু মারা যায়	:	৬৫,০০০টি
বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার) মারা যায়	:	৯টি
শস্যের ক্ষতি হয়	:	৯৪১ কোটি টাকার পরিমাণ

১৮. ১৬–২১ নভেম্বর, ১৯৯২**
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার–টেকনাফ এলাকায় আঘাত হানে।

১৯. ২১–২৫ নভেম্বর, ১৯৯৫**
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টার ১৯০ কিলোমিটার (১১৮ মাইল)। কেন্দ্রে সর্বনিম্ন চাপ : ৯৫৬ মিলিবার।

ডিসেম্বর

১. ৩–৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৩
চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে।

২. ১০–১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫**
মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে।

৩. ২–৫ ডিসেম্বর, ১৯০৯**
কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে।

৪. ২৪–২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৬*
মেঘনা মোহনায় আঘাত হানে।

৫. ৬–১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫১**
চট্টগ্রাম–কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে। আঘাতের পূর্বে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬. ৭–১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫**
কক্সবাজার এলাকায় আঘাত হানে। সর্বোচ্চ বাতাস : ঘণ্টায় ২০৯ কিলোমিটার (১৩০ মাইল) কক্সবাজারে। মৃতের সংখ্যা : ৮৭৩ জন, কক্সবাজারে ৪০,০০০ লবণ–বেড জলমগ্ন হয়ে যায়। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে কয়েকটি স্থানে পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

কক্সবাজার	:	২.৪০ মিটার (০৭.৮৬ ফুট)
সন্দ্বীপ	:	৩.৬৪ মিটার (১১.৯৩ ফুট)
চট্টগ্রাম	:	২.১৬ মিটার (০৭.০৯ ফুট)
নোয়াখালী	:	৩.৬৬ মিটার (১২.০১ ফুট)
কোম্পানীগঞ্জ	:	৪.৫৮ মিটার (১৫.০১ ফুট)

৭. ৮–১৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৬*
কক্সবাজার অঞ্চলে আঘাত হানে।

৮. ৫–৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৩**

বরিশাল–পটুয়াখালী এলাকায় আঘাত হানে। মৃত : ১৮৩ জন। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে কয়েকটি স্থানের পানির উচ্চতা (জলোচ্ছ্বাস+জোয়ারভাটা) ছিল নিম্নরূপ :

কোম্পানীগঞ্জ	:	৩.৩১ মিটার (১০.৮৬ ফুট)
নোয়াখালী	:	৪.১৫ মিটার (১৩.৬১ ফুট)
কক্সবাজার	:	২.৪৬ মিটার (০৮.০৬ ফুট)
হাতিয়া	:	২.৪১ মিটার (০৭.৯১ ফুট)
সন্দ্বীপ	:	২.৪৬ মিটার (০৮.১৪ ফুট)
চাঁদপুর	:	২.৩৬ মিটার (০৭.৮১ ফুট)
চান্দখালী	:	২.৩৭ মিটার (০৭.৭৬ ফুট)

৯. ১৪–১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০**

কক্সবাজার অঞ্চলে আঘাত হানে।

পরিশিষ্ট ২

বাংলাদেশে আঘাতকৃত ঘূর্ণিঝড়
(১৮৭৭-১৯৯৫)

বছরভিত্তিক তালিকা

পরিশিষ্ট ১ এ প্রদত্ত মাসভিত্তিক ঘূর্ণিঝড়কে নিম্নে বছর অনুসারে সাজানো হলো। এ তালিকায় ১৮৭৭ সালের পূর্বেকার কয়েকটি বিশেষ ঘূর্ণিঝড়েরও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৭৭ সালের পূর্বেকার কয়েকটি বিশেষ ঘূর্ণিঝড়

১৫৮৪

ঘূর্ণিঝড়টি বাখেরগঞ্জ এলাকায় আঘাত করে। আইন-ই-আকবরীতে এর উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এটি বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের প্রথম রেকর্ড। মৃতের সংখ্যা : ২০০,০০০। উল্লেখ্য, মৃতের সংখ্যা বেশি মনে হয়। বর্তমান থেকে ৪০০ বছরের অধিক আগে বাখেরগঞ্জের লোক সংখ্যাই বা কত ছিল!

১৭৯৭, মে**

চট্টগ্রাম এলাকায় আঘাত হানে। প্রতিটি কুঁড়েঘর মাটির সাথে মিশে যায়। চট্টগ্রাম বন্দরে দুটি জাহাজ ডুবে যায়।

১৮২২, মে**

বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে। কালেক্টরেট রেকর্ড ভেসে যায়। মৃতের সংখ্যা : ৪০,০০০, গবাদি পশু মারা যায় ১০০,০০০ (উল্লেখ্য, একটি প্রকাশনায় ৬ জুন উল্লেখ আছে এবং মৃতের সংখ্যা বলা হয়েছে ১০০,০০০ জন)।

১৮৩১, অক্টোবর

বরিশাল এলাকায় আঘাত হানে।

১৮৬৯, ৬ মে

খুলনা এলাকায় আঘাত হানে। পশুর এবং হরিণঘাটা নদী দিয়ে জলোচ্ছ্বাস প্রবেশ করে বিস্তীর্ণ এলাকা নিমজ্জিত করে। প্রায় ২৫০ জন লোক মারা যায়।

১৮৭২, অক্টোবর

কক্সবাজার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক মানুষ ও গবাদি পশু প্রাণ হারায়।

১৮৭৬, ২৫ অক্টোবর–১ নভেম্বর**

এটি বিখ্যাত বাখেরগঞ্জ ঘূর্ণিঝড় হিসেবে পরিচিত। ঘূর্ণিঝড়টি দৃশ্যত ২৫, ২৬ এবং ২৭শে অক্টোবর আন্দামানের পশ্চিমে জন্ম নেয়। প্রথমে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে পরে ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্বদিকে বেঁকে যায়। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রের অবস্থান এবং গড় গতি নিম্নে দেয়া হলো।

তারিখ	অবস্থান অক্ষাংশ (উঃ)/ দ্রাঘিমাংশ (পূ:)	চলার গড় গতি মাইল/ঘণ্টা
২৭ অক্টোবর (দুপুর)	১০°/৮৯°	৪
২৮ অক্টোবর (দুপুর)	১১°১৫′/৮৯°	
২৯ অক্টোবর (দুপুর)	১৩°/৮৯°	৫
৩০ অক্টোবর (দুপুর)	১৪°১৫′/৮৯°	১২
৩১ অক্টোবর (অপরাহ্ন ১টা)	১৮°৪৫′/৮৯°৫০′	১২
৩১ অক্টোবর (বিকেল ৬টা)	১৯°৪৫′/৮৯°৫০′	১৫
৩১ অক্টোবর (রাত ৯টা)	২০°৩০′/৯০°২৫′	২১
১ নভেম্বর (ভোর ৩টা)	২২°৩০′/৯১°	২৪

এ ঘূর্ণিঝড়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো উপকূলের কাছাকাছি এসে এর চলার গতি খুব দ্রুত বেড়ে যায়। মেঘনা মোহনায় পহেলা নভেম্বর, রাত ৩টায় পৌঁছে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র হাতিয়া অতিক্রম করে ঐ তারিখে রাত তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে। জলোচ্ছ্বাস এবং জোয়ারভাটা মিলিতভাবে প্রচুর ক্ষতি করে। তখন ছিল পূর্ণ চন্দ্র অর্থাৎ ভরা কটাল। চট্টগ্রামে জোয়ার হবার কথা ছিল পহেলা নভেম্বর ভোর ০–৩০ মিনিটে (রাত সাড়ে বারটায়) এবং মেঘনা মোহনা রাত ১–২ টার মধ্যে। অর্থাৎ মেঘনা মোহনা এলাকা ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের সময় ভরা কটালে পানিতে ছিল টইটুম্বর। এর সাথে যোগ হয় জলোচ্ছ্বাস। ফলে পরিস্থিতি হয় ভয়াবহ। পানির মিলিত উচ্চতা প্রায় ১২ মিটারের (৪০ ফুট) পৌঁছে (জোয়ার + জলোচ্ছ্বাস)। মৃতের সংখ্যা ১০০,০০০ (সরাসরি) এবং ১০০,০০০ (ঘূর্ণিঝড় পরে) বিভিন্ন রোগে বিশেষ করে কলেরায়। (উৎস : The Backergunge cyclone of October 1876, Hand-Book of Cyclonic Storms in the Bay of Bengal by Eliot, J., Meteorological Department of India, ১৮৯০, পৃ. ১৫১–১৬২)

১৮৭৭-১৮৮০
৬–৮ আগস্ট, ১৮৭৭
৮–৯ আগস্ট, ১৮৭৭
১৮–২০ আগস্ট, ১৮৭৭
৩–৫ নভেম্বর, ১৮৭৭
২৬–২৭ অক্টোবর, ১৮৭৯

১৮৮১-১৮৯০
২৬–২৮ মে, ১৮৮১
৩–৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৩
৩১ অক্টোবর–২ নভেম্বর, ১৮৮৪*
১৬–২০ জুন, ১৮৮৫*
১৮–২৩ নভেম্বর, ১৮৮৫*
১২–১৫ জুলাই, ১৮৮৭
১–৭ অক্টোবর, ১৮৮৮*
২১–২৪ অক্টোবর, ১৮৯০*

১৮৯১-১৯০০
২০–২২ অক্টোবর, ১৮৯৩**
১৩–১৭ জুন, ১৮৯৪
২৩–২৭ জুলাই, ১৮৯৪*
৩০শে সেপ্টেম্বর–২ অক্টোবর, ১৮৯৫**
১০–১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫**
২১–২৪ অক্টোবর, ১৮৯৭**
৫–৮ মে, ১৮৯৮**
২১–২৩ আগস্ট, ১৮৯৮
১৩–১৬ জুলাই, ১৮৯৯

১৯০১-১৯১০
৫–৮ অক্টোবর, ১৯০১
১৪–১৮ নভেম্বর, ১৯০১*
২১–২৩ নভেম্বর, ১৯০৪*
৫–৮ জুলাই, ১৯০৫*
২৮–৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫
২৩–২৬ অক্টোবর, ১৯০৫*
২৫–২৭ জুলাই, ১৯০৬*
১২–১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬
৫–৬ অক্টোবর, ১৯০৭
১৬–২২ জুন, ১৯০৮*
২–৫ ডিসেম্বর, ১৯০৯**

১৯১১-১৯২০
১৫–১৮ এপ্রিল, ১৯১১**
২–৫ অক্টোবর, ১৯১৪
৪–৬ জুন, ১৯১৬*
১–২ নভেম্বর, ১৯১৬
১৩–১৬ জুন, ১৯১৭
৩০ জুলাই–৩ আগস্ট, ১৯১৭
২৪–২৫ মে, ১৯১৮*
১২–১৩ অক্টোবর, ১৯১৮
৫–১০ আগস্ট, ১৯১৯
১১–১৩ আগস্ট, ১৯১৯
২৩–২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯*
৫–৮ আগস্ট, ১৯২০
২৪–২৬ অক্টোবর, ১৯২১

১৯২১-১৯৩০
১৯–২৪ এপ্রিল, ১৯২২**
২–৬ মে, ১৯২৩**
২৮–৩১ জুলাই, ১৯২৩
২১–২৬ আগস্ট, ১৯২৩
১৪–১৭ জুন, ১৯২৪*
১৮–২১ অক্টোবর, ১৯২৪
১৪–১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫
১৪–১৬ অক্টোবর, ১৯২৫
৫–৭ জুলাই, ১৯২৬*
২৪–২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৬*
১–৩ আগস্ট, ১৯২৮
২–৪ জুন, ১৯২৯*
২৩–২৬ জুলাই, ১৯২৯
৭–১০ আগস্ট, ১৯২৯
১৫–২২ জুলাই, ১৯৩০*

১৯৩১-১৯৪০
৭–১০ জুন, ১৯৩২
৫–৯ নভেম্বর, ১৯৩৪*
২০–২২ অক্টোবর, ১৯৩৫*
২০–২৫ জুন, ১৯৩৭*
১১–১৫ অক্টোবর, ১৯৩৭*
২৫–২৬ মে, ১৯৩৮
১১–১৩ আগস্ট, ১৯৩৮
৬–১২ নভেম্বর, ১৯৩৮**
২১–২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯
৩০ সেপ্টেম্বর–২ অক্টোবর, ১৯৩৯
২–৫ আগস্ট, ১৯৪০*

১৯৪১-১৯৫০
২২–২৬ মে, ১৯৪১**
৪–৫ জুন, ১৯৪১*
১৫–১৭ জুন, ১৯৪১
২৮–২৯ জুলাই, ১৯৪১

১৫–২০ আগস্ট, ১৯৪১*
৩১ অক্টোবর–৪ নভেম্বর, ১৯৪২*
১৫–১৬ জুন, ১৯৪৪
২৪ আগস্ট–১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪
১০ জুন, ১৯৪৭
১৫ অক্টোবর, ১৯৪৭
২১–২৩ অক্টাবর, ১৯৪৭**
১৭–২২ অক্টোবর, ১৯৫০
১৬–১৯ নভেম্বর, ১৯৫০*

১৯৫১–১৯৬০
৯–১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১
৬–১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫১**
৮–১২ নভেম্বর, ১৯৫২*
২৫–২৬ অক্টোবর, ১৯৫৪
২৩–২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭
১৬–১৯ মে, ১৯৫৮*
২২–২৪ অক্টোবর, ১৯৫৮*
১০–১৮ জুলাই, ১৯৫৯
২৭–৩০ অক্টোবর, ১৯৫৯
৮–১১ অক্টোবর, ১৯৬০**
২৮–৩১ অক্টোবর, ১৯৬০**

১৯৬১–১৯৭০
৫–৯ মে, ১৯৬১**
২৭–৩০ মে, ১৯৬১**
২৪–২৫ অক্টোবর, ১৯৬১
১৯–২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২*
২৭–৩০ অক্টোবর, ১৯৬২**
২৫–২৯ মে, ১৯৬৩**
৪–৬ জুলাই, ১৯৬৩
৫–৭ অক্টোবর, ১৯৬৩
২৬–২৭ অক্টোবর, ১৯৬৩**
৪–৭ অক্টোবর, ১৯৬৪
১০–১২ মে, ১৯৬৫**
২৬ মে–১ জুন, ১৯৬৫**
৭–৮ অক্টোবর, ১৯৬৫
৭–১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫**
২৭ সেপ্টেম্বর–১ অক্টোবর, ১৯৬৬**
৮–১৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৬*
৮–১১ অক্টোবর, ১৯৬৭**
২০–২৪ অক্টোবর, ১৯৬৭**
১২–১৪ জুন, ১৯৬৮
৩–৬ আগস্ট, ১৯৬৮
১১–১৪ আগস্ট, ১৯৬৮
১৭–২০ জুন, ১৯৬৯
২৩–২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
৯–১১ অক্টোবর, ১৯৬৯*
২–৬ মে, ১৯৭০**
২৩–২৪ মে, ১৯৭০
৭–১১ জুন, ১৯৭০
৮–১৩ নভেম্বর, ১৯৭০**

১৯৭১–১৯৮০
৩–৬ নভেম্বর, ১৯৭১**
১২–২০ আগস্ট, ১৯৭২
১৪–১৭ নভেম্বর, ১৯৭৩**
৫–৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৩**
২৯ মে–১ জুন ১৯৭৪*
২৩–২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪**
৪–৭ জুন, ১৯৭৫*
৭–১১ নভেম্বর, ১৯৭৫*
১৫–২১ অক্টোবর, ১৯৭৬*
৯–১৩ মে, ১৯৭৭**
২৮ জুন–১ জুলাই, ১৯৭৯
১২–১৫ আগস্ট, ১৯৭৯
২৬ আগস্ট, ১৯৮০
১–৪ অক্টোবর, ১৯৮০

১৯৮১–১৯৯০
২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
১৪–১৫ অক্টোবর, ১৯৮৩*
৬–৯ নভেম্বর, ১৯৮৩**
২২–২৫ মে, ১৯৮৫**
৭–৯ নভেম্বর, ১৯৮৬**
১–৫ জুন, ১৯৮৭*
১৮–২০ অক্টোবর, ১৯৮৮*
২৩–৩০ নভেম্বর, ১৯৮৮**
১৪–১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০**

১৯৯১–১৯৯৫
২৪–৩০ এপ্রিল, ১৯৯১**
৩–৮ মে, ১৯৯১*
৩১ মে–২ জুন, ১৯৯১*
১২–১৪ অক্টোবর, ১৯৯১
১৬–২১ নভেম্বর, ১৯৯২**
২৯ এপ্রিল–২ মে, ১৯৯৪**
২১–২৫ নভেম্বর, ১৯৯৫**

গ্রন্থপঞ্জি

আনওয়ার আলী, "বঙ্গোপসাগরীয় জলোচ্ছ্বাস"—সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২।

আনওয়ার আলী, এল নিনিও, দূর অনুধাবন সাময়িকী, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো), ঢাকা, ১৯৯৮।

Anwar Ali, "Formation and development of cyclones in the Bay of Bengal" M.Sc. Thesis, University of London, England, 1976.

Anwar Ali, "Storm surges in the Bay of Bengal and some related problems" Ph.D. Thesis, University of Reading, Reading, England, 1979.

Anwar Ali, "The dynamic effects of barometric forcing on storm surges in the Bay of Bengal" Mausam (Formerly Indian Journal of Meteorology, Hydrology and Geophysics), New Delhi, India, Vol. 31, No. 3, October 1980.

Anwar Ali, "Some comments on the choice of atmospheric pressure formulae in the numerical modelling of storm surges in the Bay of Bengal" *Nuclear Science and Applications,* Series B, Dhaka, Bangladesh, Vol. 12 & 13, July 1981.

Anwar Ali and M.A. Haque, "Mathematical modelling of back water effect in the Meghna river mouth in Bangladesh", *Journal of NOAMI,* Vol. 11, No. 1, Dhaka, Bangladesh, 1994.

Anwar Ali, "A numerical investigation into the back water effect on flood water in the Meghna river in Bangladesh due to South-West monsoon wind," *Journal Estuarine, Coastal and Shelf Science,* Vol. 41, Academic Press, London, 1995.

Anwar Ali, "Vulnerability of Bangladesh to climate change and sea level rise through tropical cyclones and storm surges" *Journal of Water, Air and Soil Pollution,* Kluwer Publications, The Netherlands, Vol. 92, 1996.

Anwar Ali and J. U. Chowdhury, "Tropical cyclone risk assessment with special reference to Bangladesh," *Mausam* (Formerly Indian Journal of

Meteorology, Hydrology and Geophysics), New Delhi, India, Vol. 48, No. 2, April 1997.

Anwar Ali, H. Rahman, S.S.H. Chowdhury and Q.N. Begum, "Back water effect of tides and storm surges on fresh water discharge through the Meghna estuary," *Jurnal of Remote Sensing and Environment,* Dhaka, Bangladesh, Vol. 1, 1997.

Anwar Ali, H. Rahman and S.S.H. Chowdhury, "River discharge, storm surges and tidal interactions in the Meghna mouth in Bangladesh," *Mausam* (Formerly Indian Journal of Meteorology, Hydrology and Geophysics), Vol. 48, No. 4, New Delhi, India, October 1997.

Anwar Ali, "Climate change impacts and adaptation assessment in Bangladesh" Journal *Climate Research,* USA, (In press).

Choudhury, A.M. and Anwar Ali, "Prediction of maximum wind speed in cyclones in the Bay of Bengal : a preliminary investigation" *Nuclear Science and Applications,* Series B, Vol. 7, Bangladesh, 1974.

Choudhury, A.M. and Anwar Ali, "Prediction of maximum surge heights associated with cyclones affecting Bangladesh," *Nuclear Science and Applications,* Series B, Dhaka, Bangladesh, Vol. 7, 1974.

Donn, W.L., *Meteorology* (4th edition), McGraw-Hill Book Company, 1975, 518 pp.

Elsberry, R.L. (Ed.), *Global View of Tropical Cyclones,* U.S. Office of the Naval Research Marine Meteorology Program, 1975, 185 pp.

Elsberry, R.L. (Ed.), Global Perspectives of Tropical Cyclones, World Meteorological Organization Technical Document WMO/TD-No. 693, Tropical Cyclone Programme Report No. TCP-38, 1996, 289 pp.

Frank, N.L. and Husain, S.A., "The deadliest tropical cyclone in history?" Bulletin of American Meteorological Society, Vol. 52, 1971.

Goudie, A., *The Nature of the Environment* (2nd Edition), Basil Blackwell, 1990, 370 pp.

Haltiner, G. J. and Martin, F. L., *Dynamic and Physical Meteorology,* McGraw-hill Book Company, 1957, 470 pp.

Hess, S.L., *Introduction to Theoretical Meteorology,* Robert E. Krieger Publishing Company, Huntington, New York, 1979, 362 pp.

Holton, J. R., *An Introduction to Dynamic Meteorology* (2nd Edition), Academic Press, 1979, 391 pp.

Houghton, D.D., *Handbook of Applied Meteorology*, John Wiley & Sons, 1985, 1461 pp.

India Meteorological Department, "Tracks of Storms and Depressions in the Bay of Bengal and the Arabian Sea," New Delhi, 1979.

Johns, B. and Anwar Ali, "The numerical modelling of storm surges in the Bay of Bengal," *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, London, Vol. 106, No. 447, 1980.

Koeppe, C.E. and De Long, G.C., *Weather and Climate*, McGraw-Hill Book Company, 1958, 341 pp.

Neumann, G. and Pierson, W.J., *Principles of Physical Oceanography*, Prentice-Hall, 1966, 545 pp.

Palmen, E. and Newton, C.W., *Atmospheric Circulation Systems : Their Structure and Physical Interpretation*, Academic Press, 1969, 603 pp.

Pittock, A.B., Frakes, L.A., Jenssen, D., Peterson, J.A. and Zillman, J.W. (Eds.), *Climate Change and Variability, A Southern Perspective*, Cambridge University Press, 1978, 455 pp.

Riehl, H., *Introduction to the Atmosphere*, McGraw-Hill Book Company, 1972, 516 pp.

Riehl, H., *Climate and Weather in the Tropics*, Academic Press, 1979, 611 pp.

Wallace, J.M. and Hobbs, P.V., *Atmospheric Science, An Introductory Survey*, Academic Press, 1977, 467 pp.

BANSDOC Library
Accession No 17870
BANSDOC Library Dhaka